এক

সুবিশাল স্বচ্ছ নীল আকাশের পশ্চিম দিগন্তে ঈষৎ দক্ষিণ ঘেঁসে ভাসছে একটা বিরাট রক্তবর্ণ অগ্নিগোলক। নীচে বিস্তীর্ণ শূন্য ধানখেতে অল্প অল্প কচি ঘাসের হরিৎ আভা। গোলকটা নিজের ভারে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নদীর উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রহীম এক দৃষ্টে চেয়ে আছে সেই দিকে—যেন এই বিপুল বিশ্বে তাকে আকর্ষণ করবার মতো আর কিছু নেই।

তার সঙ্গী বললে, চলেন ভাই, এখানে ডাঁড়িয়ে থাকলে কী হবে? পা ধুতে হবে তো।

থামো, থামো, একটু থামো, দৃষ্টি না সরিয়েই অনুরোধ করলে রহীম। অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে দিগন্তের সীমার বাইরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আকাশে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড মেঘ এতক্ষণ নজরে আসছিল না, এখন অপরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যে সজ্জিত তাদের মনোমোহন রূপ স্পষ্ট ফুটে বেরিয়ে এল।

রহীম তার সঙ্গীর দিকে ফিরে স্মিত মুখে বললে, হ্যাঁ, চল। কোথা পা ধুতে হবে?

এইমাত্র লঞ্চ থেকে নেমেছে তারা। ভাটার নদী। এক হাঁটু কাদা ভেঙে বাঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাঘের মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়ায় বেশ তৃপ্তি অনুভব করছে। অন্য যাত্রীরা সব চলে গেছে, কেউ বা পাশের হাটখোলার মুদীর দোকানে কিছু সওদা কিনছে। রহীম রোস্তমের সঙ্গে গেল হাটখোলার টিউবকলে পা ধুতে।

রোস্তমের কাঁধে বেশ একটা বড় বোঁচকা। জুতো জোড়াকেও লঞ্চে বসে কাগজে জড়িয়ে তার মধ্যে বেঁধে নিয়েছে। হাতে একটা খাবারের টুকরি। রহীমের এক হাতে একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগে তার দরকারী জিনিসপত্র এবং অন্য হাতে জুতো।

কলের নিকটের দোকানে জিনিসগুলো রাখলে তারা।

দোকানদার রোস্তমের পরিচিত, তাদের পাশের গ্রামের লোক। নাম পাঁচকড়ি ওরফে পাঁচু। প্রৌঢ়, মজবুত শরীর। সচ্ছল কৃষক। নিজে দোকান চালায়, ছেলেরা চাষ করে, প্রয়োজন মতো দোকানের কাজে তাকে সাহায্যও করে।

পাঁচু কাকা, কেমন আছ গো? বলে রোস্তম দোকানে ঢুকল জিনিসপত্র রাখতে। রহীমের ব্যাগটাও রাখলে। রহীম বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

রোস্তম! কোথকে এলি? কলকাতা গেছলি বুঝি? লোক-মান কেমন আছে? তোর মামারা আছে ভালো? পাঁচু জবাবে একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করলে। সেই সঙ্গে রহীমকে নিরীক্ষণ করে ছোট গলায় বললে, এনাকে তো চিনতে পারছি না? কলকাতা থেকেই এলেন বুঝি?

হ্যাঁ কাকা, আমার ভাইয়ের বন্ধু রহীম সায়েব। আমাদের এদিকে আগে আসেননি কখনো, তাই বেড়াতে এলেন।

পাঁচু দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে বললে, আমাদের এ আবাদ এলাকায় কী আর দেখবেন বাবু। তবু এসেছেন যখন, দুদিন বেড়িয়ে যান, দেখে যান আমরা কেমন অবস্থায় আছি এখানে।

পা ধুয়ে রহীম জুতো পরে নিলে। রোস্তম বললে, পথে আর পানি-কাদা নেই। জিনিসপত্র নিয়ে তারা আমতলীর পথে রোস্তমের বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। নদীর বাঁধ ধরে কিছু দূর গিয়ে ডান দিকের ভেড়ি ধরে প্রায় এক মাইল পথ হাঁটতে হবে। পথ শুকনো। এখনও অন্ধকার নামেনি।

রহীম। এটাই বুঝি মধুখালির হাটখোলা? হাট কবে বসে?

রোস্তম। মঙ্গলবারে আর শনিবারে। পরশু হাটবার। আসব আমরা, দেখবেন বেশ বড় হাট।

রহীম। হাটখোলায় যে-কটা দোকান আছে সবই স্থানীয় লোকের, না বাইরের লোকও আছে?

রোস্তম। এই এলাকারই লোক এরা। শুধু একজন আছে পশ্চিমা, তারই দোকান সবচেয়ে বড়। অনেক কাল থেকেই আছে, এখানেই ঘরবাড়ি করে বাস করছে।

রহীম। পাঁচুকাকা বললে যাকে তার বাড়ি কোথা? লোকটি কেমন?

রোস্তম। ওর বাড়ি চণ্ডীপুর। আমাদের গাঁয়ের কাছে। লোকটা ভালোমন্দ মিলিয়ে এক রকম আছে। এমনি মুখমিষ্টি, লোকের সঙ্গে ব্যাভার ভালো। দোকানের খদ্দের আছে, কারবার মন্দ নয়। জমি জায়গাও বেশ করেছে—বিঘে চল্লিশের কম হবে না। তিন ছেলে চাষ করে, সবাই জোয়ান। দুখানা নাঙল আছে, মাহিন্দারও রেখেছে, বলদ আছে, মোষ আছে, গাইও রেখেছে তিন চারটে। ভিটে-বাড়ি বেশ বড়, তার মধ্যে খামার বাড়ি, গোয়াল। দুটো পুকুর আছে। বেশ ভালো গেরস্থ। জাতে পোদ। আজকাল ধারকর্জও দেয় লোককে—ধানই দেয় বেশি, টাকা সামান্য। তাতেও আয় হচ্ছে।

রহীম হেসে বললে, তুমি তো অনেক পরিচয় দিয়ে ফেললে। ওর ছেলেরা মানুষ কেমন? জন-মাহিন্দারের সঙ্গে ব্যবহার কেমন করে।

রোস্তম। না ভাই, সেদিক থেকে ভালো নয়। ছোট ছোকরাটা তবু ওরি মধ্যে ভালো। বয়েস আমার মতন হবে, বিশ বাইশ বছর। বড় দু জনের ব্যাভার চাল-চলন কিছুই ভালো নয়। মাহিন্দারদের সঙ্গেও ভালো ব্যাভার করে না, গালমন্দ করে। তারা তো আবার বুনো, ওরাঙ বলে।

রহীম। ওরাঙ কী? ওরাওঁ? তাদের বুনো বলে কেন?

রোস্তম। লোকে তো তাই বলে এখানে। ওদের পাড়াকে বলে বুনো পাড়া। ওরা যেখান থেকে এসেছেল সেটা বনজঙ্গলের দেশ বলেই হয়তো বুনো বলা হয়। আমাদের বাঙ্গালী যারা বাস করে এখানে তাদিকে কিন্তু বুনো বলে না।

কথা বলতে বলতে তারা আমতলী গ্রামে এসে ঢুকল। কিছু

দূর এগোলেই রোস্তমের বাড়ি। তখন খানিকটা অন্ধকার হয়েছে। বাড়ির কাছে পৌঁছতেই ছোট ভাই দায়েম প্রথমে দেখলে তাদের। রহীমকে সে চিনতে পারলে না, দেখেনি কখনো, তবে বুঝলে তাদেরি মেহমান। সে বাড়ির মধ্যে গিয়ে তাদের আগমন সংবাদ ঘোষণা করে একটা লণ্ঠন নিয়ে এল বাইরের ঘরে।

বসবার ঘরের একধারে একখানা ছোট কুঠরি। বাকিটা বসবার জন্য তিন দিক ঘেরা বড় দাওয়া।

দায়েম তাড়াতাড়ি ঝাঁট দিয়ে একটা মাদুর পেতে দিলে দাওয়ায়। রোস্তম দায়েমকে বললে, এক বদনা পানি আর একটা মোড়া আনগে যা। রহীমকে বললে, ভাই, আপনি বসুন, হাত-মুখ ধোন, আমি এগুনো রেখে আসিগে।

রোস্তম ভিতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে বোঁচকা খুলে জিনিসপত্র বার করলে। বাড়িতে দায়েম ছাড়া আছে তার ছোট বোন আর মা। বোন মফিজন দায়েমের বড়। গত বছর তার বিয়ে হয়েছে। শীঘ্রি শ্বশুর বাড়ি যাবার কথা।

মাঠের ধান তুলে ঝাড়ামাড়ার কাজ সেরে রোস্তম কিছু ধান বিক্রী করে কলকাতা গিয়েছিল কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস-পত্র কিনতে। বিশেষ করে মফিজনের জন্য তার প্রয়োজন ছিল।

ধানের দর এখন সস্তা। মহাজনরা দু টাকাও দিতে চায় না, তাও এ মরসুমে দরটা কিছু চড়েছে তাই। অবশ্য কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের দর খানিকটা নরম আছে। এই ধানের উপরই তাকে সংসার চালাতে হয়।

পৌটলার মধ্যে চা চিনি আর বিস্কুট ছিল। সেগুলো আগে বার করে মফিজনের হাতে দিয়ে রোস্তম বললে, এগুনো যত্ন করে রেখে দে, আর জলদি চুলোয় খানিকটা পানি চাপিয়ে দিগে, চা করতে হবে।

আমি চা করতে পারব না ভাই, বললে মফিজন।

তোকে করতে হবে না,আমি করে দোব। তুই পানিটা ফুটিয়ে দে।

মফিজন পানি চাপিয়ে দিয়ে এলে তাদের জিনিসগুলি দেখিয়ে দিয়ে রোস্তম তার মা ও বোনকে রহীমের পরিচয় দিলে : রহিমভাই হচ্ছে ভাইয়ের দোস্ত। এক জায়গায় দু জনেই কাজ করত, চাকরিও গেল এক সঙ্গে। খুব লেখাপড়া জানা লোক। ভাইয়ের কাছে হামেশা আসে। এখন কারখানার কুলি-মজুরদের জোট তোয়ের করে আর শিক্ষে দেয়।

তার মা প্রশ্ন করলেন, তোর সাথে এসেছে কি বেড়াতে, না কোনো কাজে?

না, কাজ আবার এখানে কী থাকবে? বেড়াতেই এসেছে। দু চার দিন বেড়িয়ে চেড়িয়ে ফিরে যাবে। ইদিকে আসিনি কখনো। ভাই বলেছেল আসতে, আমার সাথেও কথা হয়েছেল আগে আসবার জন্যে। তা অ্যাদ্দিন হয়েই উঠল না। পরশু ভাইয়ের ওখানে দেখা হলে আমি বললাম, চলেন এবার আমার সঙ্গে। ভাই তো এখন আসতে পারলে না, কাজ মেলা এ সময়ে। তাই উনিও দোনামোনা করতে করতে বললেন, যাব।

ওনার বাড়ি কলকাতাতেই, না আর কোথাও? মফিজন জিগেস করলে।

না, থাকেন কলকাতায়। বাড়ি তো আমাদের দেশেই— বসিরহাটের কাছে। ভাই একবার গেছল ওনাদের বাড়ি।

রোস্তম বাইরে গিয়ে দেখলে রহীম কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে একখানা চাদর গায়ে দিয়ে বসেছে, দায়েমের সঙ্গে গল্প করছে। বললে, আমি তাড়াতাড়ি একটু চা করে আনছি ভাই।

কৃষকের বাড়ি, তাতে এই আবাদ এলাকা, চায়ের পাট রোস্তমের বাড়ি নাই। চা খাবার অভ্যাস তাদের কারোই নাই এ বাড়িতে, তাই লোকমান চায়ের সরঞ্জাম এবং কিছু খাবার কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে এখানে এলে চা খায়। তার মামু-মামীদের মতো শহরের লোক এলে দিতেও হয়। সে জন্য চায়ের পেয়ালা ইত্যাদিও কয়েকটা এনে রেখে গেছে।

রোস্তম ঘরে চা না খেলেও কলকাতা গেলে খায়, তোয়ের করতেও জানে। তার মামুর বাড়িতে শিখেছে।

সে গেল চা তোয়ের করতে। মফিজন ইতিমধ্যে পেয়ালা পিরিচগুলো বেশ করে ধুয়ে এনেছে। চা তোয়ের করার সময় রোস্তম তাকে দেখিয়ে দিতে লাগল কেমন করে তোয়ের করতে হয়।

তার মা বললেন, রাতে খাবি কী তোরা ?

তরকারি কিছু নেই ? মাছ-টাছ ?

না, তা হয়ে যাবে আজকের মতন, বললেন তিনি। সকালবেলা দায়েম কোত্থেকে কৈ মাছ এনেছেল, রাঁধা হয়েছে, আর একটা মাছের চচ্চড়ি আছে। আর দুধ আর গুড় আছে। হবে তাতে ?

হ্যাঁ, খুব হবে। রাঁধা হয়ে গেছে কি ? সারাদিন একরকম খাওয়াই হয়নি, জলদি খেতে দিতে হবে।

রাঁধা হয়ে গেছে, খালি ভাতটা বাকি। এখুনি চাপিয়ে দিচ্ছি, জবাব দিলে মফিজন। মা, কলাগুনো হয়তো পেকেছে আজ, ছাখ না একবার।

দায়েমকে ডেকে রোস্তম চা নিয়ে বাইরে গেল।

কলকাতা থেকে ভোরে রহীম রওনা হয়েছিল রোস্তমের সঙ্গে। বার দুই বাস বদল করে নদীতে পৌঁচে লঞ্চ ধরেছিল।

পথে স্নানাহারের সুবিধা পায়নি ; স্নান মোটেই হয়নি, আহারেও তৃপ্তি পাবার মতো ব্যবস্থা ছিল না। শারীরিক পরিশ্রম বেশি না হলেও রহীম ক্লান্তি বোধ করছিল। এখন চা খেয়ে, কতকটা সুস্থ হ'ল।

রোস্তমদের পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে রহীম লোকমানের কাছে পূর্বেই কিছু কিছু শুনেছিল। এখন রোস্তমের মুখে আরো শুনলে।

আমতলী গ্রামখানা বড় নয়, ঘর পঞ্চাশ লোকের বাস। প্রায় অর্ধেক মুসলমান কৃষক। তাদের মধ্যে কয়েক ঘর সম্পূর্ণ জমিহীন

খেতমজুর। অন্য অনেকগুলি পরিবার গত দশ বছরের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংকট ও কৃষি সংকটে পড়ে জমিহীন বা প্রায়-জমিহীন কৃষকের পর্যায়ে পৌঁচেছে, হয় ভাগচাষী নয় খেতমজুরে পরিণত হয়েছে।

গ্রামে অন্য বাশিন্দাদের মধ্যে আছে পোদ, নমশূদ্র, বাগদি এবং কিছু তথাকথিত বুনো, অর্থাৎ উপজাতীয় বা সর্দার। এদের মধ্যে চার পাঁচ ঘর বাদ দিলে হালবলদ রেখে চাষ করবার মতো নিজস্ব জমি কারো নেই। অন্যদের মধ্যে এখনো কারো কারো দু-চার বিঘে করে থাকলেও তারা প্রধানত হয় ভাগচাষী নয় জনমজুর।

রোস্তমের চাষের জমি ১৩।১৪ বিঘে। হালবলদ রেখে চাষ নিজেই করে। সংকটের সময় খাজনা দেনার দায়ে বিঘে কতক বিক্রী করার পর এই পরিমাণ জমি আছে।

বড় ভাই লোকমান অনেক বছর হ'ল কলকাতায় বাস করছে, মাঝে মাঝে দেশে আসে। রোস্তম মেজো আর দায়েম ছোট ভাই। বছর বারো বয়স দায়েমের। প্রাথমিক ইস্কুলে পড়া শেষ করে নিকটে ইস্কুল না থাকায় পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। চাষের কাজে রোস্তমকে সাহায্য করে।

রোস্তমরা পিতৃহীন হয়েছে বছর পাঁচেক হ'ল। মৃত্যুর পূর্বে তার বাপ বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন; সে মেয়ে রোস্তমের চেয়ে দু বছরের বড়। বছর তিনেক হ'ল সে মারাও গেছে। ছোট বোন মফিজনের বয়স এখন প্রায় পনর।

রোস্তমের সবচেয়ে বড় ভাই দানেশ। সে তার বাপের প্রথম পক্ষের সন্তান। রোস্তমের মা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এই বিয়ের পূর্বে তিনি ছিলেন নিঃসন্তান বিধবা।

দানেশের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য যথেষ্ট ছিল। তার প্রতি তাঁর ব্যবহারও খারাপ ছিল না। নিজের সন্তানের মতোই তার যত্ন করতেন। কিন্তু দানেশ প্রথম থেকেই শুধু সৎমা বলেই তাঁর প্রতি

বিরূপ ছিল। তার সে মনোভাব বোঝা গেলেও তখন প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি।

বাপ বেঁচে থাকতে সে চাষে খাটত যথেষ্ট। রোস্তম তখন ছোট। তবে গ্রামের ইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর কিছু কিছু কাজ করত। বাপের মৃত্যুর অল্পকাল পরে দানেশ পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ নিয়ে পৃথক হতে চাইলে এবং দাবি করলে অর্ধেক সম্পত্তি। শেষ পর্যন্ত লোকমান ও তার মামু হাতেম এসে গ্রামের পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা রফা করে নিলে।

রফা করতে গিয়ে দেখা গেল ইতিমধ্যেই গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে তার সৎমা ও সৎ ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে নিজের দাবির সমর্থনে ছোট একটি দল পাকিয়ে ফেলেছে। তার মেহনতের উপরেই যে তাদের সম্পত্তি টিকে আছে এই অজুহাতে এই সম্পত্তির অর্ধেক তার পাওনা, তার দাবি ছিল এই।

আইনত তার পাওনা যেখানে তিন আনারও কম অংশ সেখানে তাকে দেওয়া হ'ল প্রায় পাঁচ আনা। তার মধ্যে চাষের জমি ছাড়া বাস্তু জমির খানিকটা অংশ এবং দুটোর মধ্যে একটা পুকুর তাকে ছেড়ে দিতে হয়। লোকমানের মা হাতেমকে বলেছিলেন, নাবালক ছেলেপুলে নিয়ে থাকতে হবে আমাকে, ওর সাথে বিবাদ রাখলে চলবে না। যা দিতে হয় দিয়ে মিটমাট করে ফ্যালো। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ ষোল আনাই নিয়েছিল দানেশ।

দানেশ তখন বলেছিল নিজের বাসের ঘর সে নিজ খরচায় তুলে নেবে, তবে বাপের যে সামান্য দেনা আছে তার অংশ নিতে পারবে না। দেনা কত আছে সে ছাড়া কেউ জানত না, তার কথা শুনে সকলেই ভেবেছিল সামান্য। পরে দেখা গেল নিতান্ত সামান্য নয়। সে জন্য রোস্তমদের বেশ কিছু জমি বিক্রী করতে হ'ল।

পিতৃবিয়োগের পর দানেশ যে একটা মরসুম ফসল তুলেছিল, এজমালি থেকে তার ধান বিক্রি বাবদ ভালো একটা অংশ সে লুকিয়ে ফেলে। তাছাড়া পূর্বেও সে কিছু নগদ টাকা বাপকে ফাঁকি

দিয়ে সঞ্চয় করে রেখেছিল। সেই টাকা দিয়ে সে নিজের ঘর তুলে নেয় এবং দু'তিন বছর পরে দেনা শোধের জন্য রোস্তমরা যে জমি বিক্রী করে তাও সেই কিনে নেয়।

তার বাপ থাকতেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন। বৌ ছোট ছিল বলে ঘরে আনা হয়নি। এখন বড় হয়েছে। নিজের ঘর তৈরি করার পর তাকে নিয়ে এসে সংসার করছে দানেশ। দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা যথেষ্ট না থাকলেও বিচ্ছেদ ঘটেনি, পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত এবং মেলামেশাও আছে। এ বিষয়ে রোস্তমের মায়ের আগ্রহ খুব বেশি।

চাষের ও ফসল তোলার মরসুমে রোস্তমের খাটুনি বড় বেশী হয়। সে খেটে যায়। এখন দায়েম তাকে সাহায্য করে। মাহিন্দার সে রাখে না, তবে মরসুমে প্রয়োজন মতো রোজ-মজুর নিতে হয়। ফসল স্বাভাবিক হলে সাদামাটা সংসার চলে যায়, অভাব হয় না। কিন্তু ফসল যদি কম হয় তাহলে সেই অনুপাতে টানাটানি দেখা দেয়।

চাষের জন্য তাদের আকাশের উপর নির্ভর করতে হয়। বৃষ্টি সময়মতো এবং যথেষ্ট পরিমাণে হলে আবাদ হয় ভালো, না হলেই লোকসান। জমি প্রায় সবই একফসলা। ফসল শুধু আমন ধান। চাষের খরচ অপেক্ষাকৃত কম; সেচ ও সারের প্রয়োজন নাই অথবা পাবার সুযোগ নেই। কিন্তু কাজ বছরে মাস তিনেকের। বাকি সময়টা বেকার কাটাতে হয়। এখানকার কৃষক জীবনে এটা বড় সমস্যা ও অভিসম্পাত।

তাদের সমস্ত জমি বাড়ির সঙ্গে একই কিতার মধ্যে। বাস্তু বাড়ি এবং খামার ও পুকুর বাদ দিয়েও প্রায় বিঘা দুই পরিমাণ মাটি দিয়ে উঁচু করে একতলা করা হয়েছিল তার বাপের আমলে। তিনি চাষী ভালো ছিলেন, চাষ বুঝতেন। ধান চাষ ছাড়া এই উঁচু জমিতে কিছু গাছপালা এবং তরি-তরকারির চাষ করেছিলেন।

এই জমিতে কিছু পাট বোনা হয়। তাছাড়া ঝিঙে, উচ্ছে, লাউ,

শশা, পুঁইশাক ইত্যাদির চাষ হয়। আর আছে কতকগুলো খেজুর-গাছ ও তালগাছ, আমগাছের চারা, গোটা দুই নারকেল চারা, পাতিলেবুর গাছ আর পুকুরপাড়ে কিছু কলার ঝাড় ও অন্যান্য ছোট ছোট গাছের ঝোপঝাড়। তরি-তরকারি এবং পাতিলেবু হাটে বিক্রী করা হয়। নারকেল এ পর্যন্ত ফলেনি। এই এলাকায় গাছ বড় হলেই কী এক পোকা লেগে তার মাঝপাতার গোড়া কেটে গাছ মেরে দেয়।

এইভাবে রোস্তম রহামকে তাদের গ্রাম ও সংসার সম্বন্ধে বিবরণ শোনাচ্ছিল, এমন সময়ে দায়েম এসে খেতে ডাকলে।

দুই

দীর্ঘকাল পূর্বে রোস্তমের বাপ তাঁর প্রথম যৌবনে আত্মীয়দের ছেড়ে চলে এসেছিলেন এই আবাদ এলাকায়। উদ্দেশ্য জমির সন্ধান। বাড়ি ছিল বসিরহাট অঞ্চলে। অভাবের সংসার; পরিবারের জমি ছিল সামান্য। বড় ভাইদের সঙ্গে তাঁর যে মনের মিল হ'ত না তা নয় কিন্তু তারা নিজেদের সংসার নিয়েই জেরবার। তাই নিজের গতরের উপর নির্ভর করে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন তিনি প্রায় এক বস্ত্রে।

কয়েক বছর জনমজুরের কাজ করবার পর ধীরে ধীরে বিঘে কতক জমির ব্যবস্থা করে তিনি আমতলীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। নিজের রাইয়তী জমির পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে নেবার পর তিনি ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বিয়ে করে নিয়মিত সংসারী হন। সেই স্ত্রীর সন্তান দানেশ। দানেশের মায়ের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন।

হাতেম তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর ছোট ভাই। গ্রামে থাকতে সে এক সম্পন্ন কৈবর্তের মাছের চালানী কারবারে ঢুকেছিল। তাতে তার উপার্জন মন্দ ছিল না; চাষে খেটে যা রোজগার করত, কারবারে তার চেয়ে আয় বেশি হ'ত। কারবারের অন্ধিসন্ধি বুঝে নিয়ে সে ক্রমে নিজেই এই ধরনের কারবার শুরু করে দিলে।

কলকাতার উপকণ্ঠে ধাপা এলাকায় মেছোঘেরির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ক্রমশ সুযোগ বুঝে ঘেরি বন্দোবস্ত নিয়ে সে শহরের সঙ্গে চালানি কারবার শুরু করলে। ধাপা এলাকাতেই দেখেশুনে সস্তায় বেশ বড় একখণ্ড জমি কিনে নিজের বাসের জন্য ঘর বানিয়ে নিলে। তখন থেকে সস্তা দরে জমি কেনার একটু ঝোঁক হ'ল। এই অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় আরো জমি কিনেছে।

ঘর তৈরির পরে সে এক আত্মীয়ের ধাপ্পায় পড়ে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। সে মেয়ে যে কঠিন রোগে ভুগছে সে কথা তাকে জানানো হয়নি। এখন জানতে পেরে সে অত্যন্ত মর্মাহত হ'ল। কিন্তু সেজন্য আক্রোশ প্রকাশ করতে লাগল বৌয়ের উপর। সে শারীরিক অসুস্থতার কারণে যে-সব কাজ করতে অক্ষম, তাকে দিয়ে জোর করে সেই সমস্ত কাজও করাতে লাগল।

যখন এই জুলুম একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল তখন তার বৌ একদিন কেঁদে তার পায়ে ধরে বললে, আমাকে আর এমন করে দগ্ধে দগ্ধে মেরো না। তা চেয়ে আমার বাপের বাড়ি রেখে এসো, মরতে হয় সেখানেই মরব।

বৌ ছেলেমানুষ, বিয়ের জন্য অপরাধটা তার নয়, হাতেম সে-কথা বুঝত। কিন্তু যারা আসল অপরাধী তারা নাগালের বাইরে থাকার কারণে তার মনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ত সেই বেচারীর উপর। এখন তার মিনতি শুনে কিন্তু তার মন গলে গেল, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় কেঁদে ফেললে। বৌকে একটু আদর করে বললে, সেই ভালো। তোরও কষ্ট, আমারও কষ্ট। তা চেয়ে বরঞ্চ তোকে বাপের বাড়িতে রেখে আসিগে।

কিছু কাপড় চোপড় আর নগদ টাকা দিয়ে সে বৌকে রেখে এল। প্রতি মাসেও তার জন্যে কয়েকটা করে টাকা পাঠাতে লাগল। আরো মাস কতক রোগে ভুগে মেয়েটি মারা গেল।

কারবারের আয় ভালো। হাতে তখন তার নগদ টাকাও বেশ জমেছে। হাতেম স্থির করলে এবার সে একটি পাকা বাড়ি তোয়ের করবে এবং তারপর ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে যাচাই করে ভালো সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনবে। এ ইচ্ছা তার অপূর্ণ থাকেনি।

মরিয়ম সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। তার বাপ-চাচার সংসারে তিনখানা হালের চাষ। তারা মজুর-মাহিন্দার দিয়ে চাষ করায়, নিজেরা এখন আর লাঙল ধরে না। চাষের কাজ দেখে তার চাচা,
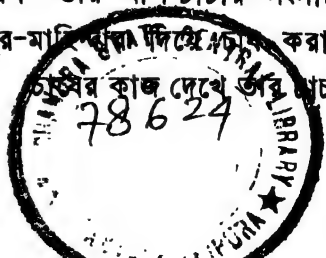
আর তার বাপ বেশির ভাগ সময় থাকে বসিরহাট শহরে পাটের কারবার নিয়ে। ঘর বেঁধে বাস করে সেখানে। দু ভায়ের ছেলেরা পড়ে সেই বাড়িতে থেকে। মরিয়মও তার ছেলেবেলায় মা-বাপের সঙ্গে শহরেই বাস করেছে বেশি। সে ইস্কুলে পড়েছে, উচ্চ প্রাইমারি পাসও করেছে। তারপর মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে মা আর ইস্কুলে যেতে দেয়নি তাকে। এই পড়া ছাড়া সে কোরান তেলাওত করতে পারে, দোয়াদরূদও কিছু শিখেছে। রান্নার কাজও বেশ জানে।

মেয়ে হিসাবে মরিয়মের মেজাজ ভালো। দেখতেও সে সুন্দরী। সৌন্দর্য বলতে অনেকের মতো হাতেমও বুঝত ফরসা রঙ। সে সৌন্দর্য মরিয়মের যথেষ্টই আছে। সে তার বাপের আদরের মেয়ে। বাপ গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। সেই কারণে অনেক সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তার বিয়ের জন্য পারিবারিক দিক থেকে চাপও বাড়ছে। সেই সময়ে হাতেমের জন্য তার এক প্রকৃত হিতৈষী বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন মরিয়মের বয়স তাদের চলতি সামাজিক বিচারে অনেক বেশি হয়ে গেছে।

তার বাপের বাড়ি হাতেমের গ্রাম থেকে অনেক দূরে হলেও একই এলাকায়। তাই হাতেমের পরিবার গরিব বলে প্রথমে তার বাপ-চাচার এ বিয়েতে আপত্তি ছিল। কিন্তু যখন তারা ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলে যে হাতেম গ্রামে বাস করে না, তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগও কম রাখে, কলকাতায় নিজ বাড়িতে বাস করে এবং তার কারবারের আয় ভালো, তখন আর বিয়েতে কারো অমত থাকল না।

মেয়ে নতুন বৌ হয়ে আসছে হাতেমের একার সংসারে। সে জন্য তার এক দূর সম্পর্কের বৃদ্ধা বিধবা ফুফুকে পাঠানো হ'ল তার সঙ্গে। হাতেম মরিয়মকে পেয়ে ভাবলে এইবার তার জীবন সার্থক হ'ল, এর চেয়ে ভালো বিয়ে সে নিজেও ভাবতে পারেনি।

মরিয়মও তার ব্যবহার দেখে গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'ল, মুগ্ধও হ'ল। নিজের নসিবের কথা চিন্তা করে আনন্দ বোধ করলে।

হাতেম নববধূকে নিয়ে বেশ কিছুদিন মশগুল হয়ে থাকল। সে জন্য ব্যবসার কাজেও মাঝে মাঝে ঢিলেমি দেখা গেল তার। ক্রমে যখন মরিয়ম জানতে পারলে হাতেমের গাফিলতির ফলে কারবারের ক্ষতি হচ্ছে, তখন মিষ্টি শাসনের দ্বারা তাকে সংযত করার চেষ্টা করলে। হাতেম হ'লও সংযত, কারবারের দিকে আগের মতো নজর দিতে লাগল। সেই সঙ্গে মরিয়মের সম্বন্ধে তার ধারণা আরো ভালো হ'ল, মনে মনে তার প্রতি একটু শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে লাগল। কোন কোন দোস্ত-বন্ধুর অনিষ্টকর সংসর্গ এই বিয়ের পূর্বে মাঝে মাঝে তাকে যে নোংরা পথে নিয়ে যেত তা থেকে এখন সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলে।

লোকমানের মা হাতেমের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ভাইয়ের প্রতি তাঁর স্নেহও যথেষ্ট। হাতেমের তাঁর প্রতি সে জন্য আকর্ষণ আছে, যদিও ভাইদের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। হাতেম ও মরিয়ম মাঝে মাঝে আমতলী যেত। এখনো যায়, তবে কম; এখন সংসারের দায়িত্ব বেড়েছে। লোকমানের মা ও ভাইবোনেরা এখানে এসে প্রকৃত আত্মীয়ের মতো ব্যবহার পায়।

মরিয়মের প্রথম সন্তান ছিল একটি ছেলে। জন্মের কয়েক মাস পরে সে মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুতে তারা দুজনেই গভীর শোক পায়। এর পর জন্ম হয় একে একে দুটি মেয়ের। দেখতে তারা মায়ের মতোই। মরিয়ম সখ করে তাদের নাম রাখে নূরজাহান ও জাহান-আরা। এই নামেই ডাকবে বলে কোন ডাক নাম দেয়নি তাদের।

তার তিনটি সন্তানই জন্মেছিল বাপের বাড়ি। হাতেমের ঘরে তার মা-বোন কেউ না থাকায় মরিয়মের মা-বাপ প্রসবের পূর্বে

মেয়েকে নিয়ে যেতেন এবং পরে সে কলকাতা ফিরে আসত। জাহানআরার জন্মের পর সে বাপের বাড়াতে অসুস্থ হয়ে পড়ে, অনেক দিন রোগে ভোগে। সেই কারণে তার কলকাতা আসতে বেশ কয়েক মাস দেরি হয়ে যায়।

এই সময়ে হাতেম তার বিবাহের পূর্বেকার বদ অভ্যাসের মধ্যে নতুন করে ফেঁসে যায়। কিন্তু পূর্বে যা ঘটেনি এবার তাও ঘটে গেল—একটা নোংরা রোগ তাকে আক্রমণ করলে। এ অবস্থা জানতে পেরেই সে অনেক খরচ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তাতে রোগের যন্ত্রণা থেকে সে রেহাই পেলে বটে কিন্তু তার পরিণতি অশুভ হ'ল; তার দেহের পূর্বের অবস্থা আর ষোল আনা বজায় থাকল না, যদিও চেহারা দেখে তা বোঝা যায় না। এ কথা সে বুঝতে পারলে অনেক পরে, যখন তাদের আর কোন সন্তান হ'ল না। সেজন্য তার অনুশোচনা হ'ল, মনে মনে মরিয়মের কাছে নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগল, কিন্তু কথাটা তার নিকট গোপন রাখলে। দুজনের মনের মিল সত্ত্বেও তাদের মাঝখানে একটা অবাঞ্ছিত ব্যবধান এসে গেল, অথচ মরিয়ম নিজে তার বাষ্পকণাও জানতে পারলে না।

কয়েক বছরের মধ্যে আর কোন সন্তান হ'ল না দেখে নিরাশ হয়ে পুত্রের সাধ মিটাবার জন্য তারা ঠিক করলে হাতেমের ভাগনে লোকমানকে তার মা-বাপের কাছ থেকে এনে নিজেদের কাছে রাখবে—কতকটা পোষ্য পুত্রের মতো। লোকমানের মায়ের ছেলেকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু হাতেম ও মরিয়মের মনোবেদনার কথা বিবেচনা করে তিনি বেশি আপত্তি তুললেন না।

ধাপার বাড়িতে থেকে লোকমান শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পায়নি নিকটে হাই ইস্কুল না থাকার কারণে। স্থানীয় ইস্কুলের পড়া শেষ করার পর যাতায়াতের অসুবিধা থাকায় দূরে শহরের ভিতরে ইস্কুলে গিয়েও পড়তে পারেনি। মামুর মাছের ব্যবসার দিকেও তার আকর্ষণ ছিল না।

ই স্কুলে পড়বার সময় তার সহপাঠী ছিল নিকটের বস্তির একটি ছেলে। তাদের বাড়ি সে যেত মাঝে মাঝে। তার বাবা ছিল একটা প্রেসের মেশিনম্যান। তার কাছে ছাপাখানার গল্প শুনে লোকমানের মনে একটা আকর্ষণ জাগে। পরে সেই মেশিনম্যানকে অনুরোধ করে তার সাহায্যে একদিন গিয়ে সে ঢুকল সেই প্রেসে কম্পোজিটারের কাজ শিখতে। শেখবার পর কাজও পেলে সেখানে। এই প্রেসে তার আগে থেকেই আর এক কম্পোজিটার ছিল রহীম। লোকমান ও রহীমের প্রথম পরিচয় হয় এখানে।

আবদুর রহীম বসিরহাট মহকুমার কুতুবপুর গ্রামের এক গরিব কৃষকের একমাত্র সন্তান। তার বয়স যখন তিন বছর সেই সময় তাঁর বাপ বিঘে পাঁচেক রাইয়তী জমি সমেত তাকে আর তার মাকে রেখে মারা যায়। তার তিন মাসের মধ্যে কয়েক দিনের রোগে তার মায়েরও মৃত্যু হয়।

তার বাপের বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল গ্রামেই। তার দুই জোয়ান ছেলে চাষে খাটে। নিজেদের সামান্য রাইয়তী জমি আর কিছু ভাগের জমি চাষ করে। তার মা মারা যাবার পর রহীমকে তার এই ফুফু নিজের কাছে এনে রাখে।

প্রথমে গ্রামের মকতবে এবং পরে মাইল দুই দূরে এক গ্রামের মাইনর ইস্কুলে তার ফুফুতো ভাইরা পড়ায় তাকে। পড়াশুনায় সে ভালো ছিল, মাইনর ইস্কুল থেকে পাসও করেছিল। কিন্তু পড়ার আগ্রহ থাকলেও আর পড়তে পারেনি সুযোগের অভাবে; কাছা-কাছি হাই ইস্কুল ছিল না, আর খরচ করে থেকে দূরের ইস্কুলে লেখাপড়া করাও সম্ভব হ'ল না।

ইতিমধ্যে তার ফুফু দুই ছেলের বিয়ে দেয় এবং পরে একজনের সন্তানের মুখ দেখে মারা যায়। রহীমের পৈত্রিক জমি তার ফুফুতো ভাইরা চাষ করত, এক সঙ্গে তাদের ফসল উঠত। তার ফসলের

হিসাবও আলাদা থাকত না। রহীম নিজেও চাষের কাজে সাহায্য করত।

ইস্কুল ছাড়ার কিছু কাল পরে সে কলকাতা চলে যায় তাদের এলাকার এক পরিচিত ব্যক্তির ছাগলের আড়তে কাজ নিয়ে। এই কাজ করার সময় কিছু টাকা সে সঞ্চয় করেছিল এবং শহরের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হয়েছিল।

ছাগলের আড়তের কাজ ও আবহাওয়া তার ভালো লাগত না। তার লেখাপড়া করার আকাংক্ষা সেখানে মিটত না। তাই সে অন্য পথ খুঁজছিল। একজন প্রেসের কম্পোজিটার তাদের পাড়ায় থাকত, তার সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই সূত্রে সে প্রেসে গিয়ে কম্পোজিটারের কাজ শেখে। অবশ্য আড়তের মালিককে বলে কয়েই যায়।

তার প্রস্তাবে মালিক আপত্তি করেনি, বরং তাদের মধ্যে এইভাবে একটা সমঝোতা হয় যে প্রেসে কাজ শেখবার সময় রহীম আড়তেই থাকবে আর খাবে এবং আংশিক সময় কাজ করবে। তাতে তার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। কাজ শেখার পর যখন সে প্রেসে কাজ নেয় এবং বেতন পায় তখন সে একটা মেসে থাকার ব্যবস্থা করলেও আড়তের মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, খাতাপত্রের কাজে তাকে সাহায্যও করে বিনা বেতনে। সম্পর্কটা পরেও থেকেছে।

কলকাতায় কাজ করবার সময় রহীম কখনো কখনো দেশে যেত। তার ফুফুতো ভাইদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল। লোকমানকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল একবার। তার জমির ফসল তার ভাইরাই ভোগ করত, খাজনাও দিত। পরে কিন্তু সেই জমি এবং তার বাস্তুভিটা পর্যন্ত কায়দা করে নিজেদের নামে খারিজ করিয়ে নেয় এবং রহীমকে তার মালিকানা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করে।

এই সংবাদ জানবার পর থেকে রহীম তাদের এই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির জন্য বিরক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দেয়।

রহীম ও লোকমানের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তারা দুজনেই লেখাপড়ার চর্চা করত। রহীম যে লোকমানের মামুর অঞ্চলের লোক, লোকমান সে কথা জানবার পর যোগসূত্র তাদের আরো মজবুত হয়।

কম্পোজিটারি করা ছাড়া লোকমান তার পরিচিত মেশিন-ম্যানের কাছে মেশিন চালাবার কাজও অবসর মতো শিখতে আরম্ভ করে। তার সঙ্গে রহীমও যোগ দেয়। এই বিদ্যা শিখে তারা দুজনেই স্বতন্ত্রভাবে মেশিন চালাবার দক্ষতা কিছু অর্জন করলে।

এই সময়ে প্রেসের মালিক দুজন কম্পোজিটারকে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেয়। প্রেস শ্রমিকদের ইউনিয়নের একটা শাখা এই প্রেসেও ছিল বটে কিন্তু তার সংগঠন তেমন জোরদার ছিল না। রহীম ও লোকমান ছিল ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির দুজন কর্মকর্তা। তারা ছাঁটাই নোটিসের প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং শ্রমিকরা তাতে সাড়াও দেয়।

কিন্তু দীর্ঘ সময় ধর্মঘট চলবার পর আর তাকে চালানো গেল না, অর্থনীতিক সংকটের মধ্যে তীব্র বেকারী সমস্যার সুযোগ নিয়ে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আপোস মীমাংসায় রাজি হ'ল না, ধর্মঘট ভেঙে গেল। শ্রমিকরা বিনা শর্তে কাজে যোগ দিতে লাগল। কিন্তু যোগ দিতে পারলে না রহীম আর লোকমান এবং আরো দু'একজন।

তখন থেকে রহীম ও লোকমানের বন্ধুত্ব আরো অন্তরঙ্গ হ'ল। রহীম লোকমানের মামুর বাড়িতেও পরিচিত হ'ল। সে রাত পার্টির নির্দেশে প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের এবং আরো কোন কোন শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হ'ল ; ইউনিয়নের কাজ করার মধ্যে দিয়ে সে ইতিমধ্যে একটা রাজনীতিক দলেও যোগ

দিয়েছিল। লোকমান সম্বন্ধে তুজনে পরামর্শ করে স্থির করলে সে একটা ছোট মেশিন কিনে নিজস্ব ছাপাখানা খুলবে।

বাজার মন্দা হলেও তখন কাজ কারবারের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ছোট ছোট কাজের চাহিদা বাড়ছে। অল্প পুঁজির উপর কারবার শুরু করলে এবং নিজের পরিশ্রমের উপর চালাতে পারলে কারবার চালানো যায়। রহীম কাজ যোগাড় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বললে।

হাতেম পুঁজির টাকা দিতে রাজী হ'ল, তবে বললে, শুরুতেই বেশি টাকা দোব না বাপু। তুই ছোট করে কাজ আরম্ভ কর, তোর মুরোদ বুঝি কারবার চালাতে পারিস কিনা, তখন দরকার হয় আরো দোব।

লোকমান ও রহীম অনেক দেখে শুনে একটা ছোট নতুন জাপানী মেশিন কিনে ফেললে। অন্য জায়গায় এই মেশিনের কাজ তারা দেখে এসেছে, ভালোই চলছে। দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা। তারা প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করলে। বছর তুইয়ের মধ্যে কারবার মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেল। এই কারবার তাদের তু'জনকে আরো নিকট করে আনলে।

হাতেমের ও তার পরিবারের সকলের সঙ্গেও রহীমের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হ'ল। মরিয়ম ও তার মেয়েরা পর্দা করে না তাকে; এমনিও তাদের মধ্যে পর্দার কড়াকড়ি নাই। রহীম সবাইকে লোকমানের সম্পর্ক ধরেই ডাকে। হামেশা সেখানে যায়, খায়ও মাঝে মাঝে। লেখাপড়ার চর্চা সে বরাবরই করত, এখনো করে। এ সম্বন্ধে নূরজাহান ও জাহানআরাকেও তাদের প্রথম পরিচয় থেকেই সাহায্য করে—লোকমানের অনুরোধে। মরিয়মকে লাইব্রেরী থেকে গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যের বই এনে দেয় পড়তে। এমনিভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি তাদের সকলের মধ্যেই একটা আকর্ষণ সৃষ্টি

করে দেয় রহীম। এ বিষয়ে প্রথমে তাদের উপর লোকমানের কিছু প্রভাব ছিল। কিন্তু রহীমের প্রভাব পড়ে অনেক বেশি।

হাতেম ও মরিয়ম লোকমান সম্বন্ধে অনেক আগেই স্থির করে ফেলেছিল যে তার সঙ্গে নূরজাহানের বিয়ে দেবে। এটা যে ঘটবে তা তাদের আত্মীয়রাও ধরে নিয়েছিল, কারণ মামাতো-ফুফুতো সম্পর্কে অনেক সময়েই এমনি ঘটে থাকে। লোকমানও অবশ্য তা জানত এবং তার অমতও ছিল না। অপেক্ষা শুধু তার কারবার মজবুত বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাবার।

এই পরিবারের সঙ্গে রহীম যখন বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, সকলে তার স্বভাব-চরিত্র ও ব্যবহারের পরিচয় পেলে, তখন থেকে সে বিশেষভাবে পড়ল মরিয়মের নজরে। সে রহীমের কাছে তার আত্মীয়-পরিজন ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলে। সে যে শৈশবেই মা-বাপকে হারিয়েছে এবং এখন তার আত্মীয় বলতে যে প্রায় কেউই নাই, এ-কথা জানবার পর মরিয়ম তার উপর যথেষ্ট স্নেহবর্ষণ করতে লাগল। ক্রমে সে প্রায় লোকমানের পর্যায়ে উঠে গেল। তখন থেকে মরিয়মের মনের একান্তে বাসনা জাগতে লাগল রহীমের সঙ্গে জাহানআরার বিয়ে দেবার।

এই বাসনা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করতে করতে অনেকদিন পরে কথাটা ব্যক্ত করলে হাতেমের নিকট। হাতেম আপত্তি জানালে। মোলায়েমভাবে বললে, রহীম ছেলে ভালো, কিন্তু চালচুলো নেই, রুজিরোজগার করে না। আমার মেয়েকে রাখবে কোথা? খাওয়াবে কী? এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ঠিক তিক্ততা না হলেও কিছু উত্তাপও প্রকাশ পেলে। মরিয়ম মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'ল, ব্যথিত হ'ল যে হাতেম তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলে। কিন্তু ইচ্ছা ত্যাগ করলে না সে।

লোকমান তার প্রেসকে দাঁড় করাবার জন্য রহীমের সাহায্য পেয়েছে নানাভাবে এবং প্রচুর পরিমাণে। সে জন্য তাকে একটি পয়সা খরচও করতে হয়নি। সে সাহায্য না পেলে তার পক্ষে এত

অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি উন্নতি করা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। এ কথা সে জানে এবং রহীমের কাছে তা যখন তখন এমনভাবে স্বীকার করে যে রহীম নিজেই সেজন্য বিব্রত বোধ করতে থাকে। সে রহীমের নিকট নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করে এবং সময় সময় ভাবে তার সঙ্গে জাহানআরার বিয়ে হতে পারে কি না।

লোকমানের সঙ্গে যে তার বিয়ে হবার কথা তা নূরজাহানও জানত। কথাটা যখন পাকাপাকি স্থির হয়ে গেল তখন আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকল না। জাহানআরাও অবশ্য শুনেছে। কিন্তু তার নিজের বিয়ে সম্বন্ধে কোন কথা শোনেনি; প্রকাশ্যভাবে তাদের পরিবারের মধ্যে তেমন কোন কথা ওঠেনি কোন দিন।

দুই বোনেই তারা শ্রদ্ধা করে তাদের রহীম ভাইকে। তার নিকট তারা কত কথা শোনে, কত বিষয় শেখে। কত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার সঙ্গে, মাঝে মাঝে তর্কও করে। তর্কটা করে বেশি কিশোরী জাহানআরা। কোন বিষয়ে তর্ক করে যখন সে রহীমকে হারাতে পারে না, অথচ তার বক্তব্য মেনে নিতেও চায় না, তখন মন্তব্য করে, আমি আপনার ও কথা মানতে পারি না রহীম ভাই। আপনি খালি নিজের কথা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান। তা কিন্তু চলবে না।

যারা সেখানে উপস্থিত থাকে—নূরজাহান, মরিয়ম, লোকমান—সকলেই তার এই ছেলেমানুষের মতো কথা শুনে হেসে ওঠে। তারা জানে এভাবে কথা বলতেও শিখেছে সে রহীমের কাছে। রহীম কিন্তু তার তারিফ করে বলে, এটা ওর স্বাধীন মনের পরিচয়। এখন হয়তো ও আমার কথা খণ্ডন করার জন্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না, কিন্তু ওর যে এখনো কিছু বক্তব্য আছে তা বেশ বোঝা যায়।

জাহানআরা বলে, সত্যিই তো বক্তব্য আছে। আজ না হয় আর একদিন শুনতে পাবেন। আমি আরো ভেবে দেখি।

তার ছেলেমানুষী দেখে আবার সকলে হাসে।

এ সবের মধ্যে দিয়ে সে ধীরে ধীরে, হয়তো নিজের অজান্তেই,

রহীমের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। লোকমানের মতো রহীমের প্রতিও তার শ্রদ্ধার আকর্ষণ আছে, আবার স্নেহের টানও আছে, যেমন আছে নূরজাহানের। এ সত্য সে নিজেও জানে। কিন্তু তার নতুন আকর্ষণ সম্বন্ধে তার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

মরিয়ম হাতেমের কাছে রহীমের সঙ্গে জাহানআরার বিয়ের প্রশ্ন তোলার কিছুদিন পর রহীম একটা নতুন বিষয় লক্ষ্য করলে, যদিও সে তাদের স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার বিষয় কিছুই জানত না। হাতেম তাকে যথেষ্ট স্নেহ করত এবং সেইভাবেই ব্যবহার করত তার সঙ্গে। এখন সে লক্ষ্য করলে হাতেমের সঙ্গে তার দেখা হলে তার ব্যবহার ও কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন আন্তরিকতার অভাব, যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। একবার নয়, পরপর কয়েকবারই সে তা লক্ষ্য করলে।

তখন রহীমের মনে খটকা লাগল। ভাবলে যে কারণেই হ'ক, সে হয়তো এই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। হয়তো বা কারো মনে এমন চিন্তা আছে যে জাহানআরা বড় হয়ে উঠছে বলে তার আর জাহানআরার সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়, এবং সেই কারণে ঘন ঘন আসাও উচিত নয়। নিজের কাছে তার যৌক্তিকতাও সে অস্বীকার করলে না। অবশ্য হাতেম ছাড়া অন্য কারো ব্যবহারের মধ্যে এই পরিবর্তন সে খুঁজেও বার করতে পারেনি। তবুও বাড়ির মালিকের কথাই তাকে বড় করে ভাবতে হ'ল।

রহীম তখন থেকে সংযত হয়ে গেল। সে ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দিলে। এখন আর ঘন ঘন আসে না সেখানে। আসে কর্তব্যের প্রয়োজনে—মরিয়মের জন্য বই নিয়ে বা এমনি কাজে, অথবা কেউ বিশেষভাবে ডাকলে। লোকমানের সঙ্গে কথা বলবার প্রয়োজন হলে তার প্রেসেই যায়, পূর্বের মতো বাড়িতে এসে কথা বলে না বা আড্ডা দেয় না।

লোকমান তা লক্ষ্য করলে। লক্ষ্য করলে মরিয়মও, তার মেয়েরাও। কিন্তু কেউ তার কারণ বুঝলে না, অথচ সকলেরই মনে

হ'ল একটা কিছু কারণ ঘটেছে। লোকমান মনে মনে অনেক গবেষণা করেও স্থির করতে পারলে না ব্যাপারটা কী, কিন্তু সরাসরি রহীমের কাছে কথাটা তুলতেও তার সংকোচ বোধ হ'ল—পাছে শুনতে হয় তার পক্ষে বিরক্তিকর কিছু ঘটে গেছে। সে মরিয়মকেও কিছু বলতে পারলে না।

শিক্ষা ও আলাপ আলোচনার ব্যাপারে হাতেমের মেয়েরা রহীমের কাছে যে সুযোগ পেত তা লোকমানের কাছে পেত না। সে কারণে জাহানআরা নিজেকে বঞ্চিত বোধ করতে লাগল রহীম আগের মতো না আসাতে। সে ভাবলে তার মাকে বলবে রহীম কেন আসছে না। কিন্তু বলবে ঠিক করেও বলতে পারলে না, সংকোচ বোধ করতে লাগল, পাছে তার মা মনে করে রহীমের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। সে শক্ত হয়ে থাকল। কিন্তু যতই শক্ত হতে চায় ততই মনে ব্যথা পায়।

কথাটা বললে নূরজাহান। কিন্তু মরিয়ম জবাব কী দেবে? তার মনে যে কথা উঠছে তা সে প্রকাশ করতে পারে না। তাই বাজে উত্তর দিলে : ছেলেটা হয়তো বেশি কাজের মধ্যে পড়ে গেছে, সময় পায় না বেশি আসবার।

নূরজাহান এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হ'ল না। জাহানআরা শুনলে, সেও হ'ল না। নূরজাহান বললে, আমি একবার রহীমভাইকে সুধিয়ে দেখব কী বলেন, কেমন মা?

মরিয়ম ভয় পেয়ে গেল পাছে কোন অবাঞ্ছিত উত্তর দেয় সে। বললে, না, এখন সুধোতে হবে না। সময় পেলে সে আবার আসবে আগের মতন।

একদিন যখন রহীম লাইব্রেরী থেকে বই দিতে এল, মরিয়ম তাকে বসতে বলে রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল। মেয়েরা দুজনেই তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল।

মরিয়ম নিজে এক কাপ চা আর কিছু খাবার এনে দিয়ে রহীমের সামনে বসল। মুখ তার গম্ভীর। রহীম বুঝতে পারলে না এই

গাম্ভীর্যের কারণ কী। মেয়েদের দুজনের একজনকেও দেখতে না পেয়ে তার মনে সন্দেহ জাগল সে যা ভেবেছে সেটাই হয়তো ঠিক। ভাবলে তাই হয়তো একটা কিছু বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে।

চা আনা হয়েছে দেখে রহীম হাসিমুখে বললে, মামীমা, এই জন্যেই কি আমাকে বসতে বললেন?

না, কথা আছে। তখনো তার মুখ গম্ভীর।

রহীমের মুখও গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, কী কথা মামীমা?

বলছি, তুমি চা খেয়ে নাও।

তার খাওয়া হয়ে গেলে মরিয়ম বললে, রহীম, তুমি কী কর আজকাল?

যা এতদিন করছিলাম তাই করি, নতুন তো কিছু করি না। কিন্তু এ-কথা কেন জিগেস করছেন?

তবে কেন তুমি এখানে আসা ছেড়ে দিয়েছ?

জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে রহীম বললে, সে কী মামীমা, এই তো এসেছি। মাঝে মাঝে তো আসি।

এ রকম আসা না আসারই শামিল। সত্যি করে বল তো রহীম, কী হয়েছে? কেউ কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? ছোট মেয়েটা বড্ড ঠোঁটকাটা, সে কি কিছু বলেছে? আমি কি কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি কোন সময়ে?

মরিয়মের এ সমস্ত প্রশ্ন রহীমের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিলে। এ সব কথার কী উত্তর দেবে সে! এদের ব্যবহারে সে তো কেবল মুগ্ধ হয়নি, আকৃষ্ট হয়েছে। যা কখনো আশা করেনি তা পেয়েছে এখানে। এত স্নেহ দেবার পর মরিয়ম প্রশ্ন করছে সে কোন অন্যায় কথা বলেছে কি না তাকে! মিনিটখানেক তার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

কৈ, জবাব দাও-না যে রহীম? কোমল কণ্ঠে বললে মরিয়ম।

এরপর আর সে সংযত থাকতে পারলে না, আবেগে ভেঙে পড়ল।

বললে, এ-সব কথার কী জবাব দোব মামীমা? আপনি আমাকে অন্যায় কথা বলতে পারেন এমন কথাও আমাকে শুনতে হ'ল আজ! মামীমা, ক'বছর আগেও আপনাকে দেখিনি আমি, আপনার পরিচয় পাইনি। আমার মায়ের কথাও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন এখানে এসে মায়ের স্নেহ পেলাম আপনার কাছে। যিনি এমন করে অজস্র মাতৃস্নেহ ঢেলেছেন আমার মাথার ওপর, তিনি আমাকে বলবেন অন্যায় কথা বলেছেন, আর তা-ও আমায় শুনতে হবে! মামীমা না বলে উচিত ছিল আপনাকে মা বলা। আগে সে কথা মনে ওঠে নি। আজ না ভেবে পারছি না।

হঠাৎ উঠে সে মরিয়মের পা-দুটো দুহাত দিয়ে স্পর্শ করলে। মরিয়ম তার মাথায় একটা হাত ঠেকালে কিন্তু কোন কথা বলতে পারলে না। তখন তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। রহীমের চোখ দুটোও সজল হয়ে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নির্বাক নিস্পন্দ বসে রইল। মনের মধ্যে তাদের কত কথা উঠতে পড়তে লাগল। রহীম একবার ভাবলে সে একটু নাটক করে ফেলেছে। পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করে নিলে—ঠিকই করেছে সে। এ স্নেহের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। এতদিন যে তা হয়নি সেটাই ছিল অন্যায়।

মরিয়ম ভাবলে রহীমকে ছেলের মতো বুকে টেনে নেয় কিন্তু পারলে না। এ সন্দেহ তার মন থেকে গেল না যে একটা কিছু অসংগত ব্যাপার না ঘটলে এ-ছেলে এমন করে তাদের থেকে সরে যেতে চাইত না। কেবলি তার মনে হতে লাগল হাতেম কিছু বলেছে তাকে।

প্রকৃতিস্থ হয়ে চোখ মুছে সে বললে, দেখ বাবা রহীম, তুমি যা বললে তারপর আমিও মনের কথা না বলে পারছি না। আমার দুই মেয়ে আছে। ছেলেও একটা ছিল কিন্তু সে পয়দা হবার অল্প দিন বাদেই আমার কোল খালি করে চলে যায়। লোকমানকে পেয়ে তাকেই দেখেছি ছেলের মতো। তারপর তুমিও এলে। তোমাকেও

দেখি একই নজরে। আমার ছেলের সাধ তোমরা দুজনে মিটিয়েছ। তবু যদি দেখি তুমি এখন আমার পর হয়ে থাকতে চাও, মনে বড় লাগে বাবা। তাই বার বার জানতে চাইছি কেউ কিছু বলেছে কিনা তোমাকে। মেয়েরা কিছু বলেছে কি?

মামীমা, আপনি যেমন মায়ের স্নেহ দিয়েছেন, ওরা তেমনি দিয়েছে বোনের স্নেহ। আমাকে আঘাত দেবার মতো কোন কথা এ বাড়িতে কেউ বলেনি কখনো। তবে এখন আর মিছে বলা সম্ভব নয় আপনার কাছে। আমি আগের মতো আসি না সত্যি। কারণ একটু আছে তার। কিন্তু সেটা আপনাকে বলতে পারব না, ছেলে বলে আমায় মাফ করবেন। তা হলেও এইটুকু বলছি আপনাকে যে আমার মনে হয়েছে এখানে আমার আগের মতো ঘন ঘন আসা উচিত নয়। সমাজ তো আছে। নূরজাহানের কথা বাদ দিলেও জাহানআরা রয়েছে এখানে।

মরিয়মের নিকট এখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠল তার পূর্বের সন্দেহ—হাতেম তাকে খোলাখুলি না হলেও ইঙ্গিতে জানিয়েছে রহীমের এখানে আসা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ সে গুম হয়ে বসে থাকল। পরে শুধু বললে, আমি আর কী বলব বাপ! তবে মাকে যেন একবারে ভুলে থাকিসনে, মাঝে মাঝে দেখা দিস।

রহীম যেন শ্রান্ত ক্লান্ত মন নিয়ে আর উঠতে পারছিল না। তবু জোর করে উঠে আবার মরিয়মের পা দুটোয় হাত ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কথা বলবার সাধ্য ছিল না তার। কোনদিকে না তাকিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে রহীম আমতলী গেল রোস্তমের সঙ্গে। তার মধ্যে কয়েকবার এসে দেখা করে গেছে মরিয়মদের সঙ্গে। ঘটনাটার কথা তারা দুজনে ছাড়া আর কেউ জানলে না। কেউ অপরকে বলেনি, নিজেদের মধ্যেও তারা এর উল্লেখ করেনি। কেবল একটা নতুন দৃষ্টি নিয়ে তারা এখন দেখে পরস্পরকে, ভাবে একটা নতুন সম্পর্কের কথা।

তিন

সকালটা বেশ ঠাণ্ডা। বাইরে ঘাসের মাথায় শিশিরবিন্দু। কিন্তু সামনে মাঠ-ভরা হালকা মিষ্টি রোদ দেখে প্রাণ যেন নেচে ওঠে রহীমের। একসঙ্গে এত রোদের ঘটা অনেকদিন চোখে পড়েনি তার। মনে পড়ল তার ছেলেবেলার কথা যখন এমনি মাঘের সকালে সে তার গ্রামে ফুফুর বাড়ির পাশের ছোট ছোট খেজুর গাছ থেকে রসের ভাঁড় নামিয়ে আনত, সে রসে মুড়ি ভিজিয়ে খেত, বেশি রস পেলে জ্বাল দিয়ে গুড় তোয়ের করত। শিশির-ভেজা পা দুটো কনকন করত কিন্তু এমনি রোদের মিঠে তাপ লাগলে আর কষ্ট বোধ হ'ত না।

মুখ হাত ধুয়ে সে উঠনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে এমন সময় রোস্তম আর দায়েম চা আর নাশতা নিয়ে এল। চা খাওয়া তখনো শেষ হয়নি, এল দানেশ। সে বাড়ির মধ্যে রোস্তমের মায়ের কাছে রহীমের কথা শুনে বাইরে এল দেখা করতে। রোস্তম পরিচয় করে দিলে, এই আমার বড় ভাই।

দানেশ শুনে এসেছিল তারা চা খেয়ে বেড়াতে বেরোবে। রোস্তমকে জিজ্ঞেস করলে, কোথা নিয়ে যাবি বেড়াতে?

ভাবছি মোল্লাপাড়া যাব দেলখোশ চাচার বাড়ি। সেখান থেকে চণ্ডীপুরে জলধরের বাড়ি। লোকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে কথাবাত্রা বলতে বলতে দেরি হবে তো। ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, ছোট বেলা, দুপুর হয়ে যাবে বৈকি, দানেশ সায় দিলে। শহরের মানুষ, লোকে কথা শুনতে চাবেই ওনার কাছে। রহীমের দিকে ফিরে বললে, আপনি আর আমাদের এ-দেশে কী-ই বা দেখবেন! মানুষ তো সবই গরিব, বিছে-বুদ্ধিও কিছু নেই। যাই হ'ক, এসেছেন যখন দেখে যান।

রহীম বললে, গরিব তো ভাই দেশের প্রায় সব লোকই। শিক্ষাও তারা পায় না। শুধু গাঁয়েই তো নয়, শহরেও তাই। যাই হ'ক, দেখে যাব আমি যতটা পারি।

মেহমানের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কী করছিস? মাছ-টাছ আছে? প্রশ্ন করলে দানেশ।

দায়েম ছুটো খেয়া দিয়ে যা পারে ধরে দেবে, বললে রোস্তম।

থাক, দায়েমকে আর ধরতে হবে না। আমি এখুনি জাল ফেলব, যা পাই দিয়ে যাব তোদের বাড়িতে। আছে আমার পুকুরে, ভালো মাছও উঠতে পারে, দানেশ আশ্বাস দিলে।

এ রকম ব্যবহার দানেশ করে থাকে। পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টন করে নেবার পর যখন একেবারে পৃথক হয়ে গেল, নিজে আলাদা সংসার পাতলে, তখন রোস্তমদের প্রতি তার আক্রোশের কোন কারণ থাকল না আর। সে এখন আর তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে না, তাদের খোঁজ খবর নেয়, প্রয়োজন হলে মুরুব্বিয়ানাও করে। বাইরের লোকে দেখলে তার ব্যবহার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে না। অবশ্য সে দুনিয়াদার মানুষ। ভালোই বোঝে তার এ ব্যবহারের প্রতিদানও আছে। আর সমাজে বাস করতে হলে আত্মীয়-বন্ধুর প্রয়োজনও হয়।

মোল্লাপাড়া মাইল দুয়েকের পথ। গ্রামটা আমতলীর চেয়ে একটু বড় হবে। তবে বেশ কয়েক ঘর সম্পন্ন চাষীর বাস এখানে। দেলখোশ মোল্লা তাদের একজন। তকড়া চেহারা, মুখভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার চুল প্রায় সবই কালো। বয়স ষাট পার হয়েছে কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ দেহ। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বাড়ির পাশের বেগুনখেতের বাইরে এক নাতিকে কোলে নিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে দেখছেন ভিতরে তাঁর এক ছেলে বেগুন তুলছে।

রোস্তম পিছন থেকে গিয়ে, আদাব চাচা, বলতেই মোল্লা ঘুরে

দাঁড়িয়ে তাদের দেখে বলে উঠলেন, কে রে বাবা, রোস্তম এসিছিস? আদাব। আয় আয়, ঘরে এসে বোস। ভালো আছিস তো সব? তোর মা কেমন আছে?

হ্যাঁ চাচা, সবাই ভালো আছে। রহীমের দিকে চেয়ে মোল্লা বললেন, এনাকে তো চিনতে পারছি না বাবা?

ইনি রহীমভাই, আমার ভাইয়ের দোস্ত। কাল আমার সাথে কলকাতা থেকে এসেছেন বেড়াতে।

রহীম হাত তুলে বললে, আদাব। আপনাদের আবাদ এলাকায় আসিনি কখনো, তাই একটু দেখতে এসেছি।

বেশ বেশ, ভালো করেছ বাবা, এসো বোসো। তিনি তাকে নিয়ে বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসালেন। ইতিমধ্যে রোস্তম বেগুন-খেতে মোল্লার ছেলের সঙ্গে দু একটা কথা বলে এল।

দাওয়ার পূব দিকে একখানা তক্তপোশ পাতা আছে, তার উপরে মাদুর। ঘরখানার একপাশে একটা বড় কামরা। তার বাইরে অন্য পাশে বড় চওড়া খোলা মেঝে। দুটোর সামনে লম্বা দাওয়া। একপাশে একটা ছোট জলচৌকি। দক্ষিণ দুয়ারী ঘর।

রোস্তম, তুই যা বাড়িতে দেখাসাক্ষেৎ করে আয়। আমার এই নাতিটাকেও নিয়ে যা। আমি এনার সাথে দুটো কথা বলি। যেয়ে এক বদনা পানি দিয়ে যেতে বলবি। আর শোন, তোরা খাবি কী বল দিকিন? ঘরে তো নেই কিছু। তোমরা বাবা, শহরে পাঁচ রকম জিনিস খাও-দাও। আমাদের আবাদে শুধু ভাত। তিন বেলাই আমরা ভাত খাই। এই একটু বেলা হলেই একথালা পান্তা-ভাত খাব, পেটটা ঠাণ্ডা হবে। তা দ্যাখ রোস্তম, তোর চাচিকে বলগে দুটো মুড়িটুড়ি থাকে তো দিতে। আর কলা আছে বোধ হয়। না রে, গাই দোয়া হয়েছে হয়তো, দুধ দিতে বলবি। না হয় দৈ আছে। দৈ চলবে তো বাবা? গুড় দিয়ে? চিনি-টিনি পাবে না আমাদের এখানে।

রহীম বৃদ্ধের সরলতা ও আগ্রহ দেখে উৎসাহের সহিত বললে, দৈ খুব চলবে চাচা।

তাই দিতে বলগে রোস্তম। দৈ আর গুড় আর কলা। বেশি করে দিতে বলবি। না কি আমি যাব?

না চাচা, তোমাকে যেতে হবে কেনে, আমিই বলছি, হেসে জবাব দিলে রোস্তম। বেশি আর কত খাব? আমরা তো একবার খেয়ে বেরিয়িছি এখুনি।

রোস্তমের বাপের সঙ্গে মোল্লার হৃদ্যতা ছিল দীর্ঘকালের। পাশা-পাশি গ্রাম থেকে দুজনেই আসে আবাদ এলাকায় প্রায় একই সময়ে। সেই সময় থেকে এখানেই তাদের পরিচয় ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। দুই পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও যাতায়াত আছে।

মোল্লার অবস্থা রোস্তমদের তুলনায় অনেক ভালো। প্রায় ৬০ বিঘা আবাদী জমিতে কেবল ধান হয়। বসত বাড়ির সঙ্গে আরো কয়েক বিঘাতে পাট ও তরিতরকারির চাষ আছে। তিনখানা লাঙল। তার উপযুক্ত মোষ-বলদ। দুই জোয়ান ছেলে চাষে খাটে। মাহিন্দার আছে দু'জন, মরসুমে আরো জনদুইকে রাখা হয়। কয়েকটা গাই আছে, দুধ হয় প্রচুর। দুটো পুকুর আছে। একটা বেশ বড়, আর মাছে বোঝাই। ঘরে খাওয়া ছাড়া মাছ হাটে বিক্রী করা হয়।

অবস্থা ফিরেছে গত ১০।১৫ বছরেই বেশি। প্রায় অর্ধেক জমি কেনা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। ধানের ওপর বাড়ি নিয়ে আয় বেড়েছে, আর সংকটের মধ্যে অভাবে পড়ে লোকে সস্তায় যে জমি বিক্রী করেছে তাই কিছু কিছু কেনা হয়েছে।

গ্রামের মধ্যে মোল্লা একজন মাতব্বর ব্যক্তি। শিক্ষিত না হলেও বুদ্ধি-বিবেচনা ভালো। বিপদে-আপদে লোকে পরামর্শ করতে আসে, ঠেকে পড়লে সাহায্যও পায়। সময় বিশেষে দু দশ টাকা ধার নিলে তাঁকে সুদ দিতে হয় না। জোর-জুলুম কারো ওপর

করেন না তিনি। ছোট বড় সকলের সঙ্গেই মিষ্টি কথা বলেন। লোকের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে মিটিয়ে দেন। ছেলেরা দুজনেই বাপের অনুগত। তিনি নিজে আর চাষে খাটেন না বেশি, দেখা-শোনাটাই করেন।

মোল্লা রহীমকে বললেন, হ্যাঁ বাবা, কলকাতায় তুমি আমাদের লোকমানের সাথে কাজ-টাজ কর বুঝি ?

জি হ্যাঁ, আগে করতাম। এখন সে নিজে আলাদা কারবার শুরু করেছে।

বাড়ি তোমার শহরেই, না কি আর কোথাও ?

জি না, বাড়ি আমার এই জেলাতেই, বসিরহাট এলাকায়।

বসিরহাট এলাকায় ? কোন্ গাঁয়ে গো ? মোল্লা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন।

কুতুবপুর—চেনেন নাকি ? সেখানেই বাড়ি আমার।

চিনি বৈকি বাবা, কুতুবপুর চিনব না ? আমাদের বাড়ি যে তার কাছেই—হামিরপুর। আমার বাপ-দাদার ভিটে যে সেখানেই গো। আবাদে তো আমিই এসিছি। আমার ভাইপোরা সেখানেই আছে, যাওয়া আসা আছে আমাদের। এই আবার যাব মনে করছি। সেখানে তাদের চাষবাস আছে, ফল তরিতরকারি খুব হয়। নারকোল, খেজুর গুড় কত। ঐ সব জিনিস তো সেখান থেকেই আনি আমরা। নারকোল তো বাবা, অনেক চেষ্টা করেও এখানে ফলাতে পারা গেল না।

মোল্লার মনে বাল্যস্মৃতি জেগে ওঠে, "নিজ এলাকার" গর্ব বুক ভরে তোলে।

এই সময়ে তাঁর ছেলে আর রোস্তম এল প্রচুর দৈ, গুড় আর কলা নিয়ে।

এনিছিস ? বেশ। নাও বাবা, খাও।

ছেলেকে বললেন, জালটা নিয়ে যা, ভালো দেখে মাছ ধরে আন। শহরের মেহমান, খেতে দোব কী ?

রোস্তম বললে, না চাচা, আমরা এখুনি চলে যাব। চণ্ডীপুর হয়ে বাড়ি যেয়ে ভাত খাব।

তাই কি হয় বাপু? খাওয়া দাওয়া করে তবে চণ্ডীপুর যেতে হয় যাবি। না খেয়ে কি যেতে আছে?

এই নিয়ে কিছুক্ষণ বৃদ্ধের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে রোস্তম জিতলে। তিনি নিরাশ হয়ে শেষে রহীমের দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে আর কী করব বল বাবা নেহাত যদি না থাকতে পার তোমরা।

রহীম বললে, এ তো ঘর কথা চাচা। আবার এক সময়ে এসে খেয়ে যাব।

বেশ, তাই কোরো বাবা। রোস্তম, তা হলে একটা মাছ ধরে কাল পাঠাব তোদের বাড়ি। মোল্লা এইভাবে রফা করলেন।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে তারা চণ্ডীপুরে উঠল জলধর পাত্রের বাড়ি। জলধর রোস্তমের মতো ছোটখাটো চাষী। লোকমানের সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। সেই সুবাদে রোস্তম তাকে দাদা বলে। লোকটি ভালো। বিশেষ কোন উপলক্ষ ঘটলে তারা পরস্পরকে ডাকে, খোঁজখবর নেয়। জাতে নমশূদ্র, কণ্ঠিধারী বোষ্টম। চাষ করে সংসার চালায়। তার সঙ্গে হাটে হাটে কিছু টুকিটাকি জিনিসের কারবারও করে—সিঁদুর, আলতা, আরসি, চিরুনি, পূজাপার্বণের বই ইত্যাদি। তাতেও কিছু রোজগার হয়।

তারা গিয়ে দেখে জলধর তার পুকুরে জাল ফেলছে। তোলা হলে দেখা গেল শুধু গণ্ডা বারো কৈ মাছ উঠেছে—বড় আর মাঝারি আকারের কৈ।

তাদের পরিচয় হলে রহীম হেসে বললে, আপনি যে দেখছি পুকুরটায় শুধু কৈ মাছই জিইয়ে রেখেছেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, কৈ ছাড়া অন্য মাছ এতে নেই বেশি, একটু গর্বের সহিত বললে জলধর। রোস্তম, যাবার সময় গোটাকতক নিয়ে যাস ওনার জন্যে।

হ্যাঁ, কে তোমার মাছ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বল! আমার মাছের যোগাড় হয়ে গেছে। আজ দিয়েছে বড় ভাই। কাল দেলখোশ চাচা পাঠাবে বলেছে।

তা পাঠালেই বা। এ মাছ তো ধর গিয়ে মরবে না। জিইয়ে রেখে দিবি ছ্'দিন, বললে জলধর। সে ছাড়লে না, এক কুড়ি কৈ নিয়ে যেতেই হ'ল রোস্তমকে।

চণ্ডীপুর আরো ছোট গ্রাম—২৫/৩০ ঘরের বাস। তার মধ্যে ধনী আছে এক ঘর—গায়েনরা। জলধর বললে, প্রায় হাজার ডেড়েক বিঘে জমিন তাদের। চাষ তাদের ভাগেই খুব বেশি, ঘরে শুধু খান-চারেক হাল রেখেছে। বড় অত্যাচারী। ভাগীদার হ'ক, জন মাহিন্দার হ'ক, কারো সঙ্গে ভালো ব্যাভহার নয়। সকলেই অসন্তুষ্ট। কথায় কথায় সবাইকে মারধর করে। তাদের পাইক-পেয়াদাও তেমনি শয়তান।

রহীম। লোকে কিছু বলে না? সব সহ্য করে যায়?

জলধর। কী আর বলবে? সবাই গরীব মানুষ, খেটেখুটে খায়। দায়ে পড়লে ধর গিয়ে ওদেরই কাছে হাত পাততে হয় সবাইকে।

রহীম। যা দেখছি, জমি বোধ করি অনেক লোকেরই নাই। অথচ একটা লোকের হাতে দেড় হাজার বিঘে?

জলধর। ডেড় হাজার কী বাবু? পাঁচ দশ হাজার বিঘেও যে আছে এক একজনের হাতে। একা মহেশ দাসেরই আছে ধর গিয়ে বারো হাজার বিঘের ওপর।

রহীম। এ সব জমি তাদের টাকা দিয়ে কেনা?

জলধর। কিনতে হবে কেনে? অনেক জমিন কেনা বটে, বাকি ঠকিয়ে নিয়েছে। যখন ধানের দর পড়ে গেছল, তখন এক টাকা পাঁচসিকে দরে ধান বেচে চাষীর ধর গিয়ে সব্বনাশ হয়ে গেল। যারা ছোট ছোট চাষী ছেল, আমাদের মতন, তারা বেশির ভাগ শেষ হয়ে গেছে। ঐ দরে ধান বেচে কাপড়-চোপড় নুন-তেল কিনবে, না খাজনা দেবে? ধানের দর পড়ে গেল, খাজনা তো কমল না। ঐ

সব চাষী মহাজনদের কাছে ধার করেছে, আর সেই দেনার দায়ে মহাজনরা ধর গিয়ে মাটির দরে তাদের জমিন কিনে নিয়েছে। তারাই এখন সেই জমিন ভাগে চাষ করে, নয়তো জন খেটে মাহিন্দারী করে খায়।

রোস্তম। আরো কত রকম জোচ্চুরি ঠগবাজি আছে।

জলধর। তা আছে বৈ কি। লাটদার চাষীকে জমিন দিয়েছে বন্দোবস্ত করে। সে জমিনে ফসল ভালো হচ্ছে দেখে খাস করে নেবার মতলব হ'ল। অমনি করলে কী জানেন বাবু? ফসলে মাঠ ভরে রয়েছে। রাতারাতি লোক লাগিয়ে গনের সময় ভেড়ি কেটে ধর গিয়ে নোনা জল ঢুঁকিয়ে মাঠ বুড়িয়ে দিলে। নোনা জল তো, ধানগাছ বাঁচবে কেনে? সমস্ত মাঠ অমনি ফরসা হয়ে গেল। তখন ফসল নেই তো চাষী খাজনা দেবে কোত্থেকে? জমিন ধর গিয়ে নিলেম হ'ল, ডেকে নিলে লাটদার। যার জমিন সে হয়তে জানতেও পারলে না নিলেম হচ্ছে। চাষী হ'ল সব্বস্বান্ত। এখন জন খেটে খাও, নইলে ফসলের আদ্দেক ভাগ দিয়ে চাষ কর।

রহীম। ও, তাতেই বুঝি এক একজনের হাতে হাজার হাজার বিঘে, আর হাজার হাজার লোকের এক বিঘেও নেই?

জলধর। হ্যাঁ বাবু, ঠিক তাই। এমনি জোচ্চুরি আরো আছে। রোস্তম, জানিস তো কুমীরখালির পাত্তরকে? আমরাও বোষ্টম, তাই বলতে লজ্জা করে। লোকটা ছেল বোষ্টম—ঐ বুড়ো সতীশ পাত্তর। এক সময়ে ধর গিয়ে লোকটা এল, কিচ্ছু নেই তার। খোলকত্তাল নিয়ে ভিক্ষে করে খায়। আস্তে আস্তে একটি কুঁড়ে বেঁধে আখড়া করলে। ভিক্ষের পয়সা জমিয়ে ধান কিনে টানাটানির সময়ে গরীব লোককে বাড়ি দিতে লাগল। জানেন তো আমাদের আবাদে বুনোরা আছে। ওরাই ধর গিয়ে এক কালে বনজঙ্গল সাফ করে জমিন হাসিল করে চাষ-আবাদ শুরু করেছেল। পোষ পাব্বনে ওদের হুঁশজ্ঞান থাকে না, মেয়েমদ্দ সব মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। শাক্ত কিনা, সব কালী পুজো করে যে।

রহীম। আচ্ছা, ঐ পাত্র কী করলে?

জলধর। সেই কথাই বলছি বাবু। খামারে ধর গিয়ে ঝাড়া ধান পড়ে আছে, চুরি কেউ করে না—পোষ মাসে তখন সবায়ের ঘরেই তো ধান—আর ওরা হল্লা করছে নেশা করে। ওদের এই অবস্থা, তাই ঠিক সময় বুঝে পাত্তর এল তার বাড়ি ধান আদায় করতে। সইয়ে স্থদ, ডেড়া স্থদ, তারও হিসেব নেই পত্তর নেই। ওরা বলে দিলে ঐ খামারে ধান আছে, তোর পাওনা যা হয় নিয়ে যা। গাদা থেকে ধর গিয়ে এক মণের জায়গায় তিন মণ নিলেও কেউ কিছু বলবে না। বলবে কে, ওরা কি তখন মানুষ আছে! পাত্তর খুশী মতন ধান চুরি করলে। সেই ধান বেচে ধর গিয়ে জমিন কিনলে। সে জমিন তো ছেল ঐ বুনোদেরই। এখন দেখুন ভিক্ষে করে আর জোচ্চুরি করে সতীশ পাত্তর আজ আট শ বিঘের মালিক। তাই নয় রে রোস্তম?

রোস্তম। হ্যাঁ, এখন তার জমিন আট শ বিঘে হবে।

রহাম। এ তো ভারি অন্যায় কথা!

জলধর। অন্যায় বলছেন বাবু, কত অন্যায় যে চলছে তার কি হিসেব আছে? এই দেখুন না আমাদের মধুখালির হাট। কাল যান তো দেখতে পাবেন। হাট ধর গিয়ে একজনকে ইজারা দেয়া আছে। মোটা টাকা লাভ করে সে। সেও তো জোচ্চুরির কারবার। সামান্য তরি-তরকারি বেচতে যাবে লোকে, কি ছুটো মাছ নিয়ে যাবে, কি হয়তো পাঁচ সের চাল, তার ওপর ধর গিয়ে তোলা-বটি দিতে হবে, নইলে হাটে বসতে পাবে না। বেশিবাশা মাল থাকে, কি ধরুন কাপড় চোপড় থাকে, তার ওপর কিছু নাও তবু বুঝি। তা নয়, গরিবগুনোকে কেমন করে মারবে সেই ফিকিরেই ধর গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। গরিবদের পক্ষে কেউ নেই বাবু!

কিছু পারিবারিক কথাবার্তা, ফসলের ফলন, খাজনা-দেনা ইত্যাদি সম্বন্ধেও তারা আলাপ করলে। শহরের কথা, লোকমানের

কারবারের কথাও হ'ল। রহীম কী ধরনের কাজ করে তাও জানতে চাইলে জলধর।

শুনে সে মন্তব্য করলে, শহরে তো বাবু, এ সব কাজ করেন আপনারা, কিন্তু আমাদের চাষীকে দেখবার কেউ নেই। আবাদের ভেতর তো এ-সব কথা কোন দিন শোনেওনি কেউ। এখানে লাটদার-মহাজনরাই ধর গিয়ে রাজা। যা খুশী করে যাচ্ছে, আর মরছে যত চাষী, মাহিন্দার, গরিব জনমজুর। তাদের পক্ষ হয়ে ছুটো ভালোমন্দ কথা বলবার লোক ধর গিয়ে কাউকে দেখছিনে আজো। আমরা খালি অদেষ্ট ধরে বসে আছি, আর ভগমানের নাম করছি।

রহীম এ সব কথা শুনবে বলে এখানে আসেনি, শুনতে পাবে আশাও করেনি। এই অঞ্চল সম্বন্ধে তার প্রায় কোন ধারণাই ছিল না, তাই এ সকল বিষয় নিয়ে কারো কাছে প্রশ্নও তোলেনি—অন্তত তখন পর্যন্ত। তবে এখানে যে অধিকাংশ কৃষকের নিজস্ব জমি নাই এবং খেতমজুরদের সংখ্যা ও অবস্থা একটা সংকটের বিষয়, এ প্রশ্ন তার মনে ছিল। এ সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছাও ছিল।

জলধরের সঙ্গে আলাপ করবার পর রহীমের মনে অনেক নতুন কথা জেগে উঠল। শহরে তার কাজের মধ্যে সে যে ধরনের রাজনীতিতে অভ্যস্ত সেই রাজনীতি তার মনকে এখানকার অবস্থার দিকেও আকর্ষণ করলে। তার বেড়াতে আসার মধ্যে থেকে যেন নতুন এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বেরিয়ে এল।

জলধর আবাদ এলাকায় বাস করে। এখানে আধুনিক সভ্যতার প্রায় কোন চিহ্নই দেখা যায় না। সে এখানকার অন্যান্য সাধারণ কৃষকদের মতো একজন কৃষক, সুখেদুখে কোন প্রকারে সংসার চালায়। একেবারে নিরক্ষর না হলেও সে প্রায়-অশিক্ষিত ব্যক্তি। রাজনীতিক আন্দোলন বলতে যে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নাই।

এহেন ব্যক্তির মুখ থেকে যে সমস্ত কথা শুনলে রহীম সে তার পক্ষে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতাকে সে মনে মনে গুরুত্ব না দিয়ে পারলে না। এ অভিজ্ঞতা তাকে নতুন এক সমস্যার বিষয় নিয়ে চিন্তা করার প্রেরণা যোগালে।

পরদিন মধুখালির হাটে আবার তার দেখা হ'ল জলধরের সঙ্গে, মোল্লার সঙ্গেও। হাট যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও অবশ্য সওদা কেনাবেচার জায়গা, কিন্তু সেই সঙ্গে এখানে বিভিন্ন গ্রামের লোকের মোলাকাতের ক্ষেত্র। বেশ বড় হাট, বহু লোকের সমাগম হয়। নানা ধরনের পসরার বিকিকিনি চলে।

যে কথা আগের দিন জলধর বলেছিল তার পরিচয়ও পেলে রহীম। সত্যিই ইজারাদারের লোকেরা ইচ্ছামতো তোলা-বটি নিচ্ছে। মাথায় করে সামান্য শাকসবজি, পাতিলেবু, কাঁচকলা বা পাকা কলা, পেঁপে, লাউ ইত্যাদি যে যা এনেছে বিক্রী করে দুটো পয়সা পাবে বলে এবং তাই দিয়ে দরকারী জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাবে বলে, তার মধ্যে থেকেও কতকটা অংশ তারা প্রায় জোর করেই নিয়ে যাচ্ছে, তার কোন হিসাব নাই। অথচ বিক্রেতা কৃষকরা তাদের বাধা দিতে পারছে না, অসহায় বোধ করছে। অন্যান্য ধরনের ব্যাপারীদের থেকে তারা নিচ্ছে নগদ পয়সা, তবে তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়।

জলধর নিজের দোকান ছেড়ে রহীম ও রোস্তমকে সঙ্গে করে হাটের কতকগুলি জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখালে। এই তোলা-বটি আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক ও ব্যাপারীদের মধ্যে বিক্ষোভ রয়েছে। জলধর ও রোস্তমের পরিচিত কয়েকজন বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলেও দেখলে রহীম। তাদের মধ্যে অসন্তোষ গভীর। এর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি সে করলে না।

পরে জলধর বললে তাকে, দেখলেন তো বাবু, কত অন্যায়-অত্যাচার চলছে লোকের ওপর। ভগমান এর বিচার আবার কবে করবে বলুন তো !

চার

ইয়োরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে কয়েকমাস হ'ল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের মেহেরবানীতে ভারতবর্ষও তাতে জড়িত হয়েছে। কিন্তু তখনো ভারতে যুদ্ধের চেহারা প্রকট হয়নি। তাহলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে তেজিভাব আস্তে আস্তে প্রকাশ পাচ্ছে, যদিও মন্দাভাব কেটে গিয়েছিল অনেক আগেই। ধানচালের ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দর একটু একটু করে বাড়ছে।

হাতেমের মাছের কারবার ভালোই চলছিল, এখন তার অবস্থার আরো উন্নতি হচ্ছে। লোকমানের প্রেস দাঁড়িয়ে গেছে, খরচপত্র বাদ দিয়ে এবং তার নিজের ধার্য বেতনের হিসাব বাদ দিয়েও কিছু কিছু মুনাফা থাকছে। বিশেষ করে এখন মরসুমের মধ্যে কাজ তার খুব বেড়ে গেছে, সারাদিনের মধ্যে অবসর পায় না সে। তার ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়ার ফলে ছাপাটা ভালো হয় অথচ বাজার দরের তুলনায় রেট বেশি নয়। আর রহীম কয়েকটা ছোট কিন্তু ভালো পার্টি যোগাড় করে দিয়েছিল, তাদের কাজ নিয়মিত আসে, বিল আদায় করতেও বেগ পেতে হয় না।

প্রেসের কারবারের অবস্থা দেখে তার মামু এখন বুঝেছে যে সে লোকমানের জন্য এই প্রেসে যে টাকাটা লগ্নী করেছিল সেটা অপাত্রে যায়নি। লোকমান নিজে এখন চিন্তা করছে যে উন্নতি যেভাবে হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে এই সামান্য আয়তন থেকে কারবারকে বাড়াতে না পারলে চলবে না। যুদ্ধ যে শীঘ্রি শেষ হবে না, বরং আরো তীব্র হয়ে উঠবে, রহীমের সঙ্গে রাজনীতি করার ফলে সে ধারণাটা তার স্পষ্ট হয়েছে। তাই সে ভাবে এই সময়ে অন্তত একটা বড় মেশিন কিনে নিতে পারলে ভালো হয়।

কিন্তু মনের এই কথাটা সে ভরসা করে কারো কাছে ব্যক্ত করতে পারেনি, রহীমের কাছেও না।

রহীম আমতলীর হাটের পরেও দিন দুই কাটিয়ে আরো অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে যেদিন কলকাতা ফিরে এল, তার পরদিন তার এই অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবে বলে লোকমানের সঙ্গে দেখা করতে গেল তার প্রেসে। সে জানত লোকমান ব্যস্ত থাকবে। এসে দেখলে তার অনুমানের চেয়ে সে বেশি ব্যস্ত। লোকমান তাকে দেখে খুব খুশী হ'ল কিন্তু আলাপ করতে পারলে না। বললে, ভালো করে সমস্ত কথা শুনতে চাই তোমার কাছে। সে এখানে হবে না। তার চেয়ে শনিবার সন্ধ্যেবেলা এসো। রাত্রে থাকবে আমার ওখানেই। যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে তাহলে।

প্রস্তাবটা রহীমের সংগত মনে হ'ল বটে, তবু প্রথমে মনে একটু কিন্তু দেখা দিলে। পরে বললে: বেশ, তাই যাব, তবে যেতে একটু দেরি হতে পারে।

সে ইচ্ছা করেই দেরি করবে স্থির করলে যাতে তার যাবার আগে লোকমান নিশ্চিত বাড়ি পৌঁচে যায়।

শনিবার আসতে তখনো দেরি আছে। ইতিমধ্যে সে তার কয়েকজন রাজনীতিক সহকর্মী ও নেতার সঙ্গে তার আবাদ এলাকা ভ্রমণের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করলে এবং বললে, সত্যি কমরেড, এই গরীব চাষীগুলোর ওপর বড় অন্যায় জুলুম চলছে। এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। আমাদের পার্টির কিছু করা উচিত।

করা উচিত—সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না, সকলেই একমত। প্রশ্ন হ'ল সেজন্য লোক চাই। লোকও এমন হতে হবে যে অবস্থা বিবেচনা করে নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে পারবে। তেমন ফরমাশী কর্মী ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। শহর নয়, গ্রাম এলাকা, তায় আবাদ অঞ্চল। সভ্য জীবনের সুযোগ সুবিধা কিছুই পাওয়া যাবে না সেখানে। তার মধ্যে গিয়ে মাটি কামড়ে

পড়ে থাকা যার-তার কর্ম নয়। জেলা কেন্দ্রের অবস্থাও এমন নয় যে এই কাজের জন্য এখনি তেমন কর্মী ছেড়ে দিতে পারে।

অতএব এটা একটা সমস্যার আকারে থেকে গেল আপাতত। এ সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে একটা ফয়সালা করতে হবে।

শনিবার সন্ধ্যায় সে একটু দেরি করেই গেল। লোকমান তার অনেক আগেই বাড়ি পৌঁচেছে। বাড়িতে সে মরিয়মকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল রহীম আসবে সেদিন। রহীমের প্রতীক্ষাই করছিল তারা। সে পৌঁচতেই হাতেম ও লোকমানের সঙ্গে খেতে বসল। মরিয়ম পরিবেশন করলে।

হাতেমও শুনেছে রহীম আমতলী গিয়েছিল। তাকে দেখে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে আলাপ করলে। বললে, রোস্তমদের ওদিকে বেড়াতে গেছলে শুনলাম। কেমন দেখলে গো ওদিকের অবস্থা ?

অবস্থা দেখে মনে হ'ল মানুষগুলো দুনিয়ার বাইরে বাস করে, জবাব দিলে রহীম।

লোকমান মুখ টিপে একটু হাসলে। মরিয়ম বললে, দুনিয়ার বাইরে বাস করে বলছ কেন রহীম ?

সে হাসি মুখে বললে, তা নয়তো কী বলুন মামীমা ? দুনিয়ার মাত্র দুটি জিনিস আছে সেখানে—এক হ'ল মাটি আর হ'ল পানি। মাটিতে হয় ধান আর পানিতে হয় মাছ। আর সেখানে কী আছে বলুন ? আপনিও তো দেখেছেন।

সকলেই হেসে উঠল। কাছে বসে ছিল নূরজাহান, সেও হাসলে। জাহানআরাকে তখন দেখা গেল না সেখানে।

তা কথাটা বলেছ বাপু, এক হিসেবে ঠিকই, হাতেম তার মন্তব্য অনুমোদন করলে। এই ধর না আমাদের বাড়ি যে এলাকায় সেখানকার গাঁয়ে বাস করলেও আজকালকার দুনিয়ার সুযোগ সুবিধে অনেক পাওয়া

যায়। কিন্তু আবাদ এলাকায় যাও, খুশী মতন এক পেয়ালা চা-ও পাবে না, দু সের চিনি কিনতে চাইলে তাও যোগাড় করা মুশকিল। রাস্তাঘাটের অভাব, রেল তো নাইই। দুনিয়ায় কী হচ্ছে খবরটা যে পাবে তারও উপায় নেই। তার ওপর ইস্কুল নেই, ডাক্তার নেই। আমি যাই যখন রোস্তমদের বাড়ি তখন ইচ্ছে হয় না যে দু একদিন থাকি।

রহীম তার নিজের মন্তব্যের বাস্তবতার সঙ্গে যে প্রচ্ছন্ন পরিহাস-টুকু ছিল তাকে এখন ঢাকবার চেষ্টা করে বললে, তবে এ-কথাও বলছি লোকমান, ঐ এলাকার মানুষগুলোকে আমার বেশ ভালো লাগল। নিরীহ সাদাসিধে মানুষ। মেহমানের জন্যে যত্ন খুব। সামান্য পরিচয়েই মন খুলে কথা বলে, সংকোচ করে না।

মরিয়ম এবার একটু আনন্দিতই হ'ল। হাসিমুখে বললো, তা-হলে তুমি শুধু মাটি আর পানিই দেখে আসনি, মানুষও দেখেছ।

তা দেখেছি বৈ কি মামীমা, নইলে আমার বেড়াতে যাওয়াই তো বেকার হ'ত, বললে রহীম।

লোকমান প্রসংগটা পরিবর্তন করলে। বললে, আচ্ছা, এই যুদ্ধের ব্যাপারটা কেমন মনে হচ্ছে বল তো রহীম? আমাদের দেশেও যুদ্ধের ধাক্কা লাগবে নাকি?

এই বিষয় নিয়ে দু'চার কথার পরে তারা খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

লোকমানের ঘরে একটা বড় তক্তপোশ ছিল। সেখানে সে আর রহীম শুয়ে শুয়ে দীর্ঘ সময় গল্প করে কাটালে। আমতলী এলাকা প্রসঙ্গে মানুষের অভাব অভিযোগ নিয়ে কোন রাজনীতিক প্রসঙ্গ সে খাবার সময় ইচ্ছা করেই তোলেনি, এখন বিস্তৃতভাবে বললে লোকমানকে। সে সম্বন্ধে তার কমরেডদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তাও জানালে।

লোকমান বললে, সত্যি, ওখানকার জন্যে আমাদের একটা ব্যবস্থা করা উচিত। আমার এলাকা যখন, আমারই যাওয়া উচিত

ছিল। কিন্তু আমি এখন প্রেস নিয়ে যা ফেঁসে গেছি, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।

অন্যান্য কথার মধ্যে লোকমান বললে, তুমি যে আমতলী গেছ সে কথা মামীমা আমার কাছে শুনেছিল। তুমি যে যাবার আগে বলে যাওনি সে জন্যে দুঃখ করছিল। খুব ভালবাসে তো তোমাকে।

মামীমা সত্যিই বড় স্নেহ করেন, বললে রহীম। কিন্তু তুমি কি বললে তাঁকে ?

বললাম, সে যখন যাবে ঠিক করেছিল তখন আর তার বলে যাবার সময় ছিল না, লোকমান উত্তর দিলে।

একটু পরে আবার বললে, আচ্ছা, তুমি দেখছি কিছুদিন থেকে আমাদের এখানে আগের মতো আস না, খুব কম আস। কারণ কী বলতো ?

রহীম একটু হেসে বললে, কারণ আবার কী ? এমনিই।

না রহীম, তুমি গোপন করো না আমার কাছে। কেউ কিছু বলেছে কি তোমাকে ?

লোকমান, তুমি জান আমি এ বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করি। যদি বলি কেউ কিছু বলেছে আমাকে, তা হলে মিথ্যে অপবাদ দেয়া হবে।

তা আমি জানি রহীম। কিন্তু তুমি আগের মতো না আসাতে কী ক্ষতি হচ্ছে তাও জানি আমি, তুমি হয়তো জান না। আমি এক সময়ে ওদের দুই বোনকে খানিকটা শিক্ষা দিয়েছিলাম। মাস্টার রেখে মামু ওদের যে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিল তার মধ্যে এ শিক্ষা পায়নি ওরা। তখন মামীমার শিক্ষাতেও কিছু সাহায্য করেছিলাম। তারপর তুমি যখন থেকে আসছ এখানে তখন থেকে ওরা সকলেই আরো ভালো শিক্ষা পেয়েছে। আজকাল ওরা যে ধরনে কথা বলে তাও তোমারই শিক্ষার ফল। তুমি না এলে এতখানি আমার দ্বারা হ'ত না ভাই। মামীমারও তোমার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা।

আমি না এলেও ও কাজ তোমাকে দিয়ে হতে পারে লোকমান।

তুমি যা করেছ তা হবে না, কিছু হতে পারে। কিন্তু এখন যে একদম সময় পাই না। সকালেই বেরিয়ে যাই আর রাত্রে ফিরি ক্লান্ত হয়ে। তখন আর কিছু করার মতো অবস্থা থাকে না, সকাল করে শুয়ে পড়ি। তাই বলছি তোমার আসা দরকার।

রহীম শুনে চুপ করে থাকল। মিনিটখানেক পরে বললে, দেখ লোকমান, তোমাকে যা বলছি এ কথা কারো কাছে বলো না যেন। মামীমা একলা হলে আমি আসতে পারতাম। নূরজাহান থাকলেও হয়তো আসতে আমার আপত্তি হ'ত না, কারণ সে জানে তার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু জাহানআরার অবস্থা অন্য রকম। তার বয়স বাড়ছে। আর আমি যতই ঘনিষ্ঠ হই, বাইরের লোক। এখন তুমিই বল আমাদের কি বেশি মেলামেশা করা উচিত? যত কম করেই মানো, সমাজকে একেবারে অমান্য করতে পার না। আমার হয়তো উচিত ছিল আরো আগে থেকে আসা কম করা।

লোকমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও তার মামুর ব্যবহারের কথা তার কাছে সে প্রকাশ করতে পারলে না, পাছে সে ভুল বুঝে বসে। অবশ্য হাতেমের আজকের ব্যবহার তার ভালোই লেগেছিল, স্বাভাবিক বোধ হয়েছিল, কিন্তু তার মনে হয়েছিল তখন যে এই পরিবর্তনের কারণ তার আগের মতো ঘন ঘন না আসা।

আমি অবশ্য সে ভাবে দেখিনি জিনিসটা, বললে লোকমান। তবে তোমার যুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেও আমি বলছি এখানে অন্তত কেউ তোমার মেলামেশাকে খারাপভাবে দেখত না, অথচ যে সাহায্যটা হচ্ছিল সেটা চলতে থাকত।

রহীম তখন অন্য একটা যুক্তি দিলে। বললে, খারাপভাবে না দেখলেও এর মধ্যে যে একটা আশংকা থাকে তা নিশ্চয় স্বীকার করবে। ধর যদি জাহানআরা কোন কারণে আমার দিকে আকৃষ্ট

হয়ে পড়ে, সেটা কি ঠিক হবে? দুর্বলতা আমার দিক থেকেও আসতে পারে।

লোকমান একটু জোরেই হেসে ফেললে। বললে, তা হলে ভয়ানক একটা বিপদ ঘটে যেত তার, কী বল? আকৃষ্ট যদি হ'ত তো হ'ত, তাতে ক্ষতিটা কী হ'ত শুনি? তুমি যে তার জন্যে খুব একটা অযোগ্য পাত্র এ কথা কেউ বলেছে নাকি তোমাকে?

কেউ না বললেও আমি বলছি। তুমি হাসলে বটে লোকমান, কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করতে পার যে সংসার করতে হলে তার আর্থিক দিকটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত?

সে দিক থেকে তোমার যোগ্যতা যে আমার চেয়ে কম এ কথা আমি মানি না। আমার প্রেসকে দাঁড় করাতে তোমার সাহায্য যে কত মূল্যবান তা তো আমার অজানা নয়, লোকমান কথাটা জোর দিয়ে বললে।

যদি ধরেও নেই যোগ্যতা আমার আছে, তা হলেও সেটা তো আপাতত কাজে লাগছে না, ভবিষ্যতে লাগবে কিনা তাও এখন অনিশ্চিত। বরং লাগবে না-ই নিশ্চিত। তা ছাড়া, ব্যবসা করতে হলে পুঁজি লা.গ।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হ'ল না, এখানেই থেমে গেল, যদিও লোকমানের আরো বক্তব্য ছিল। তার মনের কোণে ছিল রহীমকে তার কারবারের মধ্যে টেনে নেবার ইচ্ছা, কিন্তু রাজনীতিক প্রয়োজনের বিষয় বিচার করে সে কথা তাকে বলা উচিত হবে কিনা স্থির করতে পারলে না তখন।

পরদিন ভোরে উঠে হাতেম বেরিয়ে গেল; তার কাজের জন্য হামেশা যায়। সকালে লোকমানও সাইকেল নিয়ে বেরোল। যাবার আগে রহীমকে বললে, এ বেলা থাকছ তো?

না, চলে যাব।

তাহলে নাশতা করে যেয়ো। আমি এখুনি ঘুরে আসছি একটু কাজ সেরে। এসে একসঙ্গে নাশতা করব।

লোকমান বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে মরিয়ম এসে বললে রহীমকে, এ বেলা থাকবে তো বাবা ?

না মামীমা, যাব একটু পরে।

কেন, তেমন কোন কাজ আছে কি ?

না, জরুরী কাজ কিছু নেই।

লোকমান গেল কোথা ?

সে কোথা কাজে গেছে। বলে গেছে এখুনি ঘুরে এসে একসঙ্গে নাশতা করবে, বললে রহীম।

তা তুমি থাকতে চাইছ না কেন ? আমার ওপর রাগ করনি তো ?

সে সম্বন্ধে তো একদিন আমাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে মামীমা। আবার অমন কথা বলে আমায় কষ্ট দিচ্ছেন কেন ?

মরিয়ম হেসে বললে, আচ্ছা বাবা, আর বলব না। তুমি বড় অভিমানী ছেলে। যাই হ'ক, লোকমানের কথায় তুমি নাশতা করে যেতে রাজি হয়েছে, আমার কথায় দুপুরে খেয়ে যেতে পারবে না ?

জরুরী কাজ যখন নেই মামীমা, তখন আপনার কথা আমার পক্ষে আপনার হুকুম।

তাতেই তো বলি বাবা, তুমি না এলে আমার কষ্ট হয়। তোমার কথা শুনতে আমার বড্ড ভালো লাগে, বলে মরিয়ম চলে গেল।

রহীম ভাবতে লাগল তার প্রতি মরিয়মের স্নেহ যে নিতান্ত অকৃত্রিম ও আন্তরিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই স্নেহের মাত্রা কি আগের চেয়ে বেশি হয়েছে ? সে কি তার এখানে আসা কমে গেছে বলে ?

তার এ ধারণা একেবারে ভুল নয়। জাহানআরার বিয়ের প্রসংগ নিয়ে যেদিন হাতেমের সঙ্গে মরিয়মের মত-বিরোধ হয়, তখন থেকে তার মনে হয়েছে হাতেম রহীমের প্রতি অবিচার করেছে এবং সেই অবিচারের ভাগী তাকেও হতে হয়েছে। সেই বাবদ রহীমের জন্য

ক্ষতিপূরণের আগ্রহে তার আন্তরিক ব্যাকুলতাই এইভাবে তার স্নেহের গভীরতা বাড়িয়ে তুলেছে।

কিন্তু তাতেও সে তুষ্ট হতে পারছে না। সে এখনো ভাবে কী উপায়ে রহীমকে নিশ্চিতভাবে আরো নিকট করে আনা যায়, সে জন্য কী উপায়ে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে স্বামীকে রাজি করা যায়।

অনেক ভেবেচিন্তে একদিন সে এক মতলব বার করলে। ভাবলে যদি কিছু আয়ের সম্পত্তি মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দেওয়া হয় তাহলে সেই আয় থেকে তার দিন গুজরান হয়ে যাবে, রহীমের নিজের উপায়-উপার্জন না থাকলেও চলবে। হাতেমকে বললে, এদিকে তো অনেক জমি কিনে ফেলে রেখে দিয়েছ, তাতে ফায়দা কী হচ্ছে?

সস্তায় কেনা আছে এ সব জমি, পরে দেখবে দর হবে ভালো। তখন বিক্রী করলে বুঝতে পারবে ফায়দা কী হ'ল। তবে তার দেরি আছে।

এইভাবে জমি কিনে ফেলে না রেখে যদি শহরের ভেতরে বাড়ি কিনে কি তৈরী করে রাখা যায়, তা হলে কেমন হয়? প্রশ্ন করলে মরিয়ম।

কিন্তু আমি তো সেখানে বাস করতে পারব না, কারবারের জন্যে আমাকে এদিকেই থাকতে হবে, বললে হাতেম।

আমি সেখানে যেয়ে আমাদের বাস করার কথা বলছি না, তবে ভাড়া দিলে এখুনি তো কিছু আয় হবে। টাকাটা বেকার পড়ে থেকে লাভ কী?

হাতেম একটু ভেবে বললে, সেটা মন্দ যুক্তি নয়। যা টাকা রয়েছে তাই দিয়ে ভালো বাড়ি অন্তত একটা কেনা যেতে পারে, ছোটখাটো বাড়ি হলে দুটোও পাওয়া যেতে পারে। এরপর আবার দর তো উঠতে থাকবে।

পাঁচ

মাসখানেক পরে একদিন রাত্রে লোকমান এল রহীমের বাসায়। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে এক বস্তির পাশে একখানা পুরোন পাকা দোতলা বাড়ির দোতলার একটা ছোট কামরায় সে থাকে। বাড়িখানা কয়েকজন প্রেস কর্মচারী মিলে ভাড়া নিয়ে মেস করে আছে। রহীম তাদের সঙ্গে আছে কয়েক বছর হয়ে গেল। লোকমান পূর্বে প্রায়ই আসত এখানে। দুজনে মিলে রাজনীতির বই পড়ত, আলাপ আলোচনা করত।

ঘরে আসবাবের মধ্যে আছে একটা ছোট তক্তপোশ, ছোট রাস্তামার্কা টেবিল ও চেয়ার, একটা ষ্টিল ট্রাঙ্ক আর একটা মাঝারি সাইজের ফাইবারের স্যুটকেস। তা ছাড়া খাবার জলের কুঁজো ও গেলাস, কিছু প্লেট-পেয়ালা। চায়ের কাপ, একটা সস্‌প্যান আর কেটলি। স্টোভও আছে একটা। কাপড়চোপড় রাখবার ও প্রয়োজন হলে শুকোবার জন্য দুটো তার লাগানো আছে। আর আছে কতকগুলো বই কাগজ আর খাতা।

দু বেলা খায় সে মেসে। তার জন্য হিসাব মতো টাকা দিতে হয়, আর দিতে হয় ঘরের ভাড়া। এই টাকা সে নিয়মিত দিয়ে যায় অন্য খরচ কমাতে হলেও। তাতে তার থাকা খাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করতে হয় না। সে এখানে না থাকলেও তার ঘর ঠিক থাকে। মেসে যারা থাকে তারা সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে, তার রাজনীতি সমর্থন করে। জন দুই পার্টি কমরেডও আছে তাদের মধ্যে। তাদের সাহায্যে তার ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ এবং ইউনিয়ন মেম্বারদের রাজনীতিক তালিমের কাজ চালায়।

রহীম এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরে খেয়ে এসে বসেছে। লোকমানকে দেখে হেসে বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব কতবার ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই সময় করতে পারিনি। যাক, তুমি নিজেই এসে পড়েছ।

কী এত কাজ তোমার যে সময় প্যাও না? চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে বললে লোকমান।

সে আর বলো না। নতুন ঝঞ্ঝাট এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে। এই সময়ে ইউনিয়নের হিসাবপত্র ঠিক করতে হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন কাজের ভার পড়েছে এবার। বলছি পরে। তুমি কী মনে করে এলে বল। আমি যাইনি বলে খোঁজ নিতে, না এমনিই?

হ্যাঁ, খোঁজ নিতেই বটে, তা ছাড়াও একটু কথা আছে। মামীমা তো তোমার জন্যে পাগল। কদিন ধরে রোজই বলছে, খবর নিয়ে আয় ছেলেটার অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি, নইলে এত-দিনের মধ্যে একবারও আসে না কেন? শুধু মামীমার কথাই নয়, মেয়ে দুটোকেও তো জাদু করে রেখেছ। জাহানআরা কিছু বলে না বটে, কিন্তু নূরজাহানও রোজ বলে খবর নিতে। তা তোমার ব্যাপার কী বলতো? এমন ডুব মেরে রয়েছ কেন?

রহীম হেসে উঠল, ডুব মেরে আছি, না? আর কী কথা আছে বললে?

লোকমান মুচকে হেসে বললে, আর—নতুন কথা কিছু নয়। যেটা ঘটবে বলে কথা ছিল সেটা ঘটতে যাচ্ছে এখন। মানে মামু এবার বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছে। এই বোশেখে, আর মাসখানেক মাত্র বাকি।

রহীম লাফিয়ে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, মোবারক হ'ক, মোবারক হ'ক! তারপর তার একখানা হাত ধরে জোরে নাড়া দিয়ে আবার বসল। বললে, তাহলে এবার তুমি সত্যিই চতুষ্পদ হচ্ছ লোকমান!

এতে অবশ্য রোম্যান্স কিছু নেই। সবই তো ঠিক হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই, কেবল সময়টাই ছিল ঠিক হতে বাকি। আমিও ভেবে দেখলাম হবেই যখন তখন আর দেরি করেই বা লাভ কী? কারবারটা তো এখন মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

ঠিকই বলেছ, আর দেরি করা উচিত নয়, রহীম সমর্থন জানালে।

বিয়ে-ফিয়ে যা হবার সে তো হবে। কিন্তু অন্য একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। আমি ভাবছি এবার একটা বড় মেশিন কিনব। পুরোন ডবল-ডিমাই একটা দেখে রেখেছি। ভালো জার্মান মেশিন।

নিজে চালিয়ে দেখেছ?

হ্যাঁ, খুব ভালো চলে। বেশি পুরোন নয়, ভালো অবস্থায় আছে। এখন তোমাকে একবার দেখতে হবে। দুজনে মিলে চালিয়ে দেখব।

রহীম কী ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলে, কাল দেখা যেতে পারে? ধর বিকেলের দিকে?

তা পারবে না কেন? তুমি প্রেসে এসো, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

ওখানেই বসাবে তো?

হ্যাঁ, সেই তো ভালো হবে। আমার শেডে জায়গা তো অনেক আছে। ভাড়া কিছু বেশি দিতে হবে বলে ওটা প্রথমে নিতে চাইনি, তোমার কথাতেই রাজি হলাম। এখন দেখছি নিয়ে ভালো করেছি।

দরদস্তুর করেছ?

তাও করেছি। দর এক রকম ঠিকই হয়ে গেছে। তবে আমি কিছু কমাবার কথা বলেছি, ও পক্ষের শেষ কথার অপেক্ষা করছি। আর না-ও যদি কমায় তবু নোব ঠিক করেছি। তার আগে তুমিও দেখে বলবে ওদের দামেই নেয়া যায় কিনা।

টাকাটা মামুই তো দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। নইলে আমি অত টাকা কোথা পাব? কারবারটা চালু

হয়ে গেছে দেখে মামু এখন খুশী, এখন বিশ্বাস করে আমি নিতান্ত অকেজো লোক নই। লোকমান হাসলে।

একটু পরে আবার বললে, বেশ, কাল তুমি তাহলে আসছ? আর আমাদের বাড়ি আসছ কখন? মামীমাকে একটা জবাব দিতে হবে তো। তা ছাড়া তোমার নতুন ঝঞ্ঝাটের কথা বলছিলে, সেটা কী?

মামীমাকে বলবে অসুখও নয় বিসুখও নয়, আমি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছি আর পরশু আসছি। এতদিন যে আসতে পারিনি সে ঐ নতুন দায়িত্বের কারণে। নিজে মজুর, এতকাল করেছি মজুর সংগঠনের কাজ। এখন আমার ওপর হুকুম হয়েছে কৃষকদের সংগঠন করতে হবে।

মানে? লোকমান বিস্ময় প্রকাশ করলে।

রহীম হেসে বললে, চোখ কপালে তুললে যে! মানে আবার খুলে বলতে হবে তোমাকে? সোজা কথাটা হচ্ছে এর পর আমাকে তোমাদের আবাদ এলাকায় গিয়ে নুন-পান্তা খেয়ে বাদায় ঘুরে বেড়াতে হবে—চা-বিস্কুটও নয়, নূরজাহানের স্নেহমাখা হালুয়াও নয়, আর শহর কলিকাতার পিচঢালা রাস্তাও নয়। এখন বুঝতে পারছ?

কৈ আর পারছি? আবাদের বাদায় তোমায় নির্বাসন করবার বা খুন করবার ব্যবস্থাটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু এতদিন কে কোথায় মেরে রেখেছিল তোমাকে?

ওঃ, সেটাও বোঝনি? বললে রহীম। এখন দেখছি তোমার মাথায় রাজনীতি ঢোকাবার চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছে। শোন, সেও একই ব্যাপার, তার প্রস্তুতিপর্ব। মজুর ঠেঙিয়ে কৃষক বানানো আর গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো প্রায় একই ধরনের সওয়াবের কাজ। সেই ঠ্যাঙানির দুরমুশ এতদিন চলছিল আমার ওপর। এক কুক্ষণে চাষীর ছেলে শহরে এসে মজুর হলাম, আর এক কুক্ষণে মজুর হয়ে চাষীদের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে তাদের দুঃখ দেখে কাঁদলাম। তারপর আর আমার চাষী না হয়ে উপায় আছে! কিন্তু চাষী হতে হলে

তাদের সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে পুষ্ট ও সজ্জিত করে নিতে হয়। সে সব অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করবার সাধনায় এতদিন নিজেকে মশগুল রাখতে হয়েছিল আমায়। এখন যেটুকু সিদ্ধিলাভ করেছি তাকে সম্বল করে নতুন পথে যাত্রা হবে শুরু। নির্বাণ লাভের পথকে সোজা মনে কোরো না লোকমান!

তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তবে একটু দুঃখও হচ্ছে আমার তোমার জন্যে—বড় কঠিন কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে তোমার ওপর, লোকমান মন্তব্য করলে।

খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু করতে তো হবে কাউকে।

কবে যাবে ঠিক করেছ? গিয়ে আমাদের বাড়িতেই উঠবে তো? রোস্তমকে খবর দিয়েছ?

যাব দিন চার পাঁচের মধ্যে। প্রথমে রোস্তমের ওখানেই উঠব। তারপর ঠিক করব কোথায় থাকা দরকার। সম্ভবত বেশি দিন এক জায়গায় থাকা চলবে না। রোস্তমকে চিঠি একটা লিখে দিয়েছি আর জলধরকে জানাতে বলেছি।

ফিরবে কবে? সেখানে একটানা বেশিদিন থাকবে না নিশ্চয়?

তোমার বিয়েতে থাকতে হবে তো। তার মধ্যে এসে যাব। এবার মনে হয় একটা সার্ভে ধরনের কাজ করতে হবে আর দরকার মতো প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো করে নিতে হবে, রহীম বললে। কৃষকদের মধ্যে থেকে কিছু কমরেড বার করে নিতে না পারলে তো সংগঠন এগোবে না। জেলা কমিটি এখনি কিছু করতে পারবে না জানিয়েছে। কৃষক সমিতির কাজ তো চলবে সাধারণ কৃষকদের নিয়ে, কিন্তু সে কাজ চালাবার জন্যে তাদের মধ্যে থেকে কর্মী তৈরি করে নিতে হবে তো আগে।

রহীম হাতেমের বাড়ি গিয়ে দেখলে মরিয়মরা তিন মায়ে-ঝিয়ে বারান্দায় বসে কী একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে।

নূরজাহান প্রথমে অনুযোগ করলে, এতদিনের মধ্যে আমাদের কথা একবারও মনে পড়ল না রহীমভাই!

মরিয়ম বললে, সত্যি বাবা, একখানা পোস্টকার্ড লিখেও তো খবর দিতে পারতে। আমরা সবাই ভেবে সারা খোদা না করে রোগ-বেয়ারাম কিছু হ'ল নাকি। লোকমানকে বলি, সেও সময় পায় না, শেষে পরশু খবর নিয়ে এল।

রহীম জবাব দিলে, খুব অন্যায় হয়েছে মামীমা, আমার ঘাট হয়েছে, মাফ করবেন। আসব-আসব করে কতদিন কেটে গেছে, কিছুতেই সময় করতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, পোস্টকার্ড লিখে যে খবর দেয়া যেতে পারত সে কথা আমার মনেও ওঠেনি। চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস নেই, ও কাজটা আমায় করতে হয় না তো কখনো।

তারা তিনজনেই হেসে ফেললে। নূরজাহান বললে, আর আপনার ধারণা কলকাতা শহরে পোষ্ট অফিসও নেই, পোষ্টকার্ডও কিনতে পাওয়া যায় না।

মরিয়ম বড় মেয়েকে বললে, যা না মা, একটু চা করে আনগে তোর ভাইয়ের জন্যে। আর দেখিস খাবার কিছু আছে কি না।

হ্যাঁ যাই মা, বলে নূরজাহান উঠল। রহীম বললে, নূরজাহান বুবু, তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি শুনেছি সব লোকমানের কাছে।

নূরজাহানের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে দ্রুতপদে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। জাহানআরাও পাশের ঘরের মধ্যে চলে গেল।

রহীম বসেছিল মরিয়মের পাশের চেয়ারে। সে তার চেয়ার একটু ঘুরিয়ে নিয়ে সামনাসামনি বসল। মরিয়ম বললে, শুনছি তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছ ঐ মাটি-পানির দেশে?

সে হাসলে। বললে, হ্যাঁ মামীমা, আমাকে যেতে হচ্ছে। তবে কলকাতা একেবারে ছেড়ে যাচ্ছি না, আমার বাসাও ছাড়ব না। মাঝে মাঝে আসব। তবে সেখানকার কাজকর্মের অবস্থা না বুঝে

এখনি বলতে পারছি না কতদিন থাকতে হবে। এবার মনে হয় শীঘ্র চলে আসব, লোকমানের বিয়েতে থাকব বলেছি তাকে।

হ্যাঁ, আমিও বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে সেই কথা, বললে মরিয়ম। বিয়েতে তোমাকে থাকতেই হবে বাবা। এই আমার বাড়ির পয়লা কাজ।

সে কথা আপনাকে বলতে হবে কেন? শুধু লোকমানের বিয়ে হলেও থাকতে হ'ত আমায়, শুধু নূরজাহানের হলেও থাকতে হ'ত। এতো তাদের দুজনেরই বিয়ে, আর আপনারই বাড়িতে।

মরিয়ম গম্ভীর মুখে বললে, দেখ রহীম, এত কাল এত কথা বলেছি তোমাকে, তোমার কাছ থেকে অনেক জিনিস শুনেছি, শিখেছি—

আপনি আমার কাছে শিখবেন কী মামীমা? হাত দিয়ে মরিয়মের পা দুটো স্পর্শ করলে।

আচ্ছা বাবা, তোমার ভালো না লাগে বলব না ও কথা। কিন্তু শুনেছি তো ঢের। তবু কখনো তোমার কাজকর্মের কথা শুধুইনি তোমাকে। শুনি রাজনীতির কাজ। আমি সেকেলে মেয়েমানুষ, রাজনীতি বুঝিনে, রাজনীতির কোন বইও তোমরা এনে দাওনি কখনো পড়তে। কাজেই পড়েছি শুধু তুমি আর লোকমান যেসব বই এনে দিয়েছ—গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী, ইতিহাস, এমনি আরো কত কী। তার মধ্যে হয়তো কোথাও স্বাধীনতা আন্দোলনের বা এমনি কিছু রাজনীতির কথা আছে, তোমার কি লোকমানের কাছে তার মানে জেনে নিয়েছি। আজ কিন্তু রহীম, আমার ইচ্ছে হচ্ছে শুনি তোমার কাছে কিছু রাজনীতির কথা। শুনতে চাই, তোমার যদি আপত্তি না থাকে। শোনাবে তো আমাকে?

পাশের কামরায় তার দুই মেয়ে থাকে। জাহানআরা তখন বসে কী করছিল সেখানে। বাইরের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। রহীম তার নিজের রাজনীতির কথা বলবে জানতে পেরে সে হাতের কাজ ছেড়ে কান খাড়া করে বসল। রহীম কী ধরনের কাজ করে

জানবার আগ্রহ তার মনে আগে থেকেই ছিল কিন্তু কখনো প্রকাশ করতে পারে নি।

কেন শোনাব না মামীমা? আপনার কাছে গোপন করার মতো কী আছে এর মধ্যে? হাসিমুখে বললে রহীম। এতদিন বলিনি ইচ্ছে করেই—গোপন কথা বলে নয়, আপনার কোন ফায়দা হবে না ভেবে। শুনতেও হয়তো ভালো লাগত না।

তুমি তোমার রাজনীতির কাজ নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছ বলেই আজ আমার জানবার ইচ্ছে হচ্ছে এমন করে। ভাবছি কিসের টানে তুমি যাচ্ছ ঐ এলাকায় এত কষ্টের মধ্যে থাকতে। এখানে চোখের ওপর না থাকলেও মাঝে মাঝে তোমার দেখা তো পাওয়া যেত। তোমার কাজের সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলতে পারি না রহীম, তবে তুমি দূরে চলে গেলে আমার মনে যে একটু অশান্তি থাকবে তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। মরিয়ম আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলে পাশের দিকে মুখ ফেরালে।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বললে না। এই সময়ে নূরজাহান চা আর খাবার এনে রহীমের সামনে টেবিলে রাখলে।

রহীম নূরজাহানকে বললে, বসো। চায়ের রঙটা চমৎকার করেছ বুবু—সত্যি না মামীমা?

হ্যাঁ, রঙ ভালো হয়েছে, এখন খেতে ভালো হলেই হয়।

চা কিন্তু ও বরাবরই ভালো করে দেখেছি।

বেশ বাবা, তুমি খেয়ে নাও এখন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওরা শুনবে তোমার কথা? মরিয়ম জানতে চাইলে।

চায়ে চুমুখ দিয়ে রহীম বললে, ওদের ইচ্ছে। আমার আপত্তি নেই।

নূরজাহান। কী কথা মা?

রহীম। আমার রাজনীতির কথা। শুনতে চাও?

নূরজাহান উৎসাহের সঙ্গে বললে, শুনব ভাই আমি। আমার শোনবার খুব ইচ্ছে। তবে যা বলবেন বুঝিয়ে দেবেন।

মরিয়ম জিগেস করলে নূরজাহানকে, ও কোথা গেল ?

জাহানআরা ভিতর থেকে জবাব দিলে, আমি যাব না মা, একটু কাজ করছি এখানে।

সে পর্দা লাগানো জানালার পাশে বসে শুনছিল সবই। শোনবার আগ্রহ তার কম ছিল না। কিন্তু সে আগ্রহ অপরের নিকট প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না বলে বাইরে আসতে চাইলে না।

রহীম যতটা সম্ভব সহজ করে তার রাজনীতিক কাজকর্ম ব্যাখ্যা করলে : বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির জন্য দেশের লোকের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন ও সংগঠন আর তার ভবিষ্যৎ।

শোনবার পর সকলেই কিছুক্ষণ নীরব থাকল। পরে মরিয়ম বললে, এই তাহলে তোমার রাজনীতি, কেমন রহীম ?

সে হেসে জবাব দিলে, হ্যাঁ মামীমা, খুব সংক্ষেপে বলতে হলে আপাতত এই আমার রাজনীতি। এর পরেও অবশ্য আরো অনেক বক্তব্য আছে। সে কথা এখন আপনাদের বলা হয়নি, পরে কোন সময়ে হয়তো বলব। কিন্তু বিষয়টা এত অল্প সময়ে এত অল্প কথায় ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল একটা ধারণা দেয়া যায় মাত্র। এ-ভাবে বোঝাতে গেলে স্বভাবতই বক্তব্যের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকে, গলদ রয়ে যায়। আর যাকে বোঝাতে চাই তার পক্ষে বোঝাও হয় মুশকিল। তবু হয়তো এই কটা কথা থেকে একটা ধারণা আপনারা পাবেন।

মরিয়ম। কিন্তু তুমি যেমন বললে, এ তো অল্প সময়ের কাজ নয়, অল্প লোকেরও কাজ নয়। এত বড় একটা ব্যাপার, আমি তো ভেবে উঠতেই পারছি না কী করে এমন কাজ করবে তোমরা। করা যাবে বলে বিশ্বাস কর তো তুমি ?

রহীম হেসে উঠল। বললে, বিশ্বাসই যদি না করব তাহলে কাজে নেমেছি কেন ?

সকলে নীরবে বসে আছে, জাহানআরা আস্তে আস্তে ঘর থেকে

বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রহীমের পাশে। বললে, রহীমভাই, আমাকে কিছু রাজনীতির বই এনে দেবেন? আপনার এই রাজনীতির বই?

রহীম। সে বই তুমি কী করবে?

জাহানআরা। পড়ব। এ সম্বন্ধে কিছুই তো জানি না আমি।

রহীম। কিন্তু—আমি এর মধ্যে কি আর আসতে পারব? আচ্ছা দেখি, না হয় পাঠিয়ে দোব। তবে পড়ে ভালো বুঝতে পারবে না। আমিও থাকছি না যে বুঝিয়ে দিয়ে যাব। লোকমানের তো সময়ই নাই। আচ্ছা, পাঠিয়ে দোব।

মরিয়ম। তুমি কি আর আসবেই না এর মধ্যে? যেতে তো এখনো দেরি আছে, কাল একবার এসো না এমনি সময়ে। আজ যা বললে তার মধ্যে অনেক কথা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বাবা, আরো ভালো করে।

রহীম। আচ্ছা, তা হলে আসব কাল। বইও নিয়ে আসব তখন।

পরদিন এসে খানতিনেক বই জাহানআরার হাতে দিয়ে রহীম বললে, বেছে বেছে যতটা পেরেছি সহজ দেখে বইগুলো এনেছি। তাও তোমার পক্ষে তেমন সহজ হবে না। যাই হ'ক, পড়ে দেখো। কিন্তু বইগুলো খুব যত্ন করে রাখবে যেন বাইরের কোন লোকের চোখে না পড়ে।

দীর্ঘ সময় ধরে সেদিনও সে মরিয়ম ও নূরজাহানের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলে, অনেক বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে। তাতে বিষয়গুলো তাদের বোঝবার পক্ষে আরো কতকটা সহজ হ'ল।

রহীম যখন বিদায় নেবে বলে উঠল, মরিয়ম ছলছল চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, জলদি ফিরে এসো বাবা। বিয়ের আগে আসতে যেন ভুলে যেয়ো না, তাহলে আমি বড্ড কষ্ট পাব।

জাহানআরা তার বিদায়ের সময় তাদের সঙ্গে না থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সে যে রহীমের বিদায়ের সময় তাদের সঙ্গে না থেকে এ ভাবে চলে গেল তাই দেখে নূরজাহান তার প্রতি মনে মনে বিরক্ত হ'ল কিন্তু তখন বললে না কিছু।

ছয়

গরিব কৃষকের ঘরে জন্ম নিলেও রহীম শহরে এসে পেশা ধরেছিল মজুরের। তাহলেও কৃষক সমাজকে সে দেখেছে। কৃষির কাজও করেছে নিজের হাতে। তার বাল্যজীবন কেটেছে কৃষির ও কৃষকদের মধ্যে, কৃষকের চরিত্র সম্বন্ধে তার জ্ঞান আছে। শোষিত শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের প্রতি তার অন্তরে দরদ আছে। তার উপর আছে মজুরদের আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এবং মজুর শ্রেণীর রাজনীতিও তার জানা আছে।

আবাদ অঞ্চলে কৃষকদের আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যখন রহীমকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন তার পিছনে ঐ সকল যুক্তি ছিল প্রধান। সেজন্য তার পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তাকে তালিম দেবার ব্যবস্থা করলে যাতে সে তার এই নতুন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

তার তালিমের মধ্যে প্রধান বক্তব্য হ'ল দেশকে পরাধীনতা থেকে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করবার জন্য কৃষক সমাজের শ্রেণীভূমিকা কী এবং কৃষক সমাজ যাতে সেই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেজন্য শ্রমিক শ্রেণীকে কতখানি দায়িত্ব নিতে হবে। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য জমিদার-মহাজন-লাটদার-জোতদার শ্রেণীদের চরিত্র, অবস্থা ও স্বার্থ এবং খেতমজুরদের ও কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের চরিত্র, অবস্থা ও স্বার্থ সম্বন্ধেও তাকে অনেক বিষয় বুঝে নিতে হ'ল।

তখন বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে কৃষক সমাজের মধ্যে ব্যাপক ও জোরালো দাবি উঠেছে জমিদারী ও মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে এবং জমিহীন ও প্রায়-জমিহীন কৃষকদের বিনামূল্যে জমি দিতে

হবে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' আওয়াজ বিভিন্ন জেলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে।

ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট তখনো প্রকাশিত না হলেও আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে তার প্রধান সুপারিশ হবে জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খতম করার এবং ভূমি ব্যবস্থার সুস্পষ্ট পরিবর্তন সাধন করার পক্ষে।

এ সকল বিষয়েও রহীম খানিকটা ওয়াকেফহাল হ'ল। বাংলা-দেশের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস, অতীতের বিভিন্ন কৃষক অভ্যুত্থানের কাহিনী ইত্যাদিও কিছু কিছু পড়ে নিলে। আদম শুমারির রিপোর্ট ও অন্যান্য বইপত্র থেকে কৃষি, কৃষক, জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নোট করে খাতা ভর্তি করে ফেললে।

এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় অস্ত্রে সজ্জিত হতে তার কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে গেল। তারপর সে যেদিন আমতলী গিয়ে রোস্তমের বাড়ি হাজির হ'ল তখন সে তার নতুন মিশন ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খানিকটা আত্মপ্রত্যয় অনুভব করলে। অবশ্য কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে অজানা-অচেনা পথে পা বাড়াতে হলে লোকের মনে যে প্রাথমিক আড়ষ্টতা দেখা যায় তাও সে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। তবে তার রাজনীতিক জ্ঞান ও চেতনা তার দায়িত্ব পালনের সংকল্পকে দৃঢ়তা দিয়েছে।

রোস্তমকে রহীম যখন চিঠি লিখেছিল এখানে তার আসবার কথা জানিয়ে, তখন লেখেনি ঠিক কোন্ দিন্ আসবে; লিখেছিল কয়েকদিনের মধ্যে আসবে। ঠিক কী কাজে আসবে তাও জানায়নি, কেবল জলধরকে জানাতে লিখেছিল যে সে আগে এসে কৃষকদের যে-সব অবস্থা দেখে গিয়েছিল সেই সম্পর্কেই কথা বলতে আসবে। তাই জলধর ও রোস্তম নিজেদের মধ্যে কথা বলে আন্দাজ করে নিয়েছিল যে হাট তোলার ব্যাপারেই কিছু একটা করবার উদ্দেশ্যে সে আসছে, এবং সেজন্য তারা দুজনেই সাগ্রহে তার প্রতীক্ষা করছিল।

রহীম এসে পৌঁছবার পরদিন সকালে প্রথমে তাদের দুজনের সঙ্গে আলাপ করলে হাট তোলার জুলুম বন্ধ করার কথা নিয়ে। হাটের মালিক একজন লাটদার। সে বন্দোবস্ত দিয়েছে একজন ইজারাদারকে। সে লোকটি দুর্ধর্ষ, যদিও ধনী লোক নয়। নিজের অপকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য পুলিসকে খুশী রাখতে এবং দুর্ধর্ষপনা করবার জন্য গুণ্ডা পুষতেই সে ফতুর হয়েছে। লাটদার যে হাটটা নিজের হাতে না রেখে ইজারা দিয়েছে তার কারণ সে জোর করে বেশি তোলা-বটি আদায় করতে পারে না। অথচ তার টাকার প্রয়োজন।

ইজারাদারের বিরুদ্ধে লোকের বিক্ষোভ যথেষ্ট। বিক্ষোভের কারণ তার লোকজন অন্যায়ভাবে জোর করে অতিরিক্ত তোলা নেয় এবং সেজন্য সামান্য পরিমাণ শাকসব্জিও রেহাই পায় না, হাটে ব্যবসা করবার অনুমতি দেবার জন্য অতিরিক্ত হারে সালামী আদায় করে, এবং ব্যাপারীদের নিকট থেকে হাট প্রতি যে হারে তোলা-বটি আদায় করা হয় তাও অতিরিক্ত।

এখন রহীমের সামনে প্রশ্ন হ'ল, এই সমস্ত হার কমিয়ে কোন্ পর্যায়ে নামালে লোকে তা মেনে নিতে পারে। এই প্রশ্নের মীমাংসা আলোচনা সাপেক্ষ। হাট এলাকার বিভিন্ন গ্রামের লোকের মত নিয়ে ফয়সলা করতে হবে, যারা বাইরের ব্যাপারী তাদেরও মত জানা প্রয়োজন।

জলধর বললে, আচ্ছা বাবু, তাহলে কাজটা কেমন করে আরম্ভ করা হবে?

বাবু নয়, জলধর দাদা, কমরেড বল, রহীম হেসে ঘনিষ্ঠভাবে বললে। এবার আর আমি রোস্তমের মেহমান নই, এবার এসেছি আন্দোলনের কাজে।

বেশ তাই বলব। তা কমরেড কাকে বলে, কমরেড? জলধর প্রশ্ন করলে।

যারা একসঙ্গে কাজ করে বা আন্দোলন করে তারা পরস্পরকে বলে কমরেড। কাজের সাথী আর কী, জবাব দিলে রহীম।

জলধর। ইংরিজী কথা বুঝি?

রহীম। হ্যাঁ, ইংরিজী কথাই, তবে এখন বাংলা হয়ে গেছে। যেমন দেখবে কৃষক সমিতির কর্মীরা অশিক্ষিত কৃষক হলেও পরস্পরকে কমরেড বলে, কৃষক মেয়েরা পর্যন্ত।

জলধর। তা আমরা আর কেমন করে জানব বলুন? এখানে ধর গিয়ে কৃষক সমিতিও তো কখনো করা হয়নি। কমরেড, কমরেড—তা কথাটা শুনতে তো বেশ লাগছে।

রোস্তম ও রহীম হেসে উঠল। জলধরও হাসলে।

রহীম। কাজটা কেমন করে আরম্ভ করা হবে বলছিলে তো? সে সব কথা বলব পরে। তার আগে আমাকে বল এই হাট আন্দোলন ছাড়া আর কোন আন্দোলন এখানে করা দরকার কিনা।

জলধর ও রোস্তম পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। জলধর বললে, তোলা-বটির কথা নিয়েই তো দেখি মানুষের ঘুম নেই। অন্য কথা কিছু বলে না। দুঃখু তো ধর গিয়ে অনেক আছে, অভাবও আছে। তা সে-সব তো কমরেড, বন্ধ করা যাবে না, লোকে ধরেই নিয়েছে তাই।

আচ্ছা, সে সব দুঃখ কী সম্বন্ধে আছে একটু বল দেখি কমরেড, বললে রহীম। বিষয়গুলো প্রথমে তোমাদের কাছ থেকে শুনে নেয়া দরকার।

লোকের দুঃখু কী নিয়ে জানেন বাবু—এই যা, কমরেড, জলধর ভুলটা করেই সংশোধন করে নিলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে ফেললে। রোস্তম এবং রহীমও হাসলে তার সরলতা দেখে।

জলধর বলতে লাগল, আপনাকে একদিন বলেছিলাম না, মহাজনরা চাষীদের ওপর বড্ড জুলুম করে। সুদ বাড়ি বড্ড বেশি নেয়। লাটদাররা ধর গিয়ে খাজনা নেয়, তবু ভেড়িগুনো ঠিক মতন বেঁধে দেয় না, তাতে অনেক জমিনের ফসল নোনা ঢুঁকে মরে যায়। তাদের খাজনার হারও বেশি। ধানের দরটাও ধর গিয়ে এখানে কম পায় লোকে, আবার সেই-ধানই বড় গঞ্জে গেলে দরে

বিক্রী হয়। আর যারা জন খেটে খায় কমরেড, তাদের তো আরো কষ্ট। তারা ধর গিয়ে সারা বছরে তিন মাসের বেশি খাটনি পায় না, বাকী ন মাস কী খায় বলুন তো ?

মজুরী পায় কেমন ? রহীম জানতে চাইলে।

মজুরী যা পায় তাতে ঐ সময়টায় চলে, হয় তো রেখে ঢেঁকে চালাতে পারলে আরো কিছুদিন যায়। বুনোরা ধর গিয়ে মেয়েমদ্দ খাটে বলে তাদের তবু একটু সুবিধে আছে। আমাদের বাঙ্গালীদের তারো জো নেই।

স্থানীয় সমস্যা জানবার জন্য প্রশ্ন করেছিল রহীম। জলধরের কথা শুনে বললে, আচ্ছা, যদি মজুরী বাড়াবার কথা বলা হয় ? ধর যদি বলা হয় মজুরী দিতে হবে এখনকার দুগুণ হারে ?

রোস্তম ও জলধর তার প্রশ্ন শুনে হেসে উঠল। রোস্তম বললে, দুগুণ মজুরী কে দেবে ভাই ? লোকে তাহলে জন খাটাবে কেনে ? শুধু যারা বড় বড় গেরস্থ কি মহাজন তারাই খাটাবে। বেশি মজুরী দিতে হলে ধানের দর বাড়াতে হবে, নইলে এখনকার মতন দর পেলে বেশি মজুরী দিয়ে চাষীর পোষাবে কেনে ? আর খাজনার হারও বেশি, সেটাও কমানো দরকার।

রহীম আবার বললে, যারা জনমজুর তারা তো মজুরীর পয়সা দিয়ে চাল কিনে খায়। তা হলে ধানের দর বাড়াতে হলে মজুরীও বাড়াতে হবে।

তা হবে বৈ কি, রোস্তম স্বীকার করলে। মজুরী আর ধানের দর—যেটা হ'ক একটাকে বাড়াতে গেলেই অন্যটাকেও বাড়াতে হবে।

হুঁ, বলে রহীম একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে, আচ্ছা, তোমরা এই যে আন্দোলন করার কথা বলছ, ধর হাটতোলারই আন্দোলন, এতে যোগ দিয়ে কাজ করতে চায় এমন জানাশোনা লোক তোমাদের কী রকম হবে ? অনেক আছে ? শুধু এই গ্রামেই নয়, কাছাকাছি অন্য গ্রামগুলোকে ধরেও।

জলধর। তা আছে বৈকি কমরেড, লোক কিছু পাওয়া যাবে। আমাদের গাঁয়ের বসন্ত মোড়ল আছে, মোল্লাপাড়ার নিতাই পাত্তর; শোলমারির বংশী দাস, মধুখালির ভরত, তোমার ধর গিয়ে হাজি-নগরের দাউদ—এমনি আরো আছে, কা বলিস রোস্তম ?

রোস্তম। আমাদের গাঁয়ের নেয়াজ আছে। আর দাশু আছে বোয়ালখালির।

জলধর। দাশু কে রে ?

রোস্তম। ঐ যো গো, সাঁওতালদের দাশু। তীর চালাতে খুব ওস্তাদ।

রহীম। এদের সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই। প্রথমে এক একজনের সাথে কথা বলে দেখব। তারপর হয়তো একসঙ্গেও বসব সকলকে নিয়ে। তোমরা থাকবে অবশ্য সব সময়েই। আলাপ কেন করতে চাই জান ? আন্দোলন একটা করতে গেলে সব দিক থেকে তৈরি হয়ে কাজ শুরু করা দরকার। আমরা কী করতে চাই এখনি কোন লোককে বলব না। আগে বিভিন্ন গ্রামের কিছু লোকের মত জানতে হবে, তাদের মারফতে জানতে হবে তাদের গ্রামগুলোতে লোকের সমর্থন কেমন পাওয়া যাবে। এমনি আরো সব দরকারী ব্যবস্থা করে তবে খোলাখুলি কাজে নামব আমরা। সেটাই ঠিক নয় কি ?

ঠিক কথাই বলেছেন কমরেড, জলধর সোৎসাহে সমর্থন করলে। তাতে একটু দেরি হবে বটে, তা হ'ক। রোস্তমও সায় দিলে।

রহীম। আন্দোলন যখন শুরু করব তখন জিতব বলেই তো শুরু করতে হবে। যারা বেচতে আসে, যারা কিনতে আসে, যারা বাইরের ব্যাপারী তাদের সবায়ের মতটাও জানা দরকার। তারা না চাইলে আন্দোলন হবে কার জন্যে ? আবার বলছ ইজারাদারের গুণ্ডা আছে। তারা যদি হামলা করে সেজন্যেও আমাদের হুশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। তার মোকাবেলা করবার মতন ব্যবস্থা রাখা দরকার হবে তো।

তা হবে বৈ কি, তারা দুজনেই স্বীকার করলে।

রহীম। আরো একটা কথা বলি তোমাদের। তোমরাই যা বলছ তাতে দেখছি এই এলাকায় সমস্যা শুধু হাটতোলা নয়, আরো সমস্যা আছে। কাজেই একটা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে জিতলেও আমাদের তখনি থেমে যাওয়া চলবে না। অন্য সমস্যা নিয়েও আন্দোলন করতে হবে, এক সঙ্গে সব নয়, হয়তো একটা একটা করে। তার জন্যে তৈরি হওয়াও দরকার।

জলধর। হ্যাঁ কমরেড, তা দরকার। আন্দোলন না করলে আপনা থেকে কিছু মিটবে না। আমাদের যা দুখ্‌খু সব থেকেই যাবে।

রহীম। আরো দেখ আমাদের দেশ তো শুধু এই আবাদ এলাকা নিয়েই নয়, আরো অনেক এলাকা আছে, আমাদের গোটা জেলাটা আছে, এমনি আরো অনেক জেলা নিয়ে বাংলাদেশ; ভারতবর্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই বাংলাদেশেও কৃষকদের দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ নিয়ে কত আন্দোলন চলছে। একই দাবি, একই সমস্যা অনেক এলাকায় আছে, অনেক জেলায় আছে। সব জেলাতেই খাটে এমন দাবিও আছে। সেই সব বিষয় বিবেচনা করে সারা দেশের কৃষক আন্দোলনের অংশ হিসেবে এখানকার আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে। তবে তো আমাদের আন্দোলনের জোর হবে। সেই আন্দোলনের দ্বারাই আমাদের অনেক বড় বড় দাবিও আদায় হবে।

জলধর গভীর মনোযোগের সহিত তার কথাগুলি শুনলে। তার মনের মধ্যে যেন নতুন আলোর রেখাপাত হ'ল। সে বলে উঠল, এত কথা আমরা কখনো ভেবে দেখিনি কমরেড। আমরা ধর গিয়ে পড়ে আছি আবাদে, দেশের খবর জানব কোত্থেকে? এই আপনি দয়া করে এসেছেন, তবু দুটো কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা। নইলে ধর গিয়ে আর কি কেউ বলেছে? আপনি দয়া করে সব কথা খুলে বুঝিয়ে বলুন আমাদের কাছে, কী করলে আমাদের সবায়ের ভালো হবে, কিসে আমরা বাঁচব, মানুষ হব আপনাদের মতন।

রহীম বুঝলে তার মনের অবস্থা; তার মিনতির কারণ। বললে,

জলধর দাদা, আমি এখানে দয়া করে আসিনি, এসেছি কাজের দায়িত্ব নিয়ে। এটাই আমার কাজ, তোমরা না বললেও আমায় করতে হবে। তবে তোমাদের নিয়েই কাজ, তোমাদের সাহায্য পেলেই কিছু করা যাবে। সেই সাহায্য দেবার লোক চাই, তাই খোঁজ করছি আরো লোক কোথা পাব।

লোক অনেক পাওয়া যাবে ভাই, তার জন্যে ভাববেন না আপনি, রোস্তম আশ্বাস দিলে তাকে। কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারলে দেখবেন কত লোক আসবে আপনার কাছে।

শোন আরো একটা কথা। তোমাদের কাছেই এখন বলছি, পরে বলব অন্য লোক এলে, বললে রহীম। আন্দোলন করতে হলে, আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে সংগঠন দরকার হয়। কৃষকদের সংগঠন হ'ল কৃষক সমিতি, সে আমাদের গড়তে হবে। তার কথা পরে বলব। কৃষক আন্দোলন যখন করব আমরা তখন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনেও থাকতে হবে আমাদের, কেননা দেশের মুক্তি না হলে কৃষকও মুক্তি পাবে না। সে কথাও পরে আরো ভালো করে বলব। এই স্বাধীনতা আন্দোলন হ'ল সরকারের বিরুদ্ধে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। সে সম্বন্ধে বুঝতে হলে কৃষকদেরও রাজনীতির-কথা বুঝতে হবে, তাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা জাগাতে হবে।

রহীম দেখলে রোস্তম ও জলধর দুজনেই বিস্মিতভাবে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে। তাদের মনের অবস্থা অনুমান করে সে হেসে বললে, আমার কথাগুনো খুব আজগুবি শোনাচ্ছে, তাই না জলধর দাদা? ঠিক বুঝতে পারছ না হয়তো, তাই না?

সত্যি কমরেড, মনের কথা আপনি ঠিক ধরেছেন, সরলভাবে জলধর স্বীকার করলে। কৃষক সমিতি, স্বাধীনতা আন্দোলন—এ-সবের নাম শুনিছি তবু, কিন্তু ধর গিয়ে রাজনীতি না কি বললেন, সেটা কী জিনিস তা তো জানিনে। কথাটা কখনো শুনিনি।

জানি কমরেড, এমনি শোচনীয় অবস্থাতেই রাখা হয়েছে আমাদের দেশের মানুষকে। গবরমেন্ট তো তাদের মানুষ বলে মনে করে না। জমিদার-লাটদাররাও তাই। রাজনীতির কথা অন্য সময়ে বলব। তোমরা রাজনীতি বোঝ না, বুঝবে কী করে? খবরের কাগজ এখানে আসে না, পড়েও না কেউ, তার জন্যে পয়সা খরচ করা তো একেবারেই অসম্ভব। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগ রাখবার আর এক ব্যবস্থা হচ্ছে রেডিও। এই আবাদ এলাকায় বোধহয় তার নামও শোনেনি অনেক লোক।

জলধর বিস্ময় প্রকাশ করলে, রেডিও বললেন কমরেড? তা আমিই তো ধর গিয়ে কখনো শুনিনি ঐ নামটা! জিনিসটা কী কমরেড?

তবেই হয়েছে! ওটা আবার বোঝাব কী করে! বললে রহীম। রোস্তম, তুমি তো কলকাতায় দেখেছ রেডিও কী জিনিস। জলধর দাদাকে বুঝিয়ে দাও না একটু।

আমি তো জিনিসটা কখনো দেখিনি ভাই, তবে রেডিওর গান শুনিছি, বললে রোস্তম।

রেডিও কী জান দাদা? রহীম ব্যাখ্যা করলে, রেডিও এক রকম যন্ত্র। তাকে বেতার যন্ত্র বলে। ঐ ধরনের একটা যন্ত্রে মুখ দিয়ে যদি তুমি কলকাতায় কথা বল, আমি তোমার সেই কথা এখানে বসে ঐ যন্ত্র থেকে শুনতে পাব, অথচ এই দুটো যন্ত্রের মধ্যে তারের মারফত কোন যোগাযোগ নাই। কথা বলবার জন্যে যন্ত্রটা এক ধরনের হয় আর শোনবার জন্যে আর এক ধরনের হয়। শুধু কথাই নয়, গানও শোনা যায়, যা কিছু আওয়াজ করবে তাই শোনা যাবে, সেই আওয়াজকে ছোট বড় করা যাবে। শুধু কলকাতা থেকে নয়, দুনিয়ার যেকোন জায়গা থেকে কথা বললেও সঙ্গে সঙ্গে এখানে ঘরে বসে শুনতে পাবে সব। তাই এই রেডিও মারফত খবরও প্রচার করা হয়। দুনিয়ার এক কোণে এখুনি যা ঘটল, রেডিও মারফত তুমি তখুনি তা ঘরে বসেই শুনতে পাবে।

জলধর। তা হলে তো কমরেড, এ খুব আশ্চর্য যন্তর! তার-টুকুও নেই, তবু খবর আসবে, গান শোনা যাবে! ভগমান মানুষের মাথায় কত যে বুদ্ধি দিয়েছে! বুদ্ধি নেই শুধু আমাদের এই আবাদে।

রহীম হাসলে। বললে, না কমরেড, বুদ্ধি তোমাদেরও কিছু কম নেই, তবে ছাইচাপা আগুনের মতন পড়ে আছে। কেউ দেখতেও পাচ্ছে না, কেউ কাজেও লাগাচ্ছে না। কুলোর বাতাস দিয়ে ছাই উড়িয়ে দাও, গনগনে আগুন বেরিয়ে পড়বে। এখানেও মানুষকে শিক্ষা দাও, শিক্ষার হাওয়া দিয়ে অশিক্ষার জঞ্জাল উড়িয়ে দাও, দেখবে জ্ঞান বাড়বে, বুদ্ধি খুলবে। তবে তার জন্যে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, দেশের মানুষের জন্যে খাওয়া-পরার আর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

তা বটে কমরেড, স্বীকার করলে জলধর।

রহীম বললে, আচ্ছা, আজ আর বেশি কথা নয়। তবে তোমরা একটা বিষয় ভেবে রেখো। আমাকে এই এলাকায় থাকতে হবে এখন। এক জায়গায় বা একটা গ্রামেও বেশি দিন থাকা চলবে না, অনেক গ্রামে ঘুরতে হবে। কোন্ কোন্ গ্রামে কার কার বাড়ি দরকার হলে দু চার দিন করে থাকা চলে সেটা ভেবে বলবে আমাকে কাল। থাকতে হলে খেতেও হবে অবশ্য।

যাদের কথা বলতে পারি কমরেড, তারা যে বড্ড গরিব, সংকোচের সহিত বললে জলধর। তাদের বাড়ি গেলে ধর গিয়ে আপনি থাকবেনই কোথা, খাবেনই বা কী? তারা যা খায় তাতে তো আপনার চলবে না। আর—

জলধর চুপ করে গেল, যা বলতে চেয়েছিল বলতে পারলে না। রোস্তম বললে, অন্য গাঁয়ে আপনার খুব অসুবিধে হবে ভাই। দেলখোশ চাচার মতন মোসলমানের বাড়ি তো বেশি পাবেন না, হিন্দু বাড়িতেও থাকা-খাওয়া চলবে না আপনার।

আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম রোস্তম, বললে জলধর। একে গরিব তায় হিন্দু, আপনি খাবেন কী করে?

রহীম হেসে বললে, কমরেড, আমরা যখন কাউকে কমরেড বলি তখন দেখি না সে হিন্দু কি মোসলমান। কৃষক আন্দোলন যখন করব তখন সব কৃষকই আমার আপন, হিন্দু হ'ক বা মোসলমান হ'ক! তারা সবাই আমার কাছে সমান। কারো বাড়ি থাকতে বা খেতে আমি আপত্তি করতে পারি না, অবশ্য যদি তাদের আপত্তি না থাকে। আর গরিব বলছ? আমাকে থাকতে হলে গরিবদের বাড়িই বেশি থাকতে হবে। আমাদের আন্দোলন যখন জোর ধরবে, কৃষকরা যখন দলে দলে সমিতির দিকে ঝুঁকতে থাকবে, তখন ধনী লোক তো বটেই, সম্পন্ন বড় চাষীরাও আমাদের ভয় করবে, আমাদের থেকে সরে থাকতে চাইবে। কাজেই হিন্দু হ'ক, মোসলমান হ'ক, এমন কি তোমরা যাদের বুনো বল তারাই হ'ক, সবায়ের বাড়িই থাকব আমি। তারা জনমজুর হ'ক, ছোট বা মাঝারি চাষী হ'ক, তাদের বাড়িই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

আচ্ছা কমরেড, তাহলে ভেবে ঠিক করব, বললে জলধর।

রোস্তম বললে, ওরা কিন্তু ভাই, চা করে দিতে পারবে না কেউ। তারা তো জানেই না চা করতে। আপনার কষ্ট হবে।

রহীম হাসলে। বললে, হ্যাঁ, কষ্ট হয়তো হবে একটু। দিন কতক পরে ঠিক হয়ে যাবে সব। সঙ্গে কিছু চা চিনি এনেছি, ওটা ফুরোলে চা খাওয়া ছেড়ে দোব ঠিক করেছি। জান রোস্তম, আগে বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস ছিল, ঘন ঘন বিড়ি টানতাম। তারপর সেই যে ধর্মঘট করেছিলাম, যাতে লোকমানের আর আমার চাকরি গেল, সেই সময় থেকে পয়সার অভাবে বিড়ি খাওয়া ছেড়েছি। পরে আর ধরিনি। চা-ও না হয় তেমনি ছেড়ে দেয়া যাবে।

সাত

যাদের সঙ্গে আলাপ করার কথা ছিল, পরদিন তারা এল—এক সঙ্গে নয়, একে একে। যেমন যেমন এল তারা, অমনি রহীম আলাপ পরিচয় করলে। তার উদ্দেশ্য ছিল এই মানুষগুলোকে ব্যক্তি হিসাবে চেনা এবং তাদের চোখ দিয়ে এই এলাকাকে দেখে নিজে তার অবস্থা সম্বন্ধে আরো ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকেফহাল হওয়া।

প্রথমে এল বসন্ত মণ্ডল। চণ্ডীপুরের লোক, জলধর নিয়ে এল সঙ্গে করে। বসন্ত একেবারে জমিহীন কৃষক, জাতে নমশূদ্র। বয়স পঁচিশের উপর, জলধরের চেয়ে ছোট। জনমজুরী করে খায়। পুঁজিপাটা নাই যে হালবলদ রেখে কিছু ভাগ জমি জোগাড় করে চাষ করবে। ঘরে আছে শুধু তার মা। বয়স তার খুব বেশি নয়। এখনো সংসারের কাজ সবই করতে পারে। বাস্তুবাড়ির সঙ্গে বিঘেখানেক জমি আর একটা ডোবা আছে। কয়েকটা গরু, ছাগল, আর হাঁস পুষে কিছু উপার্জন করে তারা। আর কিছু তরি-তরকারি আর মরিচের চাষ করে প্রধানত নিজেদের ব্যবহারের জন্য। রহীম আলাপ করে দেখলে বসন্তর বেশ বুকের পাটা আছে। বল.ল কথা বোঝেও সহজে।

নেয়াজ শেখের বাড়ি রোস্তমদের গ্রামেই। বয়স তারও বেশি নয়, জলধরের সমবয়সী হবে। ঘরে মা-বাপ আর বৌ আছে, বছর তিনেক হ'ল একটা মেয়ে হয়ে মরে গেছে, তারপর আর ছেলেপুলে হয়নি। বিঘে চারপাঁচ জমি আছে নিজেদের আর বিঘে দশবারে নিয়ে ভাগে চাষ করে। কিছু শাকসব্জির চাষ করে হাটে বিক্রী করে। বেশ একটা বেপরোয়া ভাব তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেলে।

বোয়ালখালির দাশু মাঝি এল একটু পরেই। তার বাপ-মা এবং বড় ছুটো ভাই আছে, সকলে এক বাড়িতেই থাকে। বয়স

তার ২২।২৩ বছর আন্দাজ হবে। বেশ তেজী চোস্ত দেহখানি। বছরখানেক হ'ল বিয়ে করেছে। ছেলেপিলে তার নিজের নাই, তার ভাইদের আছে। সাঁওতালি ভাষা প্রায় ভুলে এসেছে তারা। বাংলা বলে সহজভাবেই, ঘরে কথা বলার সময় কিছু সাঁওতালী মিশেল থাকে তার সঙ্গে। তারা কিছু জমি ভাগে চাষ করে এবং জন খেটেও কিছু আয় করে। এই ভাবেই চলে তাদের সংসার।

আরো যারা এল তাদের মধ্যে ছিল ভরত মাহাতো। উপজাতীয় বা সর্দার, তথাকথিত বুনো। ভাগচাষী, নিজেরও বিঘে দশেক জমি আছে। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তার ঘরে আছে ছোটভাই নীলমণি ওরফে নীলু। একসঙ্গে চাষ করে। দাউদ মোল্লাও ভাগচাষী। তার নিজের জমি প্রায় কিছুই নাই, কেবল বাস্তুবাড়ির সঙ্গে শাক-সব্জির চাষের মতো কিছু জমি আছে। জনমজুরের কাজও করে সে। তার মতো ভাগচাষী নিতাই পাত্র। জাতে পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। বেশ রাশভারি লোক।

এদের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। রোস্তম ও জলধরের সঙ্গে বসে রহীম তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করলে তাদের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কথা বললে, লাটদার- মহাজনদের প্রশ্ন এবং হাট তোলার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে তাদের মনোভাব জানবার চেষ্টা করলে। একমাত্র দাশু ছাড়া সকলেই প্রয়োজন মতো কিছু কিছু শাকসব্জি বিক্রী করতে হাটে যায়। তারা সকলেই হাট তোলা সম্পর্কে ইজারাদারের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করলে।

যখন রহীম তাদের প্রশ্ন করলে হাট তোলার জুলুম বন্ধ করার উপায় কী, তখন ইজারাদারকে মার দেবার কথাই বেরিয়ে এল অধিকাংশের মুখ থেকে। যখন বলা হ'ল তার লাঠিয়াল গুণ্ডার দল আছে তখন কেউ কেউ চিন্তিতভাবে চুপ করে গেল। কিন্তু অন্যেরা জবাব দিলে, তা বাবু, হাটসুদ্ধ লোক যদি আমরা জোট বেঁধে রুখে দাঁড়াই, লেঠেল-ফেটেল পালাতে পথ পাবে না।

রহীম প্রশ্ন করলে, জোট বাঁধতে রাজি হবে সবাই? জন দুই যে জবাব দিলে তার অর্থ এই: যে রকম জুলুম করছে আমাদের ওপর, রাজি না হয়ে আর উপায় কী? রহীম ভাবলে লোকের মনের কথা নিশ্চিতভাবে বলবার মতো আলোচনা তারা করেনি, কেবল নিজেদের মনের ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছা বলে ধরে নিয়েছে। তাহলেও তাদের বক্তব্য থেকে তার মনে হ'ল ইঙ্গিত যা পাওয়া যাচ্ছে তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

সকলের শেষে এল বংশীবদন দাস। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কণ্ঠিধারী বোষ্টম। হাসিহাসি মুখ, মজবুত একহারা গড়ন। ঘরে আছে তার স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়ে ও জামাই। কয়েক বছর পূর্বে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছে। তাদের একটি বছর তিনেকের মেয়েও আছে। বংশী নিজে খেতমজুরী করত আর সামান্য জমির চাষটা কোন প্রকারে তুলত। জামাই আসার পর সে ভাগজমি জোগাড় করে চাষ করছে, বংশীও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

প্রথম পরিচয়ের পরে সে রহীমকে বললে, বাবু, শহরের মানুষ আপনি, আমাদের দুখখু দেখতে আবাদে এসেছেন, গোবিন্দ আপনার মঙ্গল করবে।

লাটদার-মহাজনদের শোষণ-জুলুমের কথা উঠল। বংশী হেসে বললে, অমন তো হবেই বাবু। পাপীতাপী মানুষই তো, টাকার কাঁড়ি নিয়ে বসে থাকলে জোর জুলুম করবার ইচ্ছে যে আপনা থেকেই আসবে। মহাপ্রভুর ডাকে সবাই প্রাণভরে সাড়া দিলে না, নইলে এমন ছোট-বড়র ভেদ থাকবে কেনে?

রহীম তার কথা শুনে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। হাটতোলা ও ইজারদারের অত্যাচার সম্বন্ধে সে বললে, এই অত্যাচার বন্ধ করতে না পারলে আপনারা বাঁচবেন কেমন করে বংশীদাদা?

আবার হেসে উঠল বংশী। তারপর কিছুক্ষণ খোলা মাঠের দিকে

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আপনি যে-কথা বললেন বাবু, ঐ কথা সবাই বলে, আমিও বলি। রক্তমাংসর শরীর তো আমাদের, বলব বৈকি। অল্প দুঃখু পেলেও আমরা সইতে পারি না। তবে ভগবানের একটা বিচার আছে। যেদিন ইজারা-দারের পাপের ভরা পূর্ণ হবে, সেদিন নারায়ণ কি আর চুপ করে বসে দেখতে পারবেন? সুদর্শন চক্র নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। তখন কোথা ভেসে যাবে ইজারাদার আর তার জুলুম!

রোস্তম শুনে মুখ টিপে হাসছে। জলধর যেন কতকটা বিব্রত হয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে। হয়তো মনে মনে লজ্জিত বোধ করছে যে তারই সুপারিশে বংশীকে ডাকা হয়েছে রহীমের সঙ্গে আলাপ করতে।

রহীম তার কথা শুনে বিভ্রান্ত হলেও হতাশ হয়নি। ভাবলে তার সঙ্গে আরো আলাপ করতে হবে। পরে বললেও সে কথা। শুনে জলধর খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলে।

সকলে চলে যাবার পর তারা তিন জনে কিছুক্ষণ আলোচনা করলে আজকের আলাপ সম্বন্ধে। শেষে রহীম প্রস্তাব করলে এদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে সে তিন চার দিন আলাপ করতে চায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। রোস্তম ও জলধরও অবশ্য থাকবে। সে যাদের নাম করলে তারা যে সানন্দে আলাপ আলোচনায় থাকতে রাজি হবে, সে বিশ্বাস তাদের দুজনেরই ছিল। ঠিক হ'ল শীঘ্রি তার ব্যবস্থা করবে তারা। পরদিন হাটবার, সেখানেই সকলকে জানিয়ে দেবে।

হাটতোলার আন্দোলন সম্বন্ধে কী বুঝলেন, কমরেড? প্রশ্ন করলে জলধর।

রহীম হেসে বললে, আন্দোলন ঠিকই হবে, সে জন্যে ভেবো না, কমরেড। তবে তার আগে তৈরী হওয়া দরকার। তারই জন্যে ক'দিন ভালো করে আলোচনা করতে চাই ঐ ক'জনার সঙ্গে।

রোস্তম জিজ্ঞেস করলে, চারদিন ধরে কী এত আলোচনা করবেন ভাই ?

আগে থেকে তোমাকে জানিয়ে দোব কেন বল ? বসে শোন কষ্ট করে, তখন সব বুঝতে পারবে। রহীম একটু হেসে বলতে লাগল, আন্দোলনের গোড়ার কথা, কেন আমরা করছি আন্দোলন, তার ফলাফল কী হতে পারে, কেমন করে তাকে চালাতে হবে, সে জন্যে কাকে কতখানি দায়িত্ব নিতে হবে—এ সবই তো আগে থেকে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয়া দরকার। তাই নয় কী ?

তা ঠিক কমরেড, জলধর সমর্থন জানালে।

এই কদিনের আলোচনা শেষ হলেই আন্দোলন শুরু করবেন তো, না আবার দেরি করবেন ?

সে জন্যে তোমার এত ভাবনা কিসের বল তো ? হেসে বললে রহীম।

ভাবনা একটু আছে, ভাই। তাতেই তো বলছি।

ও, কলকাতা যেতে হবে তোমার ভাইয়ের বিয়েতে, তাই না ? সে তো আমাকেও যেতে হবে। তার আগেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে বলে আমি মনে করছি।

তাহলে খুব ভালো হয়, রোস্তম স্বস্তি বোধ করলে।

তোমরাই তো করবে আন্দোলন। লোককে সেই মতো বুঝিয়ে দিয়ো।

আবাদে আসার পূর্বে রহীম কলকাতায় তার কেন্দ্রের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এসেছিল যাতে তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখা হয়। নিয়মিত যোগাযোগের সুবিধা পাওয়া কঠিন। তবে মাঝে মাঝে জেলা কেন্দ্র মারফত দৈনিক কাগজ একখানা করে এক সঙ্গে পাঠানো হবে এবং প্রয়োজন মতো খবরাখবরের ব্যবস্থা হবে, সে নিজেও তার কাজকর্মের রিপোর্ট পাঠাবে, এটা স্থির হয়েছিল।

এও ঠিক হয় যে জেলা কেন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োজন মতো সলা-পরামর্শ করবার তার সুবিধা যাতে হয় সে জন্য একজন উপযুক্ত কর্মীকে অন্তত মাঝে মাঝে পাঠাতে হবে।

এখনো সেরকম কোন ব্যক্তির আসার সময় হয়নি। কিন্তু এখানে আসার পরই বাইরের জগতের সঙ্গে রহীমের সংযোগ একেবারে কেটে গেল। সকালে দৈনিক কাগজ পড়ার অভ্যাস তার ছিল। সে সুযোগ এখানে না পেয়ে তার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষিত জনের সংস্পর্শ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে তার অভাব অনুভব করছিল। চায়ের জন্য যে ব্যবস্থা সঙ্গে করে এনেছিল তা এখনো চলছে, খতম হয়নি। এবং ইতিমধ্যে সে প্রস্তুত হচ্ছে যাতে তার অভাব তাকে পীড়া না দেয়।

কিন্তু কোন অভাবই তীব্র হয়ে ওঠেনি। এ সকল অভাব যে ঘটবে, এ যে অবাঞ্ছিত হলেও অচিন্তিত নয়, তা জানা ছিল বলে তত কঠিন হ'ল না। তাছাড়া নতুন নতুন লোকের পরিচয়, তাদের চিন্তা-চেতনার কথা, তাদের পারিবারিক জীবনের সংবাদ তার চোখের সামনে এক নব দিগন্তের পর্দা সরিয়ে দিতে লাগল, তার চিন্তার মধ্যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করতে লাগল।

সেদিন হাটবার। দুপুরে সকলে হাটে যাবে, কাজেই সকালে ব্যস্ত থাকবে যৎকিঞ্চিৎ পসরা তৈরি করার জন্য। তাই সকালে কারো আসার কথা ছিল না। সে রোস্তমের বাড়ির সামনে মোড়ায় বসে একখানা বই ধরে আছে। পড়বার চেষ্টা করছে কিন্তু মন বসছে না, যত লোকের যা পরিচয় শুনেছে তাই নিয়ে মন একটু নাড়াচাড়া করছে।

একটি তরুণ এসে বললে, আমার দাদা আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে। ভরত আমার দাদা আমার নাম নীলমণি, নীলু বলে ডাকে।

নবযৌবনে উদ্ভাসিত পুষ্ট সুঠাম তার দেহের গঠন। হাত পা মজবুত। রঙ কালো কিন্তু কুচকুচে নয়। চোখ দুটো বড় বড়।

নাকের ডগা টিকোল নয়, ঈষৎ স্থূল। তার মুখশ্রীতে যৌবনের দীপ্তির চেয়ে কৈশোরের লক্ষণই যেন বেশি প্রকট।

কোন কাজ আছে, না এমনিই এসেছ? রহীম জানতে চাইলে।

আজ্ঞে না, এমনই। দাদা বললে, যা ছুটো কথা শুনে আয়।

তারা উঠে গিয়ে মাছুরে বসল, নীলু তার সঙ্গে মাছুরে বসতে সংকোচ করছিল, রহীম বলায় বসল। রহীম তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলে। তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয় বেশি করে শুনলে। নীলু ভরতের সৎ ভাই। তার মা এবং সে ভরতের সঙ্গে একই অন্নে থাকে। ভরত ছোট থেকেই তাকে খুব স্নেহ করে। ভরতের ছোট আপন ভাই আছে একজন, বাপ মরার পর সে পৃথক থাকে। নীলু ছেলেবেলায় পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। এখন চাষে খাটে। তার পড়বার ইচ্ছা এখনো আছে কিন্তু বই পায় না।

নীলুর এভাবে আসায় এবং আলাপ করায় রহীম খুব খুশী হ'ল। আর তার মতো একজন শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোক যে নীলুকে একই মাছুরে তার পাশে বসিয়ে এমন মিষ্টি আলাপ করলে তাতে নীলুর বুকখানা গর্বে ভরে উঠল। রহীম যখন বললে সে এর পর কলকাতা গেলে তার জন্যে কিছু বই এনে দেবে, তখন আর আনন্দ ধরে না তার মনে।

যাবার সময় নীলু বললে, আপনার যখন যা কাজের দরকার হয় আমাকে বলবেন, ডাকলেই আসব। মাঠটা পার হলেই আমাদের বাড়ি, হাঁক দিলে শোনা যায়।

হাটে যাবে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যেতে হবে। গাঁয়েরই তো হাট। গোটা কতক বেগুন নিয়ে যাব।

সে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বংশী এল হাসতে হাসতে। দূর থেকে বললে, কেমন আছেন বাবু? এই পথে বাড়ি ফিরছি, ভাবলাম

একবার দেখা করে যাই আপনার সঙ্গে। আপনি মহৎ লোক বাবু, শহরের লোক কেউ আসে না এখানে, আপনিই এসেছেন।

রহীম আলাপ করার কোন বিষয় না পেয়ে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন সকাল বেলায় ?

আমার কথা বলবেন না বাবু, বংশী হাসলে। আমার যাওয়া-আসা সব জায়গায়। আমি বুড়িকে বলি, তুই মেয়ের কাছে নিশ্চিন্তে থাক, আমার যখন যেখানে মর্জি যাব আসব, শুধু বাড়ি এলে ছুটো খেতে দিস। আমার বাবু, কোন ভয়ভুতোও নেই, ভাবনা চিন্তেও নেই। যেখানেই যাই, লোকে ছুটো খেতে আমাকে দেবেই। বংশী বোষ্টমকে চেনে না এমন লোকই নেই এ তল্লাটে।

তার কথা শুনে রহীমের মুখে হাসি দেখা দিলে। ভাবলে এ কি আর এক বংশী ?

বংশী বলতে লাগল, সকালবেলায় শুধু শুধু ঘুরিনি বাবু। হাটের জুলুমের কথা বললাম লোককে। সবাই বলে এক কথা—অত বেশি তোলা দেয়া যায় না। ছু সের বেগুন নিয়ে গেলে আধ সের বেরিয়ে যাবে তোলায় তো থাকবে কী বিক্রীর জন্যে ?

তবু রহীম ভয়ে ভয়ে বললে, আন্দোলন কি তা হলে করা যাবে, দাদা ? সাড়া দেবে লোকে ?

আন্দোলন তো করতেই হবে বাবু, সবাই যে চায়। সাড়া দেবে কিনা বলছেন ? সাড়া না দেবে কে ? খালি কথাটা সবায়ের কাছে পৌঁচে দেয়া দরকার। আপনি আমাকে বলে দেবেন বাবু, কী করতে হবে, আমি সে কথা গাঁয়ে গাঁয়ে শুনিয়ে দোব লোককে।

রহীম অবাক হয়ে শুনছিল, আর দেখছিল এ বংশী বোষ্টমের আর এক চেহারা। সে এই চেহারারই খোঁজ পেতে চেয়েছিল কিন্তু প্রথম আলাপের সময় তার সন্ধান না পেয়ে পেয়েছিল এক বিভ্রান্তিকর চেহারার। এখন নতুন বিভ্রান্তি দেখা দিলে—কোন্ চেহারাটা আসল আর কোন্টা নকল! ভাবলে নকল হয়তো

কোনটাই নয়, কেবল ক্ষেত্র ভেদে প্রকারভেদ। সে তাকে গ্রহণ করলে কিন্তু উচ্ছসিত হ'ল না।

বললে, বংশীদাদা, আগে ঠিক হ'ক কী করা হবে। তারপর লোককে বলা যাবে। আর শুনুন, আপনি মুরুব্বি মানুষ, আমাকে বাবু বলেন কেন!

কী বলব তাহলে? একটা কিছু বলতে হবে তো? হাসলে বংশী।

বলবেন কমরেড, সবাই যা বলে। এক সঙ্গে কাজ করলে কমরেড বলি আমরা।

বেশ, তাই বলব। কমরেড, কমরেড। তাহলে কমরেডই বলব আপনাকে।

আট

যে ক'জনকে নিয়ে বসার কথা ঠিক করা হয়েছিল তারা সকলেই প্রথম দিনে যথাসময়ে হাজির হ'ল। তাদের সঙ্গে নীলমণিকেও যোগ করা হয়েছিল ; রহীমের সঙ্গে সে আলাপ করে যাবার পর তার প্রস্তাব মোতাবেক তাকেও আসতে বলা হয়। সে কিন্তু তখনো বংশীকে ডাকার কথা বলেনি।

প্রথম দিনের আলোচনার পর বংশী জানতে পারে যে এ রকম একটা বৈঠক হচ্ছে। বৈঠক হয়েছিল সকালে। সে খবর শুনেই সন্ধ্যাবেলা এসে রহামের নিকট অনুযোগ করে তাকে বৈঠকে যোগ দিতে বলা হয়নি বলে।

বংশী বললে, কাজের কথা আলোচনা করবেন বলেই তো ডেকেছেন সবাইকে। কাজ তো আমিও করব বলিছি আপনাকে। তাহলে আমারো তো জানা দরকার কী করতে হবে।

তার প্রস্তাব শুনে রহীম প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হ'ল। বংশীকে ডাকাতে তার মনে একটু আপত্তি ছিল। তার কারণ ছিল এই যে সে সর্বত্র যায়, কখন কার কাছে নিজেদের গোপন কথা পাছে প্রকাশ করে ফেলে। বৈঠকটা খুব গোপন রাখার কথা হয়নি, কাজেই সে-কথা জানবার অসুবিধা ছিল না তার। কিন্তু আলোচনার মধ্যে কোন কোন বিষয় আপাতত গোপনীয় থাকতে পারে বলেই রহীমের একটা সংকোচ ছিল।

তাহলেও এখন আর আপত্তি করা চলে না। পাছে বংশী আঘাত পায় সেজন্য সে তাকে সংকোচের কথাটা জানতে না দিয়ে সহজভাবে বললে, ডাকিনি কেন জানেন বংশীদাদা? এখানে সব ছোকরারা বসছে। আপনি মুরুব্বি মানুষ, আপনাকে রোজ রোজ আসতে বলা উচিত হবে না ভেবেছিলাম।

কেনে কমরেড, আপনার কথা শুনতে এইটুকু রাস্তা আমি আসতে পারব না? গোবিন্দর ইচ্ছেয় আমার বুড়ো হাড় নিয়ে আমি যা হাঁটব, কোন ছোকরা তা পারবে না, বলে বংশী হাসতে লাগল।

তবে একটা কথা দাদা, আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, রহীম জোর দিয়ে বললে। আমাদের আন্দোলন বা লড়াই সম্বন্ধে কী ভাবে কী করা হবে, সে সব কথা আগে থেকে কাউকে বলতে যাবেন না।

না কমরেড, কেউ একটি কথাও জানতে পারবে না, বংশী আশ্বাস দিলে। কথা আমি একটু বেশি বলি বটে কমরেড, কিন্তু কোন কথা বলতে মানা করে দিলে বংশী বোষ্টম—

সে মুখ বন্ধ করে দুই ঠোঁটের সামনে ডান হাতের তর্জনী খাড়া করে চেপে ধরলে। একটু পরে মুখ খুলে বলতে লাগল, আমার পেট থেকে কথা বার করতে স্বয়ং নারায়ণও পারবে না। আমার বুড়ীই পারে না।

কার্যক্ষেত্রে তার এই আশ্বাসের দাম কতটা হবে, রহীম সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। তবে আলোচনার মধ্যে খুব একটা গোপনীয় বিষয় থাকবে না হয়তো, তেমন কিছু না বললেই চলবে, সে ভাবলে। তাকে পরদিন থেকে বৈঠকে যোগ দিতে বললে।

এই সময় রোস্তম এল। রহীম তাকে বললে, বংশীদাদা তোমাদের বৈঠকে থাকতে চায় আলোচনা শুনবে বলে। আমি কাল থেকে আসতে বললাম।

রোস্তম হেসে বললে, দাদা, ইজারাদারের লেঠেল-গুণ্ডাদের মোকাবেলা করতে হবে, লাঠি ধরতে পারবে তো?

পারব রে পারব। তোদের মতন ছোকরাদের চেয়ে কি আমার তাগত কম? সময় হলে দেখে নিস।

বংশী চলে গেলে রহীম রোস্তমের সঙ্গে খেতে গেল বাড়ীর

মধ্যে। মফিজন চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। তার মা তাদের কাছে বসে পরিবেশন করতে লাগলেন। রহীম তাঁকে খালামা বলে ডাকে। তিনিও তাকে লোকমানের মতোই মনে করেন।

দায়েমও বসেছিল খেতে। এবার আসার সময় রহীম তার জন্য খান দুই বই আর ছোটখাটো অন্য উপহার এনেছিল। পেয়ে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিল। আগে সে রহীমকে শ্রদ্ধা করত। এখন তার ভক্ত হয়ে উঠেছে।

রোস্তমের অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। তার বাড়ি একটানা বেশি দিন খাওয়া চলে না। কিন্তু রহীম এখনি অন্যত্র চলে যেতে পারে না। আগে তাকে বিভিন্ন গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে এবং কাজের উপলক্ষে যেতে হবে। তবেই এখান থেকে যাওয়া চলবে। নইলে রোস্তমরা ক্ষুণ্ণ হবে। তারা সকলেই যথেষ্ট যত্ন করে তাকে। তার এখানে থাকাতে তারা কেউ দুঃখিত নয়, বরং তার থাকাই তাদের পক্ষে আনন্দের কারণ।

বৈঠকে সে অনেক বিষয়ের আলোচনা করলে। হাট আন্দোলন ছাড়া কৃষকদের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবন, জমিদারী-লাটদারী ও মহাজনী প্রথা, বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের কথা, জন-মাহিন্দারের সমস্যা, সাধারণভাবে কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমিতি, দেশের স্বাধীনতার কথা এবং স্বাধীনতা আন্দোলন, সে আন্দোলনের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক, কংগ্রেস ও তার নেতৃত্ব এবং কৃষকের দাবি সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি, মুসলিম লীগ ও তার আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, কৃষকদের শ্রেণীনীতি, শ্রমিক শ্রেণী কী এবং তার সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক কী হওয়া উচিত—এই সকল বিষয় অল্প অল্প করে সকলের বোঝবার মতো যথাসাধ্য সহজ কথায় ব্যাখ্যা করলে সে।

সেই সঙ্গে রাজনীতির অর্থ, রাষ্ট্র ক্ষমতা, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ, সমাজে ধনী-গরীবের সম্পর্ক, এমন কি ধর্মভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, খাওয়া-ছোঁয়ার সমস্যা নিয়েও কিছু কিছু কথা বললে। তাদের বোঝালে কৃষকদের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই

করতে হলে, আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে তাদের সংগঠন বা কৃষক সমিতি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। কৃষক সমিতির পতাকার নিচে সমস্ত কৃষককে জমায়েত করতে না পারলে তাদের চূড়ান্ত বিজয় আসবে না।

তার কথা শুনলে সকলে গভীর আগ্রহের সহিত। সবই নতুন কথা। এমন কথা কেউ কখনো শোনায়নি তাদের।

নেয়াজ বললে, এত কথা কি মনে রাখতে পারব কমরেড?

কমরেড ডাকটা এই বৈঠকে বেশ চালু হয়ে গেছে।

রহীম বললে, একবার শুনলে সব কথা মনে থাকবে না। পরে আরো বেশি করে বুঝিয়ে দোব। এখন শুধু জানিয়ে রাখলাম আন্দোলন করতে হলে কত রকম কথা শেখা দরকার।

শেষ দিনে হাট আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করলে রহীম। তারা একমত হয়ে স্থির করলে যে কৃষকদের কাছ থেকে শাকসব্জির বা অল্প ধানচালের উপর তোলা জোর করে নেয়া চলবে না, যে যা দেবে তাই নিতে হবে, না দিলে দাবি করা যাবে না। যারা চালা বেঁধে বসে তাদের কাছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বেশি সালামী নেয়া চলবে না; সেজন্য তারা ধার্য করবে কত দিতে হবে। আর চালার দোকান এবং চালার বাইরের অন্যান্য দোকান থেকে হাট পিছু এক আনা করে বটি নিতে হবে, তার বেশি দাবি করা চলবে না।

তারা আরো স্থির করলে যে প্রথমে তারা আশপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে বৈঠক ডেকে কৃষকদের কাছে তাদের দাবি ও বক্তব্য শুনিয়ে দেবে এবং দাবি সম্বন্ধে তাদের মত নেবে। এক একটা গ্রামে সে জন্য অন্তত দুজন করে যেতে হবে। দাবিগুলো লিখে নেওয়া হ'ল।

তারপরে তারা একটা হাটে গিয়ে হাটসভা করে তাদের দাবি ব্যাখ্যা করবে। তখন যাতে সমস্ত কৃষক সে সব দাবি স্পষ্টভাবে সমর্থন করে সেজন্য তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে শুনে চুপ করে

থাকলে চলবে না। ইজারাদারের পক্ষ নিয়ে যেন একজন কৃষকও কথা না বলে। লাটদার নিজে হাজির থাকলেও তার মিষ্টি কথাতেও যেন কেউ গলে না যায়।

ইজারাদারের গুণ্ডারা সভায় যদি গোলমাল করতে যায় অথবা মারপিটের চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারদিক থেকে কৃষকরা যেন বেড় দিয়ে ফেলে। লাঠি সোঁটা সভার কাছে কারো হাতে দেখলে যেন কেড়ে নেয়।

কোন্ তারিখের হাটে সভা ডাকা হবে তাও ঠিক হয়ে গেল। কারা কবে কোন গ্রামে বৈঠক করতে যাবে তারও তালিকা হয়ে গেল। সেজন্য যথেষ্ট সময় হাতে রাখা হ'ল। সমস্ত কৃষকের সমর্থন পাবার জন্য যদি একটা বৈঠক যথেষ্ট না হয় তাহলে আবার তাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। কাজেই প্রস্তুতির জন্য অনেকটা সময় রাখতে হ'ল তাদের।

রহীম বললে, সে নিজেও যাবে এই প্রচারের কাজে। সম্ভব হলে প্রত্যেকটা গ্রামে গিয়ে সেখানকার কৃষকদের সঙ্গে পরিচয় করবে।

জলধর প্রশ্ন করলে, কমরেড, কৃষক সমিতির নামেই তো সভাটা ডাকা হবে তাহলে? নইলে ধর গিয়ে সভা ডাকছে কে?

সকলেরই তাই মত দেখা গেল। যদিও কৃষক সমিতির পত্তন তখনো হয়নি এই অঞ্চলে, তবু রহীম আপত্তি করলে না। তার ইচ্ছা ছিল আন্দোলন সফল হলে সঙ্গে সঙ্গে সমিতির মেম্বর সংগ্রহের কাজ শুরু করবে এবং সেজন্য একটা সাংগঠনিক কমিটি তোয়ের করে নেবে। অথচ কথাটা সংগত যে সভাটা সমিতির নামে ডাকতে হবে।

সে তখন প্রস্তাব করলে, তাহলে কমরেড, কৃষক সমিতির পত্তন এখুনি করতে হয়, সমিতি সংগঠন করবার জন্যে একটা কমিটিও তৈরী করতে হয়। আর সেজন্যে তাহলে কৃষক সমিতির মেম্বরও হতে হবে এখন। সংগঠনী কমিটি বলতে কী বোঝায় এবং

সমিতির মেম্বর হতে হলে কী করতে হয়, সে সব কথাও ব্যাখ্যা করলে।

সকলেই তখন এক আনা করে দিয়ে মেম্বর হতে চাইলে। যাদের সঙ্গে পয়সা ছিল না তারা রোস্তমের কাছে ধার নিলে।

রহীম তার ব্যাগ থেকে রসিদ বই আর সমিতির লাল ঝাণ্ডা বার করে আনলে। আসবার সময় ছোট বড় দুটো পতাকা নিয়ে এসেছিল।

কৃষক সমিতির পতাকা তারা এর আগে কখনো দেখেনি। এখন দেখে সকলেই আনন্দে আত্মহারা। বংশী বললে, কমরেড, পতাকা আমরা এখুনি তুলব এখানে।

থামুন দাদা, আগে রসিদ কাটিয়ে সমিতির মেম্বর হয়ে যান, রহীম হেসে বললে।

রসিদ কাটা হলে রহীম বললে, তাহলে এই ক'জনকে নিয়েই সংগঠনী কমিটি করা হ'ক, পরে আরো কিছু মেম্বর নেয়া যাবে দরকার মতো।

রোস্তম যখন বংশীকে দিয়ে পতাকাটা তুলিয়ে দিলে তার বাড়ির সামনে তখন সকলেরই মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈঠকে উপস্থিত সকলের মধ্যে দারুণ উৎসাহ। সকলেই যেন ভাবছে একটা দিগ্বিজয় শুরু করতে যাচ্ছে তারা সমস্ত কৃষকদের নিয়ে এবং তার উদ্যোগী তারাই ক'জন। এখন কৃষক সমিতির মেম্বর হয়ে এবং সমিতির লাল ঝাণ্ডা তুলে তাদের সে উৎসাহ আরো প্রবল হয়ে উঠল।

এই উৎসাহের পরশ রহীমের অন্তরেও লাগল। গভীর আনন্দে তার মন ভরে উঠল। এই বুঝি সফলতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

মধুখালির হাটের সঙ্গে যে সব গ্রামের ঘনিষ্ঠ যোগ তা মাইল তিন চারের মধ্যেই বেশি। এই গ্রামগুলো থেকেই বেশির ভাগ লোক হাটে আসে। তার বাইরের গ্রাম থেকে আসে কম লোক

গ্রামগুলো পরস্পর থেকেও কাছাকাছি। নদীর ওপার থেকেও হাটে লোক আসে। সে গ্রামগুলোও নদী থেকে দূরে নয়।

হাটের তোলা নিয়ে যে একটা কিছু হতে যাচ্ছে তা বিভিন্ন গ্রামের লোকের কানে উঠল। সেজন্য আগ্রহ সকলেরই মধ্যে। যখন গ্রামগুলোতে বৈঠক শুরু হ'ল তখন কৃষকরা সমস্ত বিষয় জেনে সমিতির দাবি সহজেই সমর্থন করলে—যেন এমনি একটা কোন ব্যবস্থার জন্য প্রতীক্ষাই করছিল তারা। এই সব দাবি যে ছোট ছোট চাষীরাই করলে তা নয়, বড় চাষী এবং সম্পন্ন গৃহস্থরাও করলে। হাটে কেনা বা বেচার ব্যাপারে সকল স্তরের কৃষকদেরই কিছু-না-কিছু স্বার্থ ছিল। তাছাড়া ইজারাদার যে রকম অন্যায়-ভাবে তোলা-বটি আদায় করে তার বিরুদ্ধে ছিল সকলেরই বিক্ষোভ।

প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে বৈঠকে যোগদান করা অবশ্য সম্ভব হ'ল না রহীমের পক্ষে, একদিনেই দু তিনখানা গ্রামে বৈঠক হতে লাগল। বৈঠক থেকে কথাটার প্রচার হয়ে গেল যে আন্দোলনের উদ্যোগী কৃষক সমিতি এবং সেই সমিতিকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে একজন কমরেড। কমরেড যে কী বস্তু তা সকলে জানতে পারলে না কিন্তু শব্দটা খুব চলে গেল কৃষকদের মধ্যে, ছোট ছেলে-পিলেদের মধ্যেও। লোক বুঝলে কমরেড মানে যাই হ'ক, একজন ব্যক্তি বটে। সেই ব্যক্তিটিকে দেখবার আগ্রহ হ'ল অনেকের।

রহীম ছখানা গ্রামের বৈঠকে যোগ দিতে পারলে, তার বেশি সম্ভব হ'ল না। যেদিন যে গ্রামে অন্য দুজন কমরেডের সঙ্গে বৈঠকে সে হাজির থাকল, সেদিন সকালে বৈঠক সেরে সেখানেই থেকে গেল। সেখান থেকেই পরবর্তী বৈঠকে পৌঁচল। কাজেই প্রায় সমস্ত দিনরাত সে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করবার এবং কথা বলবার সুযোগ পেলে। তার মধ্যে সে কিছু কিছু কৃষকের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের পরিচয় জেনে নিলে, তাদের গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধেও বেশ একটা ধারণা পেলে, আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহ

আগ্রহ বিবেচনা করে লোককে যতটা সম্ভব আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলে।

তার ফলে এই গ্রামগুলোতে সে কেবল পা রাখার ঠাঁই পাবে বলেই মনে করলে না, অল্প দিনের মধ্যে ঘাঁটি তৈরী করতে পারবে বলেও ভরসা হ'ল তার। এই সফরের মধ্যে দুই গ্রামের বৈঠকের দুটো দিনের ফাঁকে ফাঁকেও সে আরো চারটে দিন সময় পেলে এবং সেই চার দিন আরো চারখানা গ্রামে কাটালে। সে-সব গ্রামের লোকে নিজেরাই এসে তাকে নিয়ে গেল। সেখানে পূর্বেই অন্য কর্মীরা বৈঠক করে গেছে। তাই সে নিজে আর তখন দ্বিতীয় বৈঠক করলে না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে এই গ্রাম-গুলোতেও ঘাঁটি বানাবার জন্য প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি করে রাখলে।

এর মধ্যে পরিচয় হ'ল তার বহু কৃষকের সঙ্গে। কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং আলাপ যাদের সঙ্গে হ'ল তাদের সংখ্যাও কম নয়। এই আবাদ এলাকাটাকে এবং এখানকার কৃষক জীবন ও কৃষক সমস্যাকে এইভাবে অনেকখানি চিনে নেবার সুযোগ পেলে সে। তখন সে কেবল আর আসন্ন হাট তোলার লড়াই নয়, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কথাও চিন্তা করতে লাগল।

বৈঠকের কাজ শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে গেল রোস্তমের বাড়ি। অন্যান্য কর্মীরাও বৈঠকের কাজ শেষ করেছে। সংগঠনী কমিটি বসে তখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে এই প্রচার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক মেম্বর নিজের অভিজ্ঞতার রিপোর্ট দিলে। দেখা গেল তারা এই আন্দোলন সম্বন্ধে কৃষকদের আগ্রহের কথা যে-ভাবে প্রকাশ করেছিল তা ভুল ছিল না। এখন এই আন্দো-লনের দাবির সমর্থনে কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ। হাট সভার দিনে তাদের যা যা করতে বলা হ'ল তাতে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল।

হাট সভার সংবাদ বৈঠকের গ্রামগুলোর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মধ্যে কেবল আগ্রহ নয়, চাঞ্চল্য দেখা গেল এবং তা ক্রমেই বাড়তে লাগল। অবস্থা দেখে সংগঠনী কমিটির মেম্বররা বললে

সভা ডাকার দিনটা এতখানি পিছিয়ে না দিলেই ভালো হ'ত। অবশ্য এখন আর বেশি বিলম্বও ছিল না।

নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে কর্মীরা যা বললে তার মধ্যে থেকে রহীম প্রত্যেকের সম্বন্ধে আরো ঘনিষ্ঠ এবং নিশ্চিত পরিচয় পেলে। কে কী ধরনের কাজের যোগ্য তা বোঝবার পক্ষে তার সাহায্য হ'ল। সে ধারণা পেলে কে কেমন বলতে কইতে পারে, কে বিষয়গুলো নিজে কেমন বুঝেছে, কে খাটতে পারে কেমন, কার মধ্যে শ্রেণীচেতনা কতখানি জেগেছে, ইত্যাদি সম্বন্ধে। মাত্র এই কয়েকটা দিনের ভিতরেই সে যে এতদূর লাভবান হবে তা আগে কল্পনাও করতে পারেনি।

রহীম দেখলে নীলু আর দাশুকে। তাদের লড়াকে মনোভাবের যে পরিচয় পেলে সে তাতে আরো আকৃষ্ট হ'ল। দাশু কথা বলে কম। মন দিয়ে শোনে সব কথা এবং যা বলতে চায়, খুব সংক্ষেপেই প্রকাশ করে। নীলু তার পরিচয় দিলে তীরধনুকে তার অসাধারণ দক্ষতা, তার মোকাবিলা করবার মতো কেউ নাই এ অঞ্চলে। সে নিজেও শিখেছে তার কাছে। রহীম শুনে তাদের দু'জনকেই পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলে।

আর দেখলে রহীম বংশীকে। এই ভবঘুরে সদাহাস্যমুখ ব্যক্তিটির মুখেও মাঝে মাঝে গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে। কোথায় না গেছে সে! বৈঠকে যোগ দিয়েছে তিনখানা গ্রামে। বিনা বৈঠকে যে চারখানা গ্রামে রহীমের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তা ছিল এই বংশীরই চেষ্টার ফল। তার সম্বন্ধে রহীমের ধারণা এখন স্পষ্ট হ'ল। সে বুঝলে তাকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে নির্ভর করা চলে।

নির্দিষ্ট দিনে রহীম ও তার সহকর্মীরা একজোট হয়ে সকাল করে হাটে গেল। গেল তারা সমিতির লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে এবং স্লোগান দিতে দিতে। তাদের স্লোগান হ'ল: ইজারাদারের জুলুম খতম কর! কৃষকের তোলা বন্ধ কর! ইত্যাদি।

এই সভার কথা হাটকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট ব্যাপকভাবে তার চতুর্দিকের এলাকার মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। খবরটা তার বাইরেও অনেক লোকের কানে উঠেছে। লোকে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে কা ঘটে দেখবার জন্য। দলে দলে হাটে আসতে লাগল তারা।

খবরটা অবশ্য ইজারাদারও শুনেছে। সে তার নিজের ধরনে চিন্তা করে প্রথমে বিষয়টাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি। ভেবেছিল এ রকম বিক্ষোভের কথা লোকের মধ্যে অনেক সময় যেমন শোনা যায় এও তেমনি ব্যাপার। পরে যখন জানতে পারলে সত্যিই একটা সভা হবে বলে কিছু লোকে ঠিক করেছে, তখন সে কয়েকজন লাঠিয়াল-গুণ্ডার ব্যবস্থা করলে; তার পোষা গুণ্ডা যে-ক'জন ছিল তার উপরেও জনকয়েক লোক যোগাড় করে রাখলে।

সংগঠনী কমিটির মেম্বররা লাঠিসোটা না নিয়ে খালি হাতেই গেল; রহীম তাদের লাঠি নেবার প্রস্তাবে আপত্তি করে। কিন্তু অন্য লোকের মধ্যে অনেকে যাতে লাঠি নিয়ে যায় সেজন্য নির্দেশ দিলে। তাদের ঘনিষ্ঠ লোকেরাই অনেকে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে হাটে গেল। গুণ্ডাদের আক্রমণ হওয়া আশ্চর্য নয় এবং সেজন্য আত্মরক্ষার প্রস্তুতি প্রয়োজন, একথা তারা বিভিন্ন গ্রামে তাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের বুঝিয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে লাঠির প্রদর্শনী করতেও নিষেধ করেছিল। এ-সব সিদ্ধান্ত হবার পর নীলু ও দাশু প্রথমে কাউকে

কিছু না বলে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে ফেললে যে তারা অনেক-গুলো লাঠি যোগাড় করে রাখবে। বেশ এক বোঝা লাঠি তারা হাটের খুব নিকটেই তাদের পরিচিত ও বিশ্বস্ত এক ব্যক্তির বাড়িতে দুদিন পূর্বে রাত্রের অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। একথা নীলু রহীমকে জানালে হাটখোলায় গিয়ে।

রহীমরা সকাল করেই পৌঁচল হাটে। গিয়ে দেখে লোক হাটতলায় গিজগিজ করছে। এত লোক কখনো আসে না এ হাটে; বিশেষ করে চৈত্র-শেষের এই কড়া রোদের মধ্যে। কিন্তু লোক এত বেশি, তবু সোরগোল তার তুলনায় কম, যেন কেমন একটা থমথমে ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

ইজারাদার নিজে উপস্থিত হয়েছে ; সব হাটে না এলেও আজ এসেছে। বসে আছে পশ্চিমা মালিকের বড় দোকানটিতে। পশ্চিমার বলে নয়, দোকানটা বড় বলে খাতির করে তাকে। রহীম তাকে দেখেনি কখনো, তার সঙ্গীরা তাকে চিনিয়ে দিলে। শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রহীম নেয়াজকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললে কয়েক জন লাঠিধারী ব্যক্তিকে নিয়ে সে যেন তার দিকে কড়া নজর রাখে, কোন রকম গণ্ডগোল হলে যেন সে পালাতে না পারে। তবে যেন মারপিট করা না হয়। তাছাড়া তার কোন চর আছে কিনা, থাকলে তারা কোথা যায় বা কী করে সেদিকেও যেন সে লক্ষ্য রাখে এবং প্রয়োজন বুঝলেই তাদের কাছে খবর পাঠায়।

গুণ্ডারা কতজন আছে বা কোথায় আছে তারা ঠিক বুঝতে পারলে না। কিন্তু সকলেই সতর্ক থাকল, অপরিচিত কোন ব্যক্তির হাতে লাঠি দেখলেই তার উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করলে।

ইতিমধ্যে লাল ঝাণ্ডা তুলে দেওয়া হ'ল এবং পাঁচুর দোকান থেকে একটা বেঞ্চি এনে রাখা হ'ল তার পাশে ; পাঁচু এই আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক এবং এর মধ্যেই রহীমের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপও করেছে। তার ছেলেরাও সমর্থন করে এবং হাজিরও আছে এখানে।

সমিতির পতাকা তোলা হয়েছে বেশ উঁচু করেই। সাদা কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত ঝক্‌ঝকে নতুন লাল পতাকা স্বচ্ছ নীল আকাশের তলে খর রৌদ্রের মধ্যে মৃদু বাতালে যেন আপন মনে হেলেদুলে হাসিখেলা করতে লাগল। এই সুন্দর আজব চিহ্নটি পূর্বে এখানে কেউ দেখেনি কখনো। তার চারদিকে অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে গেল।

রহীম বেঞ্চিটার এক পাশে বসে আছে। নিতাই তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে সারা হাটখোলাটায় একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে কোন বিরূপ দৃশ্য নজরে পড়ে কি না। সে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে দেখে ভাবলে তাহলে এইবার সভার কাজ আরম্ভ করা হবে। অমনি আরো ভিড় বাড়তে লাগল তার চতুর্দিকে।

সেই ধারণা হ'ল ইজারদারেরও। তার অদূরে এক ব্যক্তি বসে ছিল, তাকে ইশারায় ডেকে কানে কানে কী বললে সে। লোকটা অমনি সরে এসে একবার বেশ করে চারদিক দেখে নিলে, তারপর আস্তে আস্তে ঝাণ্ডার দিকে এগিয়ে গেল। নেয়াজ ও তার সঙ্গী সকলেই লক্ষ্য করলে। নেয়াজ তার একজন সঙ্গীকে তার কাজের ভার দিয়ে বলে গেল সে লোকটাকে অনুসরণ করছে এবং অন্য একজনকে খবরটা রহীমকে জানিয়ে আসতে বললে।

ইজারাদারের লোকটা পতাকার নিচেকার অবস্থাটা—কে কোন্ দিকে আছে—একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল হাটখোলার বাইরে। রহীম খবরটা পেয়েই তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের লাঠিধারীরাও তাদের কথামতো প্রস্তুত হয়ে থাকল। এই সময় নীলু ও দাশু কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের লুকোনো লাঠিগুলো বার করে এনে নেয়াজের দিকে লক্ষ্য রাখলে, অপেক্ষা করতে লাগল সে ফিরে এসে কি বলে জানবার জন্য।

নেয়াজ লোকটাকে তার অলক্ষ্যে অনুসরণ করে দেখলে হাটখোলার বাইরে গাছতলায় একটা ঝোপের আড়ালে জন দশেক

লোক বসে আছে। লোকটা তাদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা সকলে এক সঙ্গে কাপড় বাগাচ্ছে দেখে নেয়াজ অবস্থাটা বুঝে নিলে। দ্রুত ফিরে আসার পথে নীলু ডাকতেই সে তাদের কাছে গিয়ে বললে, জন দশেক লোক আছে, কাপড় বাগাচ্ছে, বোধ হয় লাঠি নিয়ে আসবে এখুনি।

তারা তখনি স্থির করলে নীলুরা এখানে অপেক্ষা করবে, গুণ্ডার দল এলে ভিড়ের মধ্যে ঢোকবার আগেই তাদের পিছন থেকে গিয়ে ঘিরে ফেলবে, তবে নেয়াজ ফিরে গিয়ে যেন আরো কিছু লোককে একটু ঘোরা পথে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। নেয়াজ পতাকাতলে পৌঁচেই প্রথম তার পরিচিত জন কতক লোককে একত্র করে রেখে নিতাই ও রহীমকে কানে কানে অবস্থাটা জানিয়ে তাদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা নীলুরা যেখানে বসে আছে সেই দিকে চলে গেল।

নেয়াজের রিপোর্ট পাবার পরই রহীমের নির্দেশে বেঞ্চিতে উঠে নিতাই তাদের বক্তব্য সাধ্যমতো উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুরু করলে। সে বলে ভালো, গুছিয়ে কথা বলতে পারে, রহীম আগে বৈঠকের সময় তা দেখেছে। রহীম নিজে প্রথমে বলতে চায় না, মনে করে একজন স্থানীয় ব্যক্তির দ্বারাই তাদের দাবির ব্যাখ্যা হওয়া ভালো।

নিতাই যখন তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে দাবিগুলি সভার মধ্যে পেশ করে বললে, আপনারা সবাই হাত তুলে বলুন এই সব দাবি আপনারা মানেন, কিছু লোক সাড়া দিলে, মানি! সে যখন দ্বিতীয়বার জোর দিয়ে এই দাবি স্বীকার করতে অনুরোধ জানালে, অমনি হাট সুদ্ধ লোক হাত তুলে আকাশ ফাটিয়ে বলে উঠল, মানি, মানি!

এই চীৎকার এবং তার আনুষঙ্গিক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা শেষ হবার পূর্বেই নিতাইয়ের পিছন দিকে একটা সোরগোল শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক সরে যেতে লাগল, ক্রমে কিছু লোক দৌড়ে আসতে লাগল। ব্যাপার কী বোঝবার আগেই দেখা গেল ভিড়

সরে যাবার সাথে সাথে একটা লোক দৌড়ে এসে নিতাইয়ের পিঠে লাঠি মারলে। লাঠি সে দুহাত তুলে জোরেই লাগাতে যাচ্ছিল বটে কিন্তু কৃষক পক্ষের এক ব্যক্তি তার লাঠি তোলা দেখেই তার একটা হাত ধরে টান দেবার চেষ্টা করতে তার লাঠির আঘাতটা শক্ত হতে পারলে না। নিতাই আঘাত পেয়েও দাঁড়িয়ে রইল, কেবল চমকে উঠে পিছন ফিরে চাইলে। ততক্ষণে তার আঘাতকারীকে এবং তার পিছনে আর একজন লাঠিধারীকে তার স্বপক্ষের অনেক লোক ধরে ফেলেছে এবং মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে।

নিতাইকে যে লাঠির ঘা মারা হয়েছে, অনেকটা উঁচুতে বলে ইজারাদারও তা দেখেছিল কিন্তু তারপর আর কিছু না দেখে বুঝেছিল আঘাতকারী ধরাও পড়েছে; ভিড়ের কারণে নিচের দিকের কিছু দেখতে পাচ্ছিল না সে। অমনি সে গা ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে উঠে দোকানের ভিতর দিকে লুকোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার উপর যে কড়া পাহারা আছে তা সে জানত না। যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা হৈ হৈ করে লাঠি তুললে। তাদের মুখপাত্র বললে, যেমন আছ বসে থাক, ওখান থেকে নড়লেই মাথা ফাটিয়ে দোব। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখে সে বসে পড়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার আশ্রয়দাতা দোকানদারও ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকল।

এদিকে নিতাই মার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রহীম উঠে তাকে ধরে নেমে বসতে বললে। কিন্তু নিতাই হেসে বললে, না কমরেড, জোরে লাগেনি। আমি এখনো দাঁড়িয়ে বলতে পারব।

রহীম নিজও তখন বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল। ইজারাদারের ঘটনা তখনো সে জানতে পারেনি। সে দিকে গোলমাল শুনে সে তাকিয়ে দেখলে অনেক লোক সেদিকে চেয়ে আছে, কিছু লোক এগিয়েও যাচ্ছে। ইজারাদারকে বসিয়ে দেবার পর যে লোকটি তাকে খবর দিতে আসছিল সে রহীমকে উপরে দাঁড়াতে দেখে চীৎকার

করে খবরটা বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু কলরবের মধ্যে শোনা গেল না।

তখন রহীম নিতাইকে বসতে বলে এবং সে লোকটিকে তার কাছে আসতে ইঙ্গিত করে নিজে হাত জোড় করে বললে, আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন। অনেক ঘটনার কথা এখুনি শুনতে পাবেন। হঠাৎ এই অপরিচিতের মুখ দেখে এবং আবেদন শুনে সকলে শান্ত হ'ল।

ততক্ষণে লোকটি এসে তার কানের কাছে ইজারাদার সংক্রান্ত ব্যাপারটা বললে। রহীম হেঁট হয়ে শুনে আবার দাঁড়িয়ে দেখলে পিছন দিকে খুব সোরগোল আরম্ভ হয়েছে। দেখা গেল পিছন থেকে লোক সব সরে যেতে লাগল আর নেয়াজ, দাশু ও নীলু সমেত অনেক লাঠিধারী ব্যক্তি জন আষ্টেক লোককে ঘিরে এগিয়ে আসছে।

রহীম বুঝলে ব্যাপারটা। চারিদিকে প্রচণ্ড কোলাহল চলছে, থামানো দরকার। সে আবার হাত জোড় করে আবেদন করলেঃ ভাই সব, আপনাদের ওপর ইজারাদারের জুলুম যা চলে এসেছে তা আজই খতম করতে হবে। আপনাদের যা দাবি তা এখানে কমরেড নিতাইয়ের কথায় শুনেছেন। সে দাবি যে আপনাদেরই দাবি তা এখানে সকলেই একটু আগে হাত তুলে জানিয়েছেন। এই সব দাবি যাতে আদায় হতে না পারে সেজন্যে ইজারাদার লাঠিয়াল লাগিয়ে সমিতির কর্মীদের মারার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু সে নিজেই এখন আটক হয়ে বসে আছে আর তার গুণ্ডারাও ধরা পড়েছে। আপনারা একটু সবুর করুন, একটু অপেক্ষা করুন। আমরা সমস্ত ব্যাপারটা বলব আপনাদের কাছে।

সে নেমে বেঞ্চিতে বসল। গুণ্ডাদের আট জনকে একটু দূরে বসিয়ে ঘিরে রাখা হ'ল। যে দুজন নিতাইকে মারতে এসেছিল তাদেরও তখন ঐ আট জনের সঙ্গে বসানো হ'ল। তাদের সকলের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেওয়া হয়েছে আগেই।

রহীম, নিতাই, বসন্ত, রোস্তম, জলধর, বংশী এবং আরো যে কজন কর্মী কাছাকাছি ছিল সকলেই জমা হ'ল। নেয়াজ বললে, দাশু আর নীলুকে গুণ্ডাদের কাছে রেখে এসেছি, ওরা আসবে না এখন। আমি ইজারাদারের লোকের পিছু পিছু গিয়ে দেখি হাটের বাইরে ঝোপের আড়ালে আট দশ জন লেঠেল লুকিয়ে আছে। এসে এখানে নীলু আর দাশুর কাছে কিছু লোক নিয়ে যাই, সেখানে তারা আরো অনেক লোক আর লাঠি নিয়ে বসে ছিল। গুণ্ডারা যখন দল বেঁধে লাঠি হাতে করে এদিকে আসছিল তখন আমরা হাটে ঢোকবার আগেই পেছু থেকে লোকগুনোকে বেড় দিই আর তাদের হাত থেকে লাঠিগুনো ছিনিয়ে নিই। হঠাৎ লাঠি হাতছাড়া হচ্ছে দেখে তাদের দুটো লোক ছিটকে বেরিয়ে এদিকে ছুটে চলে আসে, তাদের পেছনে আমাদের চার জন লোকও ছুটতে থাকে কিন্তু ভিড়ে ঢোকবার আগে ধরতে পারে না। তাদের কী হ'ল এখনো জানি না। আমরা শুধু আট জনকে ঘিরে এনে রেখেছি।

বাকি দুজনের খবর এবং নিতাইকে মারার খবর সে শুনলে, অন্য যারা এখানে ছিল তারা আগেই জেনেছে। রহীম ইজারাদারের ঘটনা বললে। তারপর প্রস্তাব করলে যে ইজারাদারকে এখানে এনে তাদের দাবি স্বীকার করিয়ে সকলের সামনে দাবি লেখা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হ'ক, নিতাইকে মারার জন্য অন্যায় স্বীকার করানো এবং মাফ চাওয়ানো হ'ক। আর গুণ্ডাগুলোকে একে একে এখানে এসে সকলের সমানে মাফ চাইতে হবে আর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এমন কাজ আর কখনো করবে না। একথা ইজারাদারকে দিয়েও স্বীকার করিয়ে নেওয়া হ'ক। সেজন্য এখনি ইজারাদারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে হবে, রহীম, নিতাই, নেয়াজ আর জলধর গিয়ে কথা বলবে।

সকলে এক মত হলে রহীম এই প্রস্তাবের পক্ষে সভার মত নেবার জন্য বলতে উঠল। সে সংক্ষেপে দাবির ন্যায্যতা ব্যাখ্যা করে অন্য ঘটনাগুলোর কথা বর্ণনা করলে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে

আওয়াজ উঠলোঃ মারো মারো গুণ্ডাগুনোকে ! শয়তান ইজারাদারকে বেঁধে নিয়ে এস !

রহীম হেসে বললে, না ভাইসব, আমরা কাউকে মারধর করতে চাই না, চাই শুধু আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হ'ক। সেজন্যে আমরা এখুনি ইজারাদারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। কী ফল হয় সবাইকে জানাব।

কর্মীদের মধ্যে একজন জোরে চীৎকার করলে, আমাদের দাবি মানতে হবে ! অমনি চারিদিকের লোকে প্রতিধ্বনি করে উঠল, মানতে হবে !

রহীম ও অন্য তিন জন ইজারাদারের কাছে গিয়ে দেখে তার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। দোকানদার তাড়াতাড়ি উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করলে। রহীম বললে, আপনি হয়তো আমাদের কাউকে চেনেন না, আমিও চিনি না আপনাকে। তবে চেনা পরিচয়ের জন্যে কিছু যায় আসে না। দরকারী কথা আছে, তাই বলতে এসেছি। কৃষকদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ মতো কথা বলব আমরা, তারপর আপনার মতামত সভাকে জানিয়ে দেব। আমরা কী কী দাবি নিয়ে এসেছি তা আপনি শুনেছেন নিশ্চয় ?

ইজারাদার ঘাড় নেড়ে জানালে হাঁ।

এ সব দাবি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ? মেনে নিচ্ছেন কিনা ? রহীম প্রশ্ন করলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইজারাদার উদাসীনভাবে বললে,তার চেয়ে আমার গলায় ফাঁসি দিলেই পারেন।

রহীম। ও সব কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সোজাসুজি বলে দিন দাবিগুলো মানছেন কি মানছেন না। যদি না মানতে চান তাহলে এর পর নিজের দায়িত্বে তোলা তুলতে আসবেন, কেউ কিছু দেবে কিনা আমরা বলতে পারব না। তারা দরকার মনে করলে এখানকার হাট বন্ধ করে অন্য জায়গায় বসাতে পারে, তাও ভেবে দেখবেন। আর আপনি গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে আজ যে অন্যায় করেছেন

তার ফলটাও ভেবে দেখবেন। একবার হাটের সমস্ত লোকের মনের অবস্থাটা বুঝবেন। এর মধ্যেই শুনেছেন তারা আপনার আর আপনার গুণ্ডাদের সম্বন্ধে কী বলে।

কড়া কথা শুনে ইজারাদারের ভয় হ'ল দাবি না মানলে এখান থেকে সে জ্যান্ত বেরিয়ে যেতে পারবে না। হাটের লোক যদি চাঁদা করে একটা করেও কিল দেয় তা হলে দেহখানি এখানেই রক্ষা করতে হবে হয়তো। সে যে অত্যাচার অনেক করেছে এতকাল ধরে, নিজের মনে তা ভালোই বোঝে। তার উপর আজকের ঘটনা— নিতাইকে মারা এবং তার সমস্ত গুণ্ডা ধরা পড়ে যাওয়া। এর পর কলিজার রক্ত শুকিয়ে গেছে মনে হ'ল তার। বোকা চাষার দল যে এমন সাংঘাতিকভাবে তার সমস্ত কারসাজি বানচাল করে এত-খানি বিপাকে ফেলে দেবে তাকে, সে কথা কল্পনাও করতে পারেনি সে। জীবনে সে ছোটখাটো গোলযোগ অনেক দেখেছে, পুলিস সহায় আছে জেনে তাকে ভয় করেনি। কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম। এত বড় অঘটনের কথা আগে ভাবতেও পারেনি, জনতার সামনে এমনভাবে অপদস্থও কখনো হয়নি।

সে নরম হয়ে একটু দর কষাকষির চেষ্টা করলে কিন্তু রহীম বললে, দাবি সমস্ত কৃষকদের, আমরা তাদের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলছি। এ দাবি তারা কমাতে পারবে না। দাবিগুলো সব কাগজে পরিষ্কার করে লেখা আছে, আপনি শুধু সভায় গিয়ে সকলের সামনে সই করে দেবেন।

সে কাগজখানা বার করে তার হাতে দিলে। পড়ে দেখে ইজারাদার বুঝলে সই করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বললে, তাহলে আর কী করা যাবে, চলুন, সই করে দিইগে! আত্মহত্যাই করি আজ!

রহীম তখন অন্য সিদ্ধান্তগুলোও জানালে, বললে, হ্যাঁ। তার আগে আরো দু একটা কথা বলে নিই। নিতাইবাবুকে যে মারা হয়েছে সেজন্যে আপনাকে অন্যায় স্বীকার করে সভার সামনে মাফ

চাইতে হবে। আর আপনার গুণ্ডারাও যাতে একে একে এসে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করে মাফ চায় আর ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না বলে ওয়াদা করে সভায় সামনে, সেজন্যে আপনি বলে দেবেন তাদের।

ইজারাদার বললে, দেখুন বাবু, অন্য লোকে কে কী করেছে না-করেছে তার জন্যে আমি দায়ী নই। সে আপনি তাদের কাছে বলুন। আমি কোন গুণ্ডা আনিনি এখানে। আমাকে সেজন্যে দোষ দেবেন না।

রহীম হাসলে। বললে, ও, গুণ্ডারা তাহলে নিজেদের গরজেই এসেছিল লাঠি নিয়ে মারপিট করতে, কেমন ? আপনি তাদের লাঠি নিয়ে ডেকে আনবার জন্যে এইখানে বসে লোক পাঠাননি তাহলে, কেমন ? আচ্ছা,ভালো কথা। তাদের কী বলতে হবে আমরাই ঠিক করে দোব। আপনি শুধু নিতাইবাবুকে মারার জন্যে অন্যায় স্বীকার করে মাফ চাইবেন।

ততক্ষণে ইজারাদারের সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে, মন একেবারে ভেঙে গেছে। নিতান্ত অসহায়ের মতো হাত জোড় করে মিনতি করলে, জোড়হাত করছি বাবু, এটুকু আমাকে রেহাই দেন। আমি শুধু বলব নিতাইবাবুকে যেই মেরে থাকুক, মারা অন্যায় হয়েছে। তার বেশি আর কিছু করতে বলবেন না।

সে দোকানদারের কাছে এক গেলাস জল চেয়ে খেলে।

রহীম তার কথা শুনে সঙ্গীদের দিকে চাইলে। তারা বুঝলে সে এখানেই ক্ষান্ত দিতে চায়, এবং নীরবেই সমর্থন জানালে।

সে উঠে জলধর ও নেয়াজকে একপাশে ডেকে বললে গুণ্ডাগুলোকে বলগে ইজারাদার এখনি সভার সামনে উঠে দাবি মেনে নিয়ে কাগজে সই করবে আর বলবে নিতাইবাবুকে মারা অন্যায় হয়েছে। আর গুণ্ডাদের প্রত্যেককে সভায় বলতে হবে, ইজারাদারের হুকুমেই সে লাঠি নিয়ে মারপিট করতে এসেছিল, নিতাইবাবুকে তাদেরই একজন মেরেছে বলে সে সভার কাছে মাফ চাইছে, আর সকলের

সামনে ওয়াদা করছে আর কখনো কারো পক্ষে সে গুণ্ডাগিরি করবে না। এই তিনটি কথা তাদের সকলকে বেশ করে শিখিয়ে দেবে, ইজারাদারের বলা হয়ে গেলে তারা এসে একে একে বলে যাবে সভার কাছে।

নেয়াজ ও জলধর চলে গেলে রহীম ও নিতাই ইজারাদারকে নিয়ে সভায় হাজির হ'ল। রহীম উঠে বললে, বন্ধুগণ, কৃষক ভাইসব, আমরা ইজারাদারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আপনাদের দাবি সবই মেনে নিয়েছেন, এখুনি সেই সব দাবি-লেখা কাগজে আপনাদের সামনে সই করবেন।

একজন কর্মী আওয়াজ তুললে, কৃষক সমিতির জয়! অন্যেরা শুধু বললে, জয়।

ইজারাদার বেঞ্চির উপরে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে কেবল একটা খাতার উপর কাগজখানা রেখে সই করে দিলে। তারপর বললে, সভার মধ্যে নিতাইবাবুকে মারা হয়েছে। যেই মেরে থাকুক, মারাটা অন্যায় হয়েছে।

বলেই সে বেঞ্চি থেকে নেমে দ্রুত পদে নদীর ঘাটে গিয়ে তার নৌকায় উঠে চলে গেল, মুহূর্তের জন্যও কাউকে মুখ দেখাতে পারলে না। সেদিনের-মতো হাটের তোলা-বাটি আদায় আর হ'ল না।

রহীম উঠে সই করা কাগজখানা সভার সকলকে দেখিয়ে বললে, এই আপনাদের দাবি লেখা কাগজ, এরই নিচে ইজারাদারের সই আর তারিখ।

পিছন ফিরে দেখলে নিরস্ত্র গুণ্ডারা একে একে আসছে, সমিতির কর্মীরা তাদের পাশে পাশে আছে। নেয়াজ আর জলধর এক এক জনকে তার বক্তব্য বুঝিয়ে বলছে এবং তাকে একবার তাদের নিকট সেই বক্তব্য বলিয়ে শোনার পর সভার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

রহীম বললে, ভাইসব, এবার আর একটি কাজ বাকি আছে। যারা ইজারাদারের পক্ষ নিয়ে গুণ্ডামি করে আপনাদের মারপিট

করতে আর সভা ভাঙ্গতে এসেছিল তারা গ্রামেরই গরিব লোক। পয়সার লোভেই হ'ক বা অন্য কারণেই হ'ক' এইঅন্যায় কাজে পা বাড়িয়েছিল তারা। কিন্তু তারা বোঝেনি আপনাদের দাবি আদায় হলে আপনাদের মতন তাদেরও লাভ। আশা করি এখন তারা বুঝবে। তাই এই সব গরিব মানুষের ওপর কেউ রাগের মাথায় হামলা করতে যাতে না পারে সেজন্যে আমাদের কর্মীরা তাদের রক্ষা করেছেন এতক্ষণ, নইলে এই সভার এত লোকের কোপে পড়ে মার খেলে তারা ছাতু হয়ে যেত। যাই হ'ক, এখন তারা একে একে আপনাদের সামনে দু একটা করে কথা বলবে নিজেদের তরফ থেকে।

তখন তারা একে একে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে তাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তেমনি বলে গেল। সকলে গুছিয়ে বলতে না পারলেও কী বলতে চায় বোঝা গেল। জন তিনেক আর এমন কাজ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেবার সময় দু হাতে নিজেদের কান মলেও গেল। জন দুই নির্দেশের বাইরেও কিছু বললে। বললে তারাও কৃষক। ইজারাদার তাদের মহাজন। গুণ্ডাগিরি করবার জন্য তাদের কিছু কিছু টাকাও সে দেয়। কিন্তু এত দিন তারা বোঝেনি কৃষকদের দাবি তাদেরও দাবি, আজ বুঝছে সে কথা। এর পর তারা সব কাজে কৃষকদের সঙ্গেই থাকবে। কৃষক ভাইরা যেন তাদের অপরাধের জন্য মাফ করে।

তাদের বলা শেষ হলে রহীম আবার উঠল। যখনি সে বলতে উঠেছে লোকের মনে প্রশ্ন উঠেছে—ভদ্রলোকটি কে? পাশের লোককে জিগেস করেও জানতে পারেনি। কেবল যারা তাকে বৈঠকে বা অন্যত্র দেখেছে তারা জবাব দিয়েছে, কমরেড। তার নাম জানে খুব কম লোকেই, কমরেড নামেই সে পরিচিত হয়েছে। কর্মীদের মধ্যে পর্যন্ত শুধু কমরেড বলতে রহীমকেই বুঝিয়েছে। এবার উঠল যখন রহীম তখনো অনেকে পাশের লোককে একই প্রশ্ন করলে, কিছু লোক উত্তরও পেলে একই।

রহীম বললে, ভাই সকল, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।

এতকাল হাট তোলা বাবত যে অত্যাচার সয়ে এসেছেন আজ তা দূর হ'ল। জুলুম বন্ধ হয়েছে, আপনারা সকলে একমত হয়ে এক জোট হয়ে নিজেদের দাবি ঠিক করেছেন, সে দাবি এই সভায় তুলেছেন, তারই ফলে। আপনারা একতার জোরেই এই দাবি আদায় করতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে যাতে এই দাবি কেউ কেড়ে নিতে না পারে সেজন্যে এই একতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু আপনারা যে আজ এক হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন কৃষক সমিতির লাল ঝাণ্ডার নীচে, সে এই কৃষক সমিতির দৌলতে, সমিতি আপনাদের আবাদে এসে তার কাজ শুরু করেছে বলে। এখন থেকে আপনারা যারা কৃষক—ছোট, বড়, মাঝারি সব রকমের কৃষক—যারা ভাগচাষী, যারা জনমজুর-মাহিন্দার সবাই সমিতির মেম্বর হয়ে যাবেন। আপনাদের আরো অনেক দাবির লড়াই করতে হবে, তার জন্যে রাস্তা দেখাবে এই সমিতি আর তার ঝাণ্ডা।

সে তখন কৃষক সমিতি ও তার সংগঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বললে। সকলকে মেম্বর হবার জন্য আবার আবেদন জানালে। শেষে বললে, হাট আন্দোলনে আপনাদের যে জিত হ'ল তাই দেখে এখন এই এলাকার সমস্ত হাটেই আন্দোলন হবে বলে আমি আশা করি। কৃষকরা এক হয়ে দাবি তুললে সেখানেও সে দাবি আদায় হবে। আপনারা আন্দোলনের রাস্তা দেখিয়েছেন সকলকে। কাজেই অন্য সব হাটের আন্দোলনেও যাতে কৃষকদের জিত হয় সেজন্যে আপনাদেরও দায়িত্ব থাকবে। সে দায়িত্ব নিতে পেছুলে চলবে না।

সে বক্তব্য শেষ করে শ্লোগান দিলে : হাট তোলার জুলুম বন্ধ কর ! কৃষক সমিতির জয় ! লাল ঝাণ্ডার জয় !

তার আগে বুঝিয়ে দিলে শ্লোগান দেবার অর্থ কী, কেমন করে তাতে সাড়া দেওয়া উচিত। তাই প্রত্যেকটি শ্লোগান দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে সাড়া দিলে সকলে।

বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভার কাজ শেষ হ'ল। রহীম বসতে

যাচ্ছে, অমনি দুদিক থেকে দাশু আর নীলু তাকে একসঙ্গে কাঁধে তুলে নিয়ে জোর আওয়াজ তুললে, কমরেডের জয়! তাতেও জনতার ভিতর থেকে তেমনি সাড়া পাওয়া গেল, রহীম দুই ছেলে-মানুষের এই অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত বোধ করলে কিন্তু তা সহ্য করতেই হ'ল।

নীলু-দাশুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে রহীম যখন বেঞ্চিতে বসল তখন একটু অবসাদ অনুভব করলে। মনে হ'ল গরম চা পেলে ভাল হ'ত। কিন্তু তার উপায় ছিল না; এ হাটে চায়ের দোকান নাই। বুঝলে এ কলকাতা শহর নয়।

সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়টা খুব বেশী দীর্ঘ ছিল না বটে কিন্তু তার মধ্যে ঘটনাগুলো অত্যন্ত উত্তেজনাকর দ্রুত গতিতে ঘটে গিয়েছিল। সেই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনমতের ভিত্তিতে সভার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার চিন্তা তার মনের উপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে রেখেছিল। কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করবার অভিজ্ঞতাও তার এই প্রথম। তাই অবসাদ বোধ করলেও গভীর স্বস্তিতে তার বুক ভরে উঠল।

কিন্তু সে এই স্বস্তি ভোগ করবার জন্য নীরব থাকার অবসর পেলে না। অনেক লোক এসে তাকে ঘিরে ধরলে। তার মধ্যে অন্য দুটো হাট এলাকার লোক এসে আবেদন জানালে এখন তাদের হাটের আন্দোলন চালাবার জন্য তাকে যেতে হবে।

বংশী আর বসন্ত তাকে বাঁচালে আপাতত, বসন্ত বললে, আজকের বড্ড ঝামেলা গেছে ভাই ওনার ওপর। আজ কমরেডকে ছেড়ে দাও, কাল বরঞ্চ এসো এক সময়ে, তখন কথা হবে। তারা পরদিন সকালে আসবে বলে গেল।

আরো অনেকে রহীমকে অনুরোধ করলে তাদের গ্রামগুলোতে যাবার জন্য, কৃষক সমিতি সম্বন্ধে তাদের কাছে আলোচনা করবার জন্য। তাদেরও বলা হ'ল দু একদিন পরে এসে আলাপ করতে।

রোস্তম বললে, এখন তাহলে ফেরা যাক ভাই। রহীম উঠে দাঁড়াল। ঝাণ্ডা তুলে নিয়ে কমরেডদের সঙ্গে মিলে সে আমতলী ফিরে গেল। এখন তাদের সকলেরই হাতে লাঠি। নীলু ও দাশুও গেল। ইতিমধ্যে বাকি সমস্ত লাঠি নীলু সরিয়ে দিয়েছিল।

তারা দল বেঁধে বেরোতেই আমতলীর পথের যাত্রী অনেক জুটে গেল, বেশ একটা মিছিল হয়ে গেল তাতে। চলতে চলতে অনেকেই অনেক উৎসাহজনক মন্তব্য করতে লাগল। ইজারাদার ও গুণ্ডাদের সম্বন্ধে হাসি তামাশা করলে। এর পর মহাজনরাও যে কৃষক ও মজুরদের উপর এখনকার মতো জুলুম করতে সাহস পাবে না এমন মন্তব্যও দু-চারজন প্রকাশ করলে।

রোস্তমের বাড়ি পৌঁছে কমরেডদের সঙ্গে রহীম হাল্‌কাভাবে হাসি তামাশা করলে। স্থির হ'ল আগামী পরশু তারা আজকের সভার বিষয় নিয়ে আলোচন করবে এবং ইতিমধ্যে সকলে যথাসম্ভব সাধারণ লোকের মতামত জানতে চেষ্টা করবে।

দশ

রাতটা বড় গরম ছিল বলে রহীম খোলা উঠনে শুয়েছিল। ভোর থেকে ঝির ঝির করে একটু হিমেল হাওয়া বইছে। কিছুক্ষণ হ'ল ঘুম থেকে উঠেছে। একটা মোড়ায় বসে গত দিনের ঘটনাগুলি নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছে।

দাউদ এসে বসল। বললে, কমরেড সমিতির রসিদ বই লাগবে, তার জন্যে এসিছি।

সে কি দাউদভাই, এত সকালে আসতে হ'ল, কাল নিয়ে গেলেই তো পারতে, বললে রহীম।

কাল তো অতটা খেয়াল করিনি। বাড়ি ফিরে যেয়ে দেখি লোক এসে বসে আছে মেম্বর হবে বলে। বলিছি আজ নিয়ে যাব রসিদ।

সমিতির ওপর তো খুব টান দেখি লোকের !

খুব টান কমরেড। কালকের হাটের কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমাদের গাঁয়ের লোকের মাথা বিগড়ে গেছে। বলে, সমিতি না করলে আর চলবে না আমাদের, আর ঐ লাল ঝাণ্ডা একটি চাই। ঐ ঝাণ্ডার ভারি জোর, ইজারাদারকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়েছে কাল।

রহীম হেসে উঠল, তাই বলছে নাকি লোকে ?

হ্যাঁ কমরেড, ঝাণ্ডাটা ওদের খুব পছন্দ। বলে দাম দোব, এনো একটা।

কিন্তু ঝাণ্ডা এখন আমি পাই কোথা বলতো ? রহীম অক্ষমতা জানালে। এমনি কিনতে পাওয়া যাবে না, কাপড় কিনে তৈরি করাতে হবে—বসিরহাটে; নয় কলকাতায় আমি কলকাতায় গেলে কতকগুলো নিয়ে আসব।

রোস্তম জানে রহীম খুব সকালে নাশতা করে। একটা বাসনে কিছু মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল সে। দাউদ দেখে বললে, শুধু শুকনো মুড়ি, আর কিছু নেই ?

না গো, কিছু নেই। চা-ও কাল থেকে একদম ফুরিয়ে গেছে, চা-ও দিতে পারিনি।

তাই তো কমরেড, এমন জানলে, আমার ঘরে গোটাকতক কলা পেকেছেল, নিয়ে আসা যেত, দাউদ আফসোস করলে।

তার জন্যে কিছু নয়, এই বেশ খাওয়া যাবে। এস দাউদভাই, খাও, বলে রহীম আরম্ভ করলে খেতে।

পিঁয়াজ আছে ঘরে, চলবে ভাই ? জিগেস করলে রোস্তম।

তা চলবে না কেন ? নিয়ে এস, বললে রহীম।

দাউদ রসিদ বই নিয়ে ওঠবার আগেই আর দুজন এল। তাদের আসার কথা ছিল সোনাপুর হাটের আন্দোলন সম্পর্কে। তাদের নাম বললে দুলাল আর গণেশ। জোয়ান ছোকরা দুজনেই। দুলাল ভাগচাষী। গণেশের নিজের সামান্য জমি আছে, অন্য চাষীর সঙ্গে মিলে চাষ করে আর জন খাটে। মাঝে মাঝে মাছের কারবারও একটু করে।

দুলাল বললে, আমাদের গাঁয়ে যেয়ে দু এক দিন থাকতে হবে কমরেড, হাট তোলা বন্ধ করবার জন্যে। আজ রোববার, পরশু মঙ্গলবারে আমাদের হাট। এখন যেতে পারলে দুটো দিন লোকের সাথে কথা বলতেন। আমরা থাকার বন্দোবস্ত করে দোব।

দুস্, আজ কী করে যাবে ? কাল আমাদের এখানে অমন দরকারী কাজ রয়েছে, সে ফেলে রেখে কি উনি যেতে পারেন কোথাও ? বললে দাউদ।

রহীম। তোমাদের সোনাপুর কতটা রাস্তা এখানে থেকে ?

গণেশ। মাইল চারেক হবে কমরেড।

রহীম। ওখান থেকে মধুখালির হাটে কাল কত লোক এসেছিল ?

গণেশ। তা জন আট দশ হবে।

রহীম। তারা লোকের কাছে বলছে কী হ'ল এখানে?

দুলাল। বলছে বৈকি। লোকেও শুনে বলছে আমাদের হাটেও তোলা বন্ধ হয়ে যাবে।

রহীম। তাহলে তোমরা ভাবনা করছ কেন? লোকে যখন নিজেরাই বন্ধ করতে চায় তখন তারা তোলা দেবে কেন? না দিলেই তো বন্ধ হয়ে যাবে।

দুলাল। সে কথা ঠিক। তবু লোককে বুঝোন দরকার।

রহীম। তোলা আদায় করে হাটের মালিক, না ইজারাদার?

দুলাল। না, ইজারাদার নেই, মালিকই আদায় করে। গাঁয়েরই লোক সে। তার জমিন অনেক, বেশ বড়লোক। এমনি লোক খুব খারাপ নয়। শিক্ষিত লোক, তবে তার স্বার্থে ঘা লাগবে তো বন্ধ করলে।

লোকে বন্ধ করে দিলে কাজ সহজ হয়ে যায় বটে কিন্তু দুলাল আর গণেশ ভাবছে অত সহজে বন্ধ না হলে মালিকের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করবার মতো সাহস ও যোগ্যতা তাদের নেই। পূর্ব দিনের অবস্থা দেখে তাদের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে রহীমের কিছু অসাধারণ শক্তি আছে, নইলে ইজারাদারের মতো একজন দুর্দান্ত ব্যক্তিকে ওভাবে দমন করা সম্ভব হ'ত না।

রহীম তাদের মনের কথা ঠিক না জানলেও ভাবলে যখন আন্দোলনটা শুরু হয়েছে ভালো, তখন অন্যত্রও তাকে সফল করতে পারলে গোটা অঞ্চলটাতে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়। সেজন্য ওরা যথেষ্ট সাহস পাচ্ছে না যখন তখন তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন। কিন্তু তার ইচ্ছা মঙ্গলবারে মধুখালির হাটের অবস্থা কেমন থাকে দেখবে। এখনো ইজারাদার শয়তানী করতে পারে, আবার গুণ্ডা আনতে পারে, হয়তো পুলিস এনেও গোলমাল করতে পারে। সুতরাং নিজেরা প্রস্তুত না থাকলে অঘটন ঘটে যেতে পারে।

সে আরো ভাবলে মধুখালির বিজয়ের সূত্র ধরে সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্যান্য হাটে তোলা বন্ধ করা হয়, বিলম্ব করে লোকের উৎসাহে ভাটা পড়তে না দেওয়া হয়, তা হলে সেখানেও আন্দোলনকে সফল করা অনেকটা সহজ হবে। সর্বত্র না হলেও অন্তত আরো দু একটা হাটে আন্দোলন সফল হলে তার জের টেনে পরে অন্য হাটের আন্দোলনেও জয়লাভ করা যেতে পারে। এটাও ভাবতে হ'ল যে আন্দোলনের আঘাতটা যখন দেওয়া হবে মালিককে, তার পূর্বে অন্তত কৃষকদের মধ্যে কিছু প্রস্তুতি হওয়া দরকার।

এই সব চিন্তা করে সে দোটানায় পড়ে গেল। সোনাপুর সে যেতে পারে যদি পরদিন এখানকার কর্মীরা মঙ্গলবারে মধুখালির জন্য পুরো দায়িত্ব নিতে পারে এবং সেও তাদের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। নতুন আন্দোলনে জয়লাভের চেষ্টার চেয়ে যে আন্দোলন বিজয়ী হয়েছে তাকে সংহত করা বেশি প্রয়োজন।

তখনি কোন সিদ্ধান্ত করতে পারলে না সে। তাকে অপেক্ষা করতে হবে পরদিন সকালে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। সে কথা জানালে তাদের। বললে, কাল বিকালের দিকে একজনকে আসতে হবে, পারি তো তখনি যাব, নইলে জানাব কী করা হবে। ইতিমধ্যে তাদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে কী করা দরকার বুঝিয়ে বলতে লাগল।

সেই সময় মোহনগঞ্জ থেকে দু জন এল—কাসেম আর অর্জুন। তাদেরও আজ আসতে বলা হয়েছিল। একই সমস্যা তাদের, কেবল তাদের হাট বসে সোমবারে আর শুক্রবারে। তাদের সঙ্গে তাদের হাট সম্বন্ধে কিছু আলাপ করে রহীম একই জবাব দিলে—পরদিন বিকালে একজনকে আসতে বললে।

সোনাপুর ও মোহনগঞ্জের লোক উঠে যাচ্ছে এমন সময় দেলখোশ মোল্লা এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে একটা ছোকরা, তাঁর বাড়ির রাখাল। একটা রুই মাছ, কতকগুলো পাকা কলা এবং কিছু তরি-তরকারি নিয়ে এসেছেন তিনি। আগের দিন হাটে তিনি

হাজির ছিলেন এবং আন্দোলনের সাফল্যে খুব খুশী হয়েছেন। রহীম এবার আসার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় পায়নি। তাই তিনি নিজেই এসেছেন এই তত্ত্ব নিয়ে।

আদাব চাচা, আসুন, বসুন, বলে রহীম তাঁকে অভ্যর্থনা করলে। তিনি জিনিসগুলো তাকে দেখিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন তুমি এসেছ, শুনিছি বাবা। তোমার বড্ড কাজ শুনে নিজেই এসিছি দেখা করতে। কাল হাটে ছিলাম আমি, সব দেখিছি। বড় ভালো কাজ করেছ বাবা। ইজারাদারের এত জুলুম কি মানুষ সইতে পারে! তা একবার চল আমাদের বাড়ি।

যাব চাচা, নিশ্চয় যাব, রহীম জবাব দিলে। কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছি না। এই দেখুন না ভোর থেকে শুরু হয়েছে, লোকজন আসছেই, কামাই নেই। আপনার শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ বাবা, খোদা ভালোই রেখেছে। তা কবে যাচ্ছ বল আমাদের গাঁয়ে?

রোস্তম বেরিয়ে এল। শুনে বললে, চাচা রহীম ভাইয়ের দম ফেলবারও সময় নেই। ওনাকে নিয়ে যাব একদিন, তবে কবে যেতে পারবেন বলা যায় না।

নীলু এবং আরো কয়েকজন এল বিভিন্ন গ্রাম থেকে। তাদের বসিয়ে রেখে রহীম মোল্লার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলে। তিনি আন্দোলনের সফলতা দেখে লোকে কত উৎসাহিত হয়ে মন্তব্য প্রকাশ করছে সে সম্বন্ধে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেন। পরে রোস্তমের সঙ্গে আলাপ করে ফিরে গেলেন।

নীলু বিশেষ কোন কাজে আসেনি, কেবল লোকে কোথায় কত ভালো মত প্রকাশ করেছে তাই বললে! শেষে জিগেস করলে সে যে-সমস্ত লাঠি যোগাড় করে রেখেছিল তা এখনো থাকবে, না সরিয়ে দেবে। রহীম বললে, থাক না এখন, এত তাড়াতাড়ি সরাবে কেন? আবার দরকার হতে পারে মঙ্গলবারে।

অন্তেরা সকলে তাকে তাদের নিজ নিজ গ্রামে নিয়ে যাবার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে—এখনি যেতে না পারলে "বায়না করে" রাখবে বলে। তাদের মধ্যে তার পরিচিত লোকও আছে। তাদের গ্রামে থেকে এসেছে সে প্রচারের সময় এবং আবার আসবার কথাও বলেছে তখন। সে জানে রাজনীতিক আলোচনার জন্য তাকে অনেক গ্রামে যেতে হবে, থাকতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই অনেককে বলেছিল আবার যাবে। কিন্তু সেজন্য সময় নির্ধারণ করা এখন সম্ভব নয়।

তবে তাদের নিয়ে বহুক্ষণ আলাপ করলে, গ্রামগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে আরো খোঁজখবর নিলে, অপরিচিতদের নাম ধাম লিখে রাখলে। এই আলাপ চলছে, তারই মধ্যে দু একজন করে আরো অনেক লোক এল। আন্দোলন ও তার সাফল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রামের লোকের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এই আলাপের মধ্যে দিয়েই সে অনেকটা জানতে পারলে: সর্বত্রই লোকের মধ্যে উৎসাহ ও চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে।

এর মধ্যে এল বংশী। সে ভোরে বেরিয়ে কয়েকটা গ্রাম ঘুরে এসেছে এবং অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। সেও একই সংবাদ বললে, কোথায় কারা কি বলেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিলে।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে দুপুর হয়ে গেল। রোস্তম এসে প্রায় তিরস্কারের সুরে বললে, হ্যাঁ ভাই, কোন্ সকালে তো দুটো চোঁয়া মুড়ি খেয়েছেন, আর কিছু জোটেনি। তা এখনো কি নাইতে খেতে হবে না?

হবে হে, হবে। বসেই তো আছি, এত তাড়া কিসের? হেসে বললে রহীম। পাঁচ জায়গার মানুষ এসেছে, দুটো কথা বলতে হবে না?

তার শ্রোতারা একটু অপ্রস্তুত হ'ল। একজন বললে, হ্যাঁ যান, দুপুর হয়ে গেছে। আচ্ছা কমরেড, সমিতির রসিদ বই চাই যে, আর ঐ লাল ঝাণ্ডা একটা চাই।

অন্য সকলেরও একই দাবি। আগ্রহটা সর্বত্রই। কিন্তু রহীম যা রসিদ বই এনেছে সে যথেষ্ট নয়, সকল গ্রামে দিতে হলে অল্প অল্পই দেওয়া চলে! বাড়তি পতাকাও তো নাই, পরে আনিয়ে দিতে হবে। তবে মেম্বর সংগ্রহের কাজটা এই সময়ে গরমে-গরমে হয়ে যাওয়া ভালো, নইলে পরে আবার কাজ ঢিলে হয়ে যাবে, সে ভাবলে।

বললে, দেখুন বাড়তি ঝাণ্ডা নাই এখানে, পরে তৈরি করিয়ে আনিয়ে দোব। আর রসিদ বই যা আছে, কিছু কিছু দিচ্ছি সকলকে। ফুরিয়ে গেলে বাকি মেম্বর সাদা কাগজে নামধাম আর তারিখ লিখে সংগ্রহ করবেন, পরে রসিদ কেটে দেয়া হবে।

ব্যবস্থাটা আপাতত তাই হ'ল।

দুপুরে খেতে বসে রহীম রোস্তমকে বললে, তুমি লোকমানের বিয়েতে কবে যাচ্ছ? তার মাও ছিলেন সেখানে।

আসছে রোববারে বিয়ে, তাহলে বুধবারে না পারি বেস্পতি-বারে তো যেতেই হবে, উত্তর দিলে রোস্তম। আপনি কবে যাবেন?

রহীম। তোমরা সবাই তো যাচ্ছ? খালামা, দায়েম?

রোস্তম। হ্যাঁ, সবাইকেই যেতে হবে। সেজন্যে আপনি ভাববেন না, আপনার দু একদিন দেরি হলে বড়ভাই খাবার ব্যবস্থা করবে। আমার গরুবাছুরও দেখবে ওদের রাখাল।

রহীম। সেটা তো ভাবনার কথা নয়, কিন্তু আমি পড়ে গেছি মুশকিলে। আমার অবস্থা তো দেখলে। এখান থেকে তো ছুটিই পাচ্ছি না। যা দেখছি, সোনাপুর আর মোহনগঞ্জ যেতেই হবে। সেখান থেকে আবার কোথাও যেতে হবে কিনা এখনো জানি না। মঙ্গলবারে এখানকার হাটে থাকব ভেবেছিলাম। কাল দেখি তোমরা যদি ওটার ভার নিতে পার তো সোনাপুর যাব, সেখান থেকে মোহনগঞ্জ।

রোস্তম। তাহলে কি আপনি যেতেই পারবেন না কলকাতা?

রহীম। তার জন্যেই তো আমার ভাবনা। লোকমানের বিয়ে অথচ আমি থাকতে পারব না। শুধু লোকমানই নয়, তার সঙ্গে নূরজাহান। আমার আসার আগে মামীমা বড় মুখ করে বলেছিলেন আমায় আসতেই হবে। আমিও জোর দিয়েই বলেছিলাম যাব। তখন কি জানি এখানে এমন করে ফেঁসে যাব! বিয়েতে যদি যেতে না পারি, পরে দেখা হলে মামীমাকে কী জবাব দোব বল তো? লোকমানকেই বা কী বলব?

রোস্তম। সত্যিই তো, ভারি মুশকিল হ'ল তাহলে।

রহীম। যেতে না পারলে আমি তিনজনকেই চিঠি দোব তোমার হাতে। আর, খালামা, আপনাকে একটু কাজ করতে হবে। রোস্তম তো বলবেই, আপনিও আমার হয়ে মামীমাকে বলবেন আমার এই অবস্থার কথা তিনি যেন আমার ওপর রাগ না করেন। লোকমানকে নূরজাহানকেও বলবেন, সময় পেলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম, পারছি না বলে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে।

তা বলব আমি, সবাইকেই বলব, তিনি বললেন। তবে তুমি যেতে না পারলে আমিও বড় কষ্ট পাব বাবা। তুমি যেই হও, এখন তো আমাদের আপন লোক। লোকমান আমার বড় ছেলে, আর নূরজাহান আমার ভাইয়ের বেটী। তাদের বিয়েতে তুমি না থাকলে তাদের যেমন কষ্ট হবে, আমারও তেমনি হবে। তবে দশ জনের কাজ, লোকে না ছাড়লে তুমিই বা কী করবে বাবা।

সারা বিকালটা বসে রহীম তার আবাদে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত হাট তোলা আন্দোলন সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখলে এবং এখানকার বিভিন্ন সমস্যার ও অবস্থার উল্লেখ করে আশু ভবিষ্যতে কী করা প্রয়োজন তাও লিপিবদ্ধ করলে। তাছাড়া সে যে লোকমানের বিয়েতে যেতে পারছে না সেজন্য চিঠি তিনখানাও লিখে ফেললে। সংক্ষিপ্ত পত্র, দুঃখ প্রকাশ করা ও মাফ চাওয়ার জন্য লেখা। চিঠিগুলো একখানা খামে ভরে তার উপর লিখলে শুধু

"মামীমা", যাতে মরিয়ম মারফত লোকমান ও নূরজাহানের নামে অন্য দুটো বিলি করা হয় এবং যাতে অন্তত নূরজাহানকে লেখা চিঠি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে।

লেখা শেষ করে সে ভাবছিল এতদিন হয়ে গেল অথচ কলকাতার কোন খবর বা কাগজ কিছুই এল না। বসন্ত আর জলধর এসে তার চিন্তায় বাধা দিলে ; এমনিই এসেছে, বিশেষ কোন কাজে নয়। একটু পরেই আরো কয়েকজন এসে বসল। নিকটেই বাড়ি তাদের —আমতলী, চণ্ডীপুর, মধুখালি। আরো অল্পক্ষণ পরে নীলু সঙ্গে নিয়ে এল একজনকে—সে সুরেশ, এসেছে জেলা কেন্দ্র থেকে। নদীর ঘাটে নেমে আমতলীর পথ জিগেস করছিল, নীলু শুনে তার পরিচয় নিয়ে সঙ্গে করে এনেছে।

সুরেশ রহীমের পরিচিত পূর্বে থেকেই। সমিতির জেলা আফিসে কাজ করে। প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে রহীমের জন্য চিঠি-পত্র এবং অনেক দিনের দৈনিক কাগজ নিয়ে এসেছে। পরদিন সকালেই ফিরে যাবে।

এই অল্পদিনের মধ্যে রহীম এ অঞ্চলের সঙ্গে নিজেকে এমন-ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে যে সে যেন তার পুরোন জগৎকে ভুলেই যাচ্ছিল, এখন সুরেশ এসে সেটাকে মনে করিয়ে দিলে। কাগজ-গুলো পেয়ে খুব খুশী হ'ল সে। এ সব পুরোন কাগজও তার কাছে নতুন, দুনিয়ার খবর বয়ে এনেছে তার কাছে, দুনিয়ার বাইরে।

সে সুরেশের পরিচয় দিলে উপস্থিত সকলের নিকট এবং তাকে বললে, এসব আমাদের এই এলাকার কমরেড। এই কমরেডের নাম বসন্ত। নীলু তো তোমাকে নিয়েই এসেছে। এদের সঙ্গে আলাপ কর। তোমার হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করছি কিন্তু চা পাবে না বলে দিচ্ছি।

দায়েমকে ডেকে রহীম বললে, খালামাকে বলগে রাতে আর একজন মেহমান খাবে। আর পানি এনে দাও এক বদনা, খাবার পানিও এক গেলাস।

তারিখ অনুসারে পর পর কাগজগুলি খুলে কেবল হেডিং পড়ে যেতে লাগল রহীম, মাঝে মাঝে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকলে পড়ে নিলে। একটা খবর দেখলে ভারত সরকার প্রেস নোট প্রচার করে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের শাসানি দিয়েছে। স্থরেশ বললে যে কয়েকজন নেতাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, হয়তো তাঁদের গ্রেপ্তারও করবে এরপর। আর একটা খবর ছিল ভূমি রাজস্ব কমিশন সরকারের কাছে তার রিপোর্ট দাখিল করছে।

রহীম দায়েমকে কী বলেছে জলধর খেয়াল করেনি। ভাবলে স্থরেশ যখন হিন্দু তখন তার খাবার ব্যবস্থা তার বাড়িতেই করা উচিত। শুনেছিল অবশ্য যে কমরেডরা জাতি-ধর্ম বিচার না করে সকলের বাড়িই খায় কিন্তু বাস্তবে যে তা সত্য হতে পারে সে ধারণা ছিল না তার। রহীমকে বললে, তাহলে এ কমরেডের খাবার ব্যবস্থা আমার বাড়িতেই করব তো?

স্থরেশ রহীমের দিকে চেয়ে বললে, কেন, এখানে হবে না? আপনি এখানেই বলে দিলেন না? সমস্ত সময়টা রহীমের সঙ্গে কাটাতে চায় সে।

হ্যাঁ, এখানেই হবে ব্যবস্থা, রহীম হেসে বললে, কিন্তু জলধর-দাদা বোধ হয় ভাবছে তুমি হিন্দু কমরেড হয়ে মোসলমান কমরেড রোস্তমের বাড়ি ভাত খাবে কী করে। চা হলেও চলত, এ যে অন্ন দোষের ব্যাপার। তাই না জলধরদাদা? যাই হ'ক, খেয়ে ফেল এখানেই, পরে কলকাতা ফিরে গিয়ে না হয় জিভে গোবর ঠেকিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে নেবে একটু।

সকলে হেসে ফেললে। জলধর একটু লজ্জিত হ'ল। কিন্তু হেসে বললে, না কমরেড, আমি তা বলতে চাইনি।

রাত্রে রহীম তাদের দুজনের খাবার বাইরে আনিয়ে খেলে। পরে দুজনে একত্র শুয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ করলে। রহীম এখানকার অবস্থা বললে আর স্থরেশের কাছে কলকাতার খবর,

তাদের সমিতি ও পার্টির খবর শুনলে। পরদিন সকালে সে তার রিপোর্ট স্থরেশের হাতেই পাঠালে।

সংগঠনী কমিটির বৈঠকে ঠিক হ'ল রহীম সেইদিন বিকালে সোনাপুর যাবে এবং পরে অবস্থা বিবেচনা করে মোহনগঞ্জও যাবে, যদি তার প্রয়োজন থাকে। মধুখালির হাট সম্বন্ধে স্থানীয় কমরেডরা পূর্ণ দায়িত্ব নেবে। তারা আশ্বাস দিলে যে গত হাটের আন্দোলনে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকে সম্বল করে পরের হাটেও তারা প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা রাখবে, নিজেদের সমস্ত বুদ্ধি ও লোকবল কাজে লাগবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ সোনাপুর বা অন্য কোন নতুন ক্ষেত্রে গিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারবে না, সেজন্য রহীমকেই যেতে হবে।

রহীম তাদের বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দিলে সম্ভাব্য বিপদ কী কী ঘটতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা রাখা দরকার।

বিকালে সোনাপুরের দুলাল এবং মোহনগঞ্জের কাসেম এল। রহীম তাদের সঙ্গে চলে গেল। কবে ফিরতে পারবে নিজেও জানে না। তাই কিছুদিন দেরি হবে বিবেচনা করেই প্রস্তুত হয়ে গেল। কাসেমকে মঙ্গলবার বিকালে সোনাপুর হাটে এসে দেখা করতে বলে মাঝ পথে বিদায় দিলে।

পথে সোনাপুর হাট এলাকার দুখানা গ্রামে দুলাল ও রহীম লোকের সঙ্গে আলাপ করলে। দুলালের পরিচিত লোক ছিল তাদের মধ্যে। দেখা গেল পরদিন হাটে কোন লোকই তোলা দিতে রাজি নয়। মধুখালির হাটের তোলা-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব তাদের এলাকায় যথেষ্ট পড়েছে।

রহীম গিয়ে উঠল দুলালের বাড়ি। সে সন্ধ্যার পর গ্রামবাসীদের বৈঠক ডাকলে। পরদিন হাট, সকলেরই তাতে আগ্রহ। ভালো বৈঠক হ'ল। রহীম মধুখালির আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শোনালে, তার প্রস্তুতির কথা বললে, পরবর্তী হাটের জন্য বিপদের সম্ভাবনা চিন্তা করে সেখানকার কর্মীরা যে ব্যবস্থা করেছে তাও জানিয়ে দিলে।

সে বললে, মালিকের লোক এসে তোলা তুলতে চাইলে আপনারা বাধা দিতে পারবেন ? সেজন্যে সকলে একজোট হয়ে কাজ করতে পারবেন ?

পারব, পারব, আওয়াজ উঠল !

মালিকের লোক জোর করলে আপনারা হাট থেকে উঠে আসতে পারবেন ? অন্য কোন জায়গায় নিজেদের হাট বসাতে পারবেন ? সে আবার প্রশ্ন করলে।

জবাব এল , খুব পারব।

দুলাল বললে, পারা যাবে কমরেড। হাটখোলার কাছেই একটা সুবিধে মতন জায়গা পড়ে আছে, তার মালিক আমাদেরই একজন চাষী। আমরা সেটা ঠিক করিছি। মালিকও তা শুনেছে।

তখন রহীম বললে, মালিক তো গাঁয়েরই লোক শুনেছি। কাল সকালে যদি তার সঙ্গে কথা বলা যায় তো কেমন হয়? মালিক যদি আমাদের দাবি মেনে নেয় তাহলে সহজেই সব চুকে যেতে পারে।

প্রস্তাবটায় সকলের সম্মতি দেখা গেল। তখন তারা ঠিক করলে দুলাল ও গণেশকে এবং একজন মাতব্বর গোছের কৃষককে নিয়ে রহীম গিয়ে কথা বলবে মালিকের সঙ্গে।

দুলালের অনুরোধে সে তখন কৃষক সমিতি ও তার সংগঠন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে।

হাটের মালিকের সঙ্গে যে আলাপ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে সংবাদ মালিক রাত্রেই পেলে। হাটতোলা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রামের লোকের মনোভাব কী আগেই শুনেছিল। সে বুঝে নিয়েছিল এই স্রোতে বাধা দেবার ক্ষমতা তার নাই, বাধা দিতে গেলে গ্রামে এবং গ্রামের বাইরে কেবল শত্রু সৃষ্টিই করা হবে। অবশ্য তার জমির আয়ের তুলনায় হাটের আয় ছিল নগণ্য, কাজেই তার জন্য গণ্ডগোলের মধ্যে যাওয়া ভুল হবে, এই ছিল তার ধারণা। আয়ের পরিমাণ বেশি হলে ধারণাটা হয়তো অন্য রকম হ'ত।

মালিকের নাম যতীন। তার এ ধারণার কথা তাদের জানা ছিল না। রহীম ও অন্য তিন জন যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল, সে তাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করলে। দুলাল তাকে বললে কী উদ্দেশ্যে গেছে তারা। সে মাতব্বরী কায়দায় বললে, এই তো চাই। আপসে কথা বলে একটা ফয়সলা করাই তো ভালো। তারপর রহীমের পরিচয় জানতে চাইলে।

রহীম নিজেই সংক্ষেপে তার পরিচয় দিলে। দুলাল তার সঙ্গে যোগ করলে, ইনি কৃষক সমিতির নেতা। কলকাতা থেকে এসেছেন। খুব শিক্ষিত লোক। শেষ কথাটা বললে এ সম্বন্ধে

কিছু না জেনেই, কেবল যতীনকে প্রভাবিত করার জন্য। রহীম একটু অস্বস্তি বোধ করলেও সেটা তাকে হজম করে নিতে হ'ল।

যতীন নিজে কলকাতায় থেকে কয়েক বছর ইস্কুলে পড়েছিল এবং ম্যাট্রিক পাস করেছিল, কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। কিন্তু তার বাবা মারা যাওয়ায় পড়া ছেড়ে কয়েক বছর হ'ল গ্রামে এসে বাস করছে। তার মতো অতটা শিক্ষা এ অঞ্চলে বেশি লোকের নাই। সেজন্য তার মনে একটু অভিমানও যে ছিল না তা নয়।

যতীন চাকরকে ডেকে চা আনতে বললে। আলাপের ফল কী দাঁড়াবে অনুমান করতে না পেরে তার আগে চা খাবার কথা ভাবতে রহীম একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু যতীন নিজে অবস্থাটা সহজ করে দিলে। রহীমকে উদ্দেশ করে বললে, এরা আমার গাঁয়ের লোক, এদের কথা ভাবছিনে, তবে আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়ে নিয়ে এসেছে এরা। আপনি অবশ্য দয়া করে এসেছেন আমার বাড়ি, সে আমার ভাগ্য। মধুখালিতে ইজারাদারের সঙ্গে আপনারা যে মীমাংসা করেছেন তার খবর শুনেই আমি ঠিক করেছিলাম ঐ নিয়ম এখানেও চালাতে হবে। সব হাটেই চালানো দরকার। তবে আপনারা আসাতে আমার কাজটা কমে গেল। আপনারাই লোককে জানিয়ে দেবেন এই আমার মত।

তার কথা শুনে অন্যেরা মনে মনে তৃপ্তি বোধ করলে, তার প্রতি কৃতজ্ঞের ভাব পোষণ করলে। কিন্তু রহীম ভাবলে লোকটার বয়স বেশি না হলেও অত্যন্ত চতুর, ঘোষণাটা নিজে না করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কথা বলবার জন্য তার পথ খোলা থাকে, অথচ এখন সুযোগ বুঝে নিজের মহানুভবতার কথাও প্রচার করতে পারে। তার আরো মনে হ'ল যে যতীন যদি নিজে গিয়ে তার হাটে কৃষকদের সিদ্ধান্তকে নিজের বলেও ঘোষণা করে দেয় তা হলে অন্যান্য হাটে কৃষকদের দাবির পক্ষে যুক্তি আরো জোরালো হবে।

তাই রহীম বললে, মধুখালির সিদ্ধান্তকে যখন আপনি নিজেই মেনে নিয়েছেন আর সেই সিদ্ধান্তকে সমস্ত হাটে চালু করাই যখন আপনার মত, তখন হাটে গিয়ে জনসাধারণের সামনে আপনার সেই মতকে আপনি নিজে ঘোষণা করলে তাতে আপনারও উদারতার বেশি পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি যদি অন্যের মুখ দিয়ে নিজের মত জানিয়ে দিতে চান, তাতে লোকে বুঝবে আপনি চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে সাধারণের দাবি মেনে নিয়েছেন।

রহীম তার মনের দুর্বল জায়গাটি তাক করে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ফল ফলে গেল। যতীন রহীমের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝলে না, তার আঘাতের সামনে সানন্দে নতি স্বীকার করে ফেললে। বললে, সে কথা অবশ্য আপনি ঠিকই বলেছেন, অভিজ্ঞ মানুষ, তার ওপর পণ্ডিত ব্যক্তি। আচ্ছা, আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। আমি আজ যাব হাটে, সময় মতোই যাব, তখন আপনাদের সিদ্ধান্তই আমি ঘোষণা করে দোব। আপনারাও সেখানে থাকলে ভালো হয়। আচ্ছা দেখুন, আপনাদের ঐ মীমাংসার শর্তগুলো লেখা আছে কি? আমাকে একখানা দিতে পারেন দয়া করে?

রহীমের পকেটে ছিল কয়েকখানা কপি, একখানা দিলে তাকে। সে পড়ে দেখে বললে, এতো ঠিকই আছে। এটা পড়ে দিলেই তো চলবে। আর বলে দোব আজ থেকে আমার হাটে এই সব নিয়ম চলবে। তা হলেই তো হবে, কী বলেন?

হ্যাঁ, তা হলেই হবে, রহীম জবাব দিলে।

চা এসে গিয়েছিল, কিছু মিষ্টিও ছিল। খাবার পর রহীম চায়ের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উঠল, তাহলে হাটে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে।

যতীন কথা রেখেছিল। রহীম তার ঘোষণার জন্যও সেখানে তাকে ধন্যবাদ জানালে।

এর ফলটা খুব শুভ হ'ল। মধুখালির সিদ্ধান্ত বলে যতীন তার

ঘোষণায় উল্লেখ করেছিল। মুখে মুখে এ কথাও লোকে জেনেছিল যে সমিতির কর্মীরা সকালে তার সঙ্গে কথা বলে এসেছে। তাতে সকলে বুঝে নিলে যতীন কৃষকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এবং এর পর মোহনগঞ্জের হাটে বিশেষ কিছু করবার প্রয়োজন হ'ল না, মালিক কৃষকদের দাবির ঘোরতর বিরোধী হলেও সে দাবি আপনা থেকেই চালু হয়ে গেল, কেউ তার বিরোধিতা করতে সাহস পেলে না। রহীম পরে সংবাদ পেলে এই এলাকার অন্যান্য হাটেও দাবিগুলো চলে গেছে, কেউ রুখতে পারেনি।

তবে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল রহীমকে। সেখানে হাট থেকে কাসেমের বাড়ি যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখান থেকে আমতলী দীর্ঘ পথ। একবার ভাবলে পরদিন ভোরে মধুখালি থেকে লঞ্চ ধরে কলকাতা যেতে পারে কি না। কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না। তখন দুঃখের সহিত সে চিন্তা বাতিল করে দিলে।

হাটে কাসেম তাদের গ্রামের একটি লোকের কাছে খবর পেলে মঙ্গলবারে মধুখালির হাটে কোন গোলযোগ হয়নি। লোকটি সেখানে তার কুটুম্বের বাড়ি গিয়েছিল এবং নিজে মঙ্গলবারের হাটে হাজিরও ছিল। রহীম এই সুসংবাদটা পেয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করলে।

মোহনগঞ্জে এসে সে একটু নূতনের সন্ধান পেলে। কাসেমের বাড়ি ছিল সে। কাসেম এবং অর্জুন দুজনেই ইস্কুল মাষ্টার, তাদের গ্রামের প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষক। তারা কৃষক, নিজেদের কিছু কিছু জমি আছে, চাষও করে। তাদের উপর খানিকটা রাজনীতির প্রভাব আছে। আলাপের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পরিচয় পেলে সে। দেখলে তাদের রাজনীতি তার রাজনীতি থেকে মূলত তফাত নয়; তবে অস্পষ্ট ও ভাসাভাসা। তার মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা ও চিন্তার প্রভাবও আছে, তাকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

ক্রমশ সে আরো জানতে পারলে তারা দুজনে নিজেদের মত

কিছু কিছু প্রচারও করেছে পাশাপাশি তিনখানা গ্রামে অন্তত জন দশেক লোককে তাদের দিকে টানতে পেরেছে।

কাসেম যখন প্রস্তাব করলে তাদের সকলের সঙ্গে রহীমকে আলাপ করতে হবে, সে আপত্তি করতে পারলে না। কিন্তু প্রথম আলাপের মধ্যে দিয়ে সে নিজেই স্থির করে ফেললে তাকে অন্তত তিন চার দিন এখানে থেকে এদের নিয়ে বসতে হবে, আলাপ আলোচনা করতে হবে।

তার প্রয়োজন ছিল তাদের সঙ্গে রীতিমতো রাজনীতিক আলোচনা করার ; কাসেম ও অর্জুন তাদের ইতিমধ্যেই খানিকটা এগিয়ে রেখেছে, যদিও ভুল শিক্ষাও কিছু দিয়েছে তাদের। তাই তাদের দুজনের সঙ্গেও বিশেষ করে আলোচনা করা দরকার। এই আলোচনায় তার প্রধান বক্তব্য হ'ল : কৃষকদের দাবির ভিত্তিতে ছোটখাটো এক চক্র সংগ্রাম হয়েছে হাটতোলা নিয়ে। আরো অসংখ্য দাবি তাদের আছে লাটদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে। মজুর-মাহিন্দারদের মজুরী বৃদ্ধির দাবিও একটা জরুরী আশু দাবি। এই ছোট ছোট দাবি থেকে জমিদারী-লাট-দারী উচ্ছেদের এবং কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টনের প্রশ্ন উঠবে। সংগ্রামের যন্ত্র হিসাবে সর্বত্র ব্যাপকভাবে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হবে।

তার আরো বক্তব্য হ'ল : শুধু কৃষক আন্দোলন এবং সমিতি যথেষ্ট নয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা দেশে থাকাতে জমিদারী-মহাজনী শোষণ ও ট্যাক্সের পীড়ন থেকে মুক্ত করে কৃষক-দের জমি দেবার এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করবার সুযোগ নেই। তাই এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকেও খতম করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষক সমাজকে নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরও যাতে দেশের শাসন ক্ষমতা জমিদার-পুঁজিদার শোষকশ্রেণীদের হাতে না যেতে পারে সেজন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত খেটেখাওয়া মানুষকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা

আন্দোলনকে পুষ্ট করতে হবে। কৃষক শ্রেণী দেশের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাধিক শ্রেণী বলে এই আন্দোলনে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের এ কথা বোঝাতে হবে।

এই বক্তব্য সে কেবল মোহনগঞ্জেই ব্যাখ্যা করলে না। সেখানে দুলালকে ডাকিয়ে নিয়ে তাদের এলাকাতেও এমনি আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করতে বললে। সে জন্য সোনাপুরেও তাকে থাকতে হ'ল কয়েকদিন। রহীম ভাবলে, কলকাতা যখন যাওয়াই হ'ল না তখন এদিকে আলোচনার প্রাথমিক কাজ সেরে সংগঠনের বুনিয়াদটা এখনি তৈরী করে নেওয়া দরকার, নইলে এর পরে ঘটা করে আবার আসতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে।

আলোচনার মধ্যে দিয়ে যারা শিক্ষা পেলে তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে যোগ দেবার আগ্রহ দেখা গেল। আন্দোলন কী ও কেন তা মোটামুটি বুঝে নেবার পর তাদের মধ্যে নতুন চেতনা জাগল। আপাতত তাদের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বৈঠকী প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল, মজুরী বৃদ্ধির প্রয়োজন কতটা এবং সে জন্য কী ধরনের আন্দোলন করা চলে তা আলোচনা করতে বলা হ'ল।

রহীম আমতলী ফিরে এল দিন পনের পরে। রোস্তমরা তার আগেই কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। এসে শুনলে তাদের সঙ্গে লোকমানও এসেছিল নতুন বৌ নিয়ে কিন্তু তার কাজ কামাই হবে বলে একদিন মাত্র থেকে সোমবার কলকাতা চলে গেছে—রহীম ফিরে আসার আগের দিন। তাদের সঙ্গে এখানেও দেখা হ'ল না বলে সে খুবই দুঃখিত হ'ল।

দুপুরে খাবার জন্য রহীম যখন বাড়ির মধ্যে গেল, রোস্তমের মা বললেন, তুমি যেতে পারনি বাবা, তার জন্যে নূরজাহানের মায়ের কী আফসোস। তোমার চিঠিখানা পড়ে দেখে কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল।

রোজই বলত আমায়, ছেলেটা এল না বুবু, মনটা আমার খারাপ হয়ে রয়েছে। বড্ড ভালোবাসে কি না তোমায়। দেখিছি তো, তার চোখে লোকমানও যা তুমিও তাই। তা কথাও ঠিক বাবা। হাতেমও তাই বলছেল, দুঃখু করছেল তুমি যেতে পারনি বলে। আমি বুঝিয়ে বলিছি বাবা, তোমার যাবার খুব ইচ্ছে ছেল, কাজের খাতিরে যেতে পারনি।

রোস্তম বললে, মামীমা আপনার জন্যে চা-চিনি আর খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। শুকনো হালুয়া করে দিয়েছে, নষ্ট হয়নি, আছে আপনার জন্যে।

এ সব কথা শুনে রহীমের মন বিচলিত হয়ে উঠল। মরিয়মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল তার। সে কোন কথা বলতে পারলে না তখন।

পরে রোস্তমের নিকট শুনলে সমস্ত কাহিনী। সে যাবে না শুনে লোকমান প্রথমে রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজ তো আমি জানি, ইচ্ছে করলে আর আসতে পারত না? আমি তা বিশ্বাস করি না। রোস্তম যখন তাকে বার বার রহীমের কাজের চাপের কথা বোঝাতে চেষ্টা করে তখন আবার লোকমান বলে, হ্যাঁ, এখন আবাদে যেয়ে লীডার হয়েছে কি না। বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা। এমন লীডার আমি গেলেও হতে পারতাম। সবাই পারত।

লোকমান যখন আমতলী এসেও রহীমের দেখা পেলে না তখন মন্তব্য করে, রহীম ইচ্ছে করেই দেখা করলে না আমার সঙ্গে। আমাকে এড়াবার জন্যে অন্য জায়গায় আছে।

রোস্তম হেসে বললে, তাই কখনো হয় ভাই! ও তোমার রাগের কথা। তিনি জানবেন কী করে যে তোমরা আসবে এখন?

লোকমান জবাব দেয়, কেন জানবে না? বিয়ের পর আমি আমার বাড়ি আসব তাও সে জানবে না? তবু কোন্ হিসেবে বাইরে থাকে এখন?

রোস্তমের বিবরণ শুনে রহীম খুব হাসলে। বললে, লোকমান

তাহলে খুব চটেছে আমার ওপর, তা চটবার কথা। আমার কিন্তু সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে যে বিয়েতেও থাকতে পারলাম না, এখানে তারা এলেও দেখা হ'ল না। কলকাতা গিয়েই দেখা করব, আর কী করা যায়!

সংগঠনী কমিটিতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রহীম বিস্তৃত আলোচনা করলে। পরে কয়েকদিন ধরে দুটো বড় বৈঠকী সভায় বিভিন্ন গ্রামের লড়াকে কর্মীদের তালিমের ব্যবস্থা করা হ'ল। ইতিমধ্যে জন-মাহিন্দারদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন করার প্রশ্নও এসে গেল। তার দায়িত্বও নিতে হবে।

শহরের শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন রহীম করেছে। তার সে অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। কিন্তু গ্রামের এই সমস্ত খেতমজুর—এরা মজুর হলেও শহরের শ্রমিকদের মতো নয়। আসলে কি এরা জমিহীন নিঃস্ব কৃষক নয়? জমি পেলে কি এরা আর মজুর থাকতে চায়? যারা এদের শোষণ করে তারা কি কারখানার মালিকদেব মতো একই শোষক শ্রেণীর লোক? তারা কি কেবল জমির মালিক হিসেবেই মজুরদের শোষণ করে না?

এ সব প্রশ্ন জাগল তার মনে কিন্তু তাই নিয়ে এখানে সে আলোচনা বিশেষ করলে না। আপাতত তার প্রয়োজন দেখলে না। সে জানে সে প্রয়োজন হবে অন্যত্র। তার মনে কেবল ভাসতে লাগল বসন্ত, সীতা এবং তাদের মতো আরো অনেকে যারা পরের জমিতে খাটে শুধু মজুরীর জন্য।

লোকমানের ছাপাখানা ভালো চলছে। নিজ হাতে কাজ করা সে অনেক পূর্বেই ছেড়েছে, সেজন্য শ্রমিক নিযুক্ত করেছে এবং নিজে আফিসের কাজেই ব্যস্ত থাকে। আফিসের সমস্ত কাজও সে একা আর করে উঠতে পারে না। তার উপর বিল আদায় করা ও প্রেসের কাজ সংগ্রহ করার জন্যও সময় দিতে হয়। সেজন্য একজন সহকারী রেখেছে। তাকে দিয়ে আফিসের কেরাণীর কাজটা যতখানি পারে করিয়ে নেয়। কিছু তদারকী কাজও করে সে।

বড় মেশিনটা একেবারে বেকার বসে থাকে না, তার জন্যও কিছু কিছু কাজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একজন মেশিনম্যান দিয়ে দুটো মেশিনের কাজ করানো যায় না, অথচ বড় মেশিনে পুরো একজন মেশিনম্যানকে নিযুক্ত রাখবার মতো যথেষ্ট কাজ এখনো আসে না। সেই কারণে তার মেশিনম্যানকে ওভারটাইম কাজ করতে হচ্ছে এবং একজন পার্ট-টাইম লোক রাখবে বলে সে ঠিক করেছে।

রহীম কলকাতায় এসে সকালে তার কমরেডদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর বিকালে লোকমানের সঙ্গে দেখা করতে গেল তার প্রেসে। উচ্ছ্বাসের সহিত তাকে জড়িয়ে ধরে মাফ চাইলে সে তার বিয়েতে আসতে পারেনি বলে। লোকমান কোন রকম উচ্ছ্বাস বা আবেগ প্রকাশ না করে কেবল বললে, সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে এস, কথা হবে, এখন খুব ব্যস্ত রয়েছি।

ব্যস্ত থাকবে সে রহীমও জানত। কথাবার্তা তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়েই হবে তাও জানত। কিন্তু বাড়িতে যাওয়া মানে কেবল তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া নয়, তাই প্রথমে সে তারই সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছিল তার প্রেসে। এখন সে যেভাবে

অভ্যর্থনা করলে তাকে, তাতে তার কাজের চাপের কথা বিবেচনা করেও রহীম খুব প্রীত হতে পারলে না। নিমেষের জন্য রোস্তমের কথাগুলো তার মনের উপর দিয়ে খেলে গেল।

তাহলেও মুখের হাসি বজায় রেখেই রহীম বললে, আমি এখনি যাচ্ছি সেখানে, যতটা শীঘ্রি পার এস।

কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিল সে এখনো দু মাস হয়নি। তবু পথে যেতে যেতে মনে হতে লাগল এই শহর যেন তার চোখে নতুন, আগে যেন এর কত জিনিস সে দেখেনি। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে লোকমানের সঙ্গে মোলাকাতের দৃশ্যটা তাকে পীড়ন করতে লাগল ; বেয়াড়া দৃশ্যটাকে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেও সে সফল হ'ল না।

সব ভুলে গেল সে হাতেমের বাড়ি এসে। তখনো দিনের আলো আছে। দেখলে এ বাড়ি যেমন দেখে গিয়েছিল সে তেমনিই আছে, কেবল বিয়ে উপলক্ষে ঘষা মাজার ফলে ঝকঝক হয়েছে বেশি। বাড়ির চারদিকটাও আগের চেয়ে সাফ হয়েছে।

বিয়ের পরেও যদি কোন মহিলা মেহমান রয়ে গিয়ে থাকে তাই ভেবে সে প্রথমে বাইরে থেকে আওয়াজ দিলে। তার অচেনা একটা ছোকরা চাকর বেরিয়ে এলে সে বললে ভেতরে যাব।

ছোকরাটা ভিতরে গিয়ে খবর দেবার পর নূরজাহান বসার ঘরের দুয়ারের পর্দা সরিয়ে তাকে দেখে আবেগের সহিত বলে উঠল, ওমা, রহীম ভাই! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ভেতরে আসুন। কখন এলেন ভাই? কেমন আছেন? কতদিন পরে এলেন বলুন তো! হ্যাঁ, আপনার চিঠি পেয়েছিলাম ভাই। ভারি মিষ্টি করে লিখেছিলেন, পড়ে এত ভালো লাগল! কিন্তু দুঃখও হলো আপনি আসতে পারলেন না বলে।

তার সঙ্গে ভিতরে ঢোকার সময় রহীম তাকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললে হ্যাঁ, এর আগে কিছুতেই আসতে পারলাম না। তা কেমন আছ বল নূরজাহানবুবু?

মরিয়ম ঘরের মধ্যে কী কাজ করছিল। নূরজাহান ঘোষণা করলে, মা, রহীমভাই এসেছেন।

সে ততক্ষণে বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসেছে। মরিয়ম বাইরে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কেমন আছেন মামীমা? সে লক্ষ্য করল মরিয়মের চোখ ছলছল করছে কিন্তু মুখে হাসি। বোস, বলে নিজেও বসল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, কতদিন পরে তুমি এলে বলতো বাবা! কোন খবরই নেই তোমার, শেষে রোস্তমরা এলে তার কাছে, বুবুর কাছে শুনলাম তোমার কথা। তোমার গায়ের রং কালো হয়ে গেছে।

রহীম হেসে বললে, ফর্সা তো ছিল না কখনো।

তাহলেও খেয়াল করে দেখো আগের চেয়ে ময়লা হয়েছে।

আপনারা সকলে আছেন ভালো তো? মামু ভালো আছেন? জাহানআরাকে দেখছি না, রান্নাঘরে বোধ হয়? বললে রহীম।

সে রান্নাঘরেই ছিল। নূরজাহানও ঢুকেছে সেখানে। মরিয়ম বললে, আমরা তো ভালোই আছি বাবা, ওর-ই শরীর ভালো যাচ্ছে না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে।

অসুখ-টসুখ করেছে নাকি? ডাক্তার দেখেছে? কী বলছে? প্রশ্ন করলে রহীম।

ডাক্তার দেখেছে কিন্তু রোগের কথা তো কিছুই বলে না। কোন রকম অসুখ তো বোঝা যায় না। খাওয়া আগের চেয়ে কমেছে ওর, আর কথাও কম বলে, চুপচাপ থাকে বেশি।

রহীম বিয়ের কথা তুলে বললে, আমার ওপর রাগ করেননি তো মামীমা? আমার তখন যা অবস্থা, কিছুতেই আসতে পারলাম না আমি।

মরিয়ম হেসে বললে, তোমার উপর রাগ করেই বা কী হবে! তুমি কি কারো রাগের ধার ধারো?

মুখ গম্ভীর করে আবার বললে, তবে সত্যি বাবা, রাগ তো আমার হবার কথা। কিন্তু রাগ করতে পারিনি খালি তোমায় চিনি বলে। আমি জানি তুমি যে কাজ নিয়েছিলে তার ওপর আমার দাবি খাটে না। তাই রাগ না করলেও বড় কষ্ট পেয়েছি কদিন। মেয়ের বিয়ে, আত্মীয়দের নিয়ে খুশী করেছি, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে তোমার কথা ভেবে বড্ড কষ্ট হয়েছে মনে। সে হয়তো তুমি বুঝবে না রহীম।

আপনার মনের এ খবরটুকু তো আমার অজানা নয় মামীমা, রহীম কিঞ্চিৎ আবেগের সহিত বললে। সে কথা আমি ভুলতেও পারি না, সে যেখানেই থাকি আর যে কাজই করি। সে যে আমার জীবনের একটা বড় পুঁজি। সে দিন রোস্তমদের বাড়ি দুপুরে খেতে বসে খালামার কাছে যখন শুনলাম আপনার কথা, বিশ্বাস করুন মামীমা, আমি শুধু ঘাড় গুঁজে খেতে লাগলাম, একটা কথা বলতে পারলাম না। আমার ওপর আপনার দাবি যে কত বড় সে আমিই জানি। সে দাবিকে অস্বীকার করতে পারি এমন ক্ষমতাই আমার নেই মামীমা, আর অস্বীকার করার ইচ্ছার তো প্রশ্নই উঠে না। এত বড় সম্পদ কি কেউ কখনো অস্বীকার করতে চায়!

দুজনে নীরবে বসে আছে, যেন কথা বললেই তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। নূরজাহান দু হাতে দু প্লেট খাবার এনে রহীমের সামনে টেবিলের উপর রেখে বললে, খান ভাই। চা আনছি এখুনি। তারপরই হেসে উঠে বললে, চা এনেই বা কা হবে! আপনি তো চা হারাম করে দিয়েছেন।

তার মা ও রহীমও হেসে উঠল। রহীম বললে, কথাটা ঠিকই বলেছ। চা আমি প্রায় হারাম করেই ফেলেছিলাম। কিন্তু মামীমা কি তা করতে দিয়েছেন? এত চা-চিনি পাঠিয়ে দিলেন। তখন তওবা করে আবার খাওয়া আরম্ভ করলাম।

সত্যি ভাই, ওখানে একদম চা পাওয়া যায়না, না? মায়ের চা যাবার আগে তাহলে একদিনও খেতে পাননি? বললে নূরজাহান।

আমি যাবার সময় কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ফুরিয়ে যাবার পর কেবল একবার এক জায়গায় পেয়েছিলাম চা। ধনী লোকের বাড়ি, প্রচুর জমির মালিক। কলকাতায় বাস করেছিল অনেকদিন। কিছু লেখাপড়া জানে। বাড়িতে সে চা খায় মনে হলো, বললে রহীম।

সে কী রহীম, তুমি তো গরিব 'চাষাভূষোর' বাড়িই থাক শুনেছি। তবে বড় লোকের বাড়ি চা খেলে কেমন করে? মরিয়ম হেসে প্রশ্ন করলে।

রহীম হালকাভাবে জবাব দিলে, বরাতেই করে মামীমা। তার রহস্য বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয়।

নূরজাহান গিয়ে চা নিয়ে এল। এতক্ষণে রহীমের খেয়াল হ'ল খাবার তাকে অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে। তাকে বললে, এত নাশতা তুমি আনলে কেন বলতো? গোগ্রাসে খেয়েও এই মোটে একটা প্লেট শেষ করলাম, আর একটা বাকি। ওটা বরং নিয়ে যাও।

তা হবে না ভাই, সবটাই খেতে হবে আপনাকে।

আমার এত দিনের পাওনার জন্যে ক্ষতিপূরণ বুঝি?

ক্ষতিপূরণ করতে হলে এত অল্পতে হ'ত না, বলে সে চলে গেল রান্নাঘরে।

মরিয়ম বললে, ছোটটার এ রকম শরীর দেখে ওকে রান্নার কাজে যেতে মানা করি, তা শোনে না। কাজে আটকে আছে বলে বোধ হয় আসতে পারবে না তোমার সাথে দেখা করতে। যাই, পাঠিয়ে দিইগে।

সে চলে যাবার একটু পরে জাহানআরা ধীরে ধীরে এসে বসল। তারপর উদাসীনভাবে আস্তে আস্তে বললে, এতকাল পরে বুঝি সময় হ'ল আপনার আসবার?

রহীম তার প্রায়-ভাবলেশহীন মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, কী করি বল, কাজের এমন চাপ। কিন্তু তুমি রোগা হয়ে গেলে কেন? মুখখানা বড় শুকিয়ে গেছে। তোমার চেহারা দেখে দুঃখ হচ্ছে জাহানআরা।

আমি রোগা হয়ে গেছি আপনি জানলেন কেমন করে? মায়ের কাছে শুনেছেন বুঝি?

তার মানে? আমি দেখতে পাচ্ছি না? চোখ নেই আমার? মামীমা বললেন ডাক্তার বলেছে অসুখ-বিসুখ কিছু নেই। তবু এমন হ'ল কেন, চিন্তার বিষয়।

হ্যাঁ, আব্বার কাছে, মায়ের কাছে চিন্তার বিষয় হয়েছে। আপনার কাছে চিন্তার বিষয় হবে কেন? জাহানআরা সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে। রহীমের কানে কথাটা অসংগত শোনাল, প্রায় অর্থহীন বোধ হ'ল। তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে বললে, চিন্তার বিষয় সকলেরই কাছে। কিন্তু তোমার এ হেঁয়ালির অর্থ কী বুঝতে পারছি না। রহীম পূর্বে তার ছেলেমানুষী কথা অনেক শুনেছে, ভাবলে এও বুঝি তেমনি একটা কিছু হবে।

একটু শুকনো হেসে জাহানআরা বললে, বুঝতে পারছেন না? চেষ্টা করুন, পারবেন।

কিন্তু জাহানআরা, আগে তো কখনো তোমাকে এভাবে কথা বলতে শুনিনি।

চিরকাল তো কারো সমান যায় না। আপনিও তো আগে আবাদে কাজ করতে যেতেন না। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষেরও পরিবর্তন হয়, এ তো আপনার রাজনীতিরই কথা।

রহীম হেসে ফেললে। আবার তার মনে হ'ল এ বুঝি সেই তর্কপ্রিয় ছেলেমানুষ জাহানআরা। কিন্তু এ তো ছেলেমানুষের মতো কথা নয়, এর মধ্যে গাম্ভীর্য রয়েছে। বললে, সত্যি জাহান-আরা, তোমার কথা হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না। একটু সোজা কথায় বলবে কী বলতে চাও?

সোজা কথাই বলেছি আমি। আপনি কোন কথাটা যে বুঝতে পারছেন না, সেটা বোঝাই বরং আমার পক্ষে মুশকিল।

সে এতক্ষণ ধরে একইভাবে এই সমস্ত কথা বলে যাচ্ছে দেখে রহীম চিন্তিত হ'ল। ভাবলে, তার এই ভাবান্তর কোন মানসিক ব্যাধির লক্ষণ নয় তো? হয়তো সেই কারণেই ডাক্তার রোগ ধরতে পারেনি। সে ভয় পেয়ে গেল। বললে, আমার একটা কথা রাখবে? তুমি আবার আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে থাক, দেখবে তোমার শরীর সেরে উঠবে।

জাহানআরা শুধু শুকনো হাসি হেসে চুপ করে থাকল।

নূরজাহান এসে বললে, ভাই, রাত্রে খাবেন এখানে।

না, আজ খাব না, বললে রহীম। তাতে আমার লোকসান। এই এতগুলো গিলিয়েছ এখুনি, আবার একটু পরে খাব কোন পেটে?

মরিয়ম শুনে বললে তাকে, আচ্ছা, খাও না খাও পরে দেখা যাবে। তুমি রয়েছ তো এখন? লোকমানের সাথে দেখা করবে তো!

হ্যাঁ মামীমা, সেজন্যেই বসে আছি। মামুর সঙ্গেও দেখা করব। লোকমানের কাছে গিয়েছিলাম একবার। তবে সে তখন কাজে ব্যস্ত, কথা বিশেষ হয়নি। এখানেই আলাপ করব, বললে রহীম।

জাহানআরা উঠে তার ঘরে চলে গেল।

রহীম একাই বসে ছিল। অল্পক্ষণ পরে হাতেম এল। রহীম তার শারীরিক কুশল জিজ্ঞেস করলে। হাতেম তাকে দেখে খুশী হয়ে বললে, কী গো বাবু, কবে এলে? ভাল আছ তো? তুমি বিয়ের সময় আসতে পারলে না বাবা, আমাদের বড় দুঃখ হ'ল। তোমার কথা আমরা শুনেছি রোস্তমদের কাছে। হাট তোলা বন্ধ ক'রে একটা ভালো কাজ করেছ বাবা। চাষীবাসী মানুষের ওপর বড্ড জলুম চলছিল।

সে কাপড় ছেড়ে এসে বসল। বললে, তা তোমার শরীর ভালো ছিল তো? খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হ'ত বোধ হয়?

জি না, খাওয়ার কষ্ট হয়নি, উত্তর দিলে রহীম। মাছটা পাওয়া যেত, মাঝে মাঝে দুধও পেতাম কিছু। তবে রান্নাটা সব জায়গায় এক রকম হ'ত না।

হাতেম। সে পাঁচ জায়গায় খেতে হলেই হবে। তা এখন আছ তো এখানে? না, আবার চলে যাবে?

রহীম। আবার যেতে হবে। তবে দিন কতক আছি এখন। আপনার কারবারের অবস্থা কেমন এখন?

হাতেম। কারবার চলে যাচ্ছে যেমন আগে চলছিল। এখন আবার একটু জমি কেনাবেচার কাজে হাত দিয়েছি, জমির দর চড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

রহীম। একাজে লোকসানের ভয় নেই নিশ্চয়?

হাতেম। না, লোকসান হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। এখন যুদ্ধের বাজার তো। তবে বাপু, আমার সামান্য কারবার। মাড়োয়ারীরা করে মোটা টাকা হাতে নিয়ে। তাদের মোকাবেলা করা কি আমার মতো চুনো-পুঁটির কাজ? তবুও কিছু কিছু কারবার করছি যা পারি।

রহীম। শুধু জমিরই কাজ, না বাড়ি কেনাবেচাও করেন?

হাতেম। না বাবা, বাড়ির কারবার করি না। আমার নিজের জন্যেও বাড়ি কিনতে যেয়ে ফিরে এসেছি, পছন্দ হ'ল না। তাই দুটো বাড়ি তোয়ের করে ফেললাম।

রহীম। কোথায় করলেন বাড়ি? কেমন হয়েছে?

হাতেম। পার্ক সার্কাসে। দু জায়গায় হয়েছে তবে ঠিক একই ধরনের। ছোট বাড়ি, তেতলা, তিনটে করে কামরা এক এক তলায়। সুবিধে সবই থাকবে—পানি, বাতি। তবে থাকবার জন্যে করিনি, ভাড়া দোব। কারবারটায় লাভ আছে বাবা, তবে একলা তো সব কাজ করা যায় না, বিশ্বাসী লোক চাই। লোকমান তো আমার ব্যবসায় ঢুকলো না, এখন নিজে একটা ফেঁদেছে যাই হ'ক। তাকে আর এ কাজে পাওয়া যাবে না। তোমার কথা আমার মনে হয়েছিল,

কিন্তু তুমিও তো বোধ হয় এখন আর ওকাজ ফেলে আসতে পারবে না।

রহীম। জি না, আমি তো এখন খুব জড়িয়ে পড়েছি।

মরিয়ম এসে বসল। হাতেম বললে, রহীমকে আমার জমির ব্যবসার কথা বলছিলাম। ওকে এখন আর পাওয়া যাবে না কারবারে।

হ্যাঁ, ও এখন কী করে আসবে? তোমাকে বলা হয়নি রহীম, ছুটো বাড়ি করা হয়েছে পার্ক সার্কাসে, তুই মেয়ের নামে নাম দেয়া হয়েছে কটেজ বলে। দেখো যেয়ে এক সময়ে।

হাতেম। ওকে তাই বললাম। এই মোটে তোয়ের হ'ল, এখনো সব কাজ শেষ হয়নি। বাস করবার মতো হতে আরো সময় লাগবে।

মরিয়ম। লোকমানের সাথে তোমার দেখা হয়েছে তাহলে?

রহীম। দেখা হয়েছে, তবে কথা বিশেষ হয়নি তখন। শুনেছি সে খুব চটে আছে আমার ওপর। চটতে পারে সে, তাকে দোষ দিই না। কারণ যাই থাকুক, আসতে তো পারিনি আমি।

মরিয়ম। ও চটাচটি কিছু নয়, তবে হ্যাঁ, দুঃখ করেছিল লোকমান। আমরাও যেমন করেছি। দুঃখ করার তো কথাই বাবা।

হাতেম। দুঃখ আমাদের সবায়েরই হয়েছিল, সে কথা সত্যি।

লোকমান এসে পড়ল। বললে, বোস, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।

জাহানআরা তার আওয়াজ শুনে বেরিয়ে রান্নাঘরে গেল।

লোকমান বসে বললে, তোমার না-আসা সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। তুমি এখন থাকবে এখানে, না জলদি চলে যাবে আবার?

রহীম। যেতে হবে, তবে দিনকতক আছি।

লোকমান। একটানা বেশি দিন ধরে বোধ হয় থাকতে পারবে না কলকাতায়। এখন তো আবার বড় নেতা হয়ে পড়েছ, তোমাকে

পায় কে ! হাতেম ও মরিয়ম হেসে ফেললে। রহীমও হাসলে। বললে, অতএব এখন থেকে যথেষ্ট ইজ্জত দিয়ে কথা বলবে।

লোকমান। আবার নতুন করে সাহিত্য চর্চাও করছ দেখি। ছুটো লেখা কোন্ কোন্ কাগজে বেরিয়েছে না এর মধ্যে ? পড়িনি আমি, শুনেছি।

হাতেম। তোমার লেখার অভ্যাস আছে নাকি বাবা ?

রহীম। কখনো হয়তো একটু আধটু লিখি মামু। ও বলছে বেশি করে।

মরিয়ম। তোমার লেখা তো কখনো দেখাওনি আমায় ?

রহীম। এমন ভালো লেখা কিছু নয় যে আপনাকে দেখানো যাবে। তবে দেখতে চান দেখবেন, এনে দোব।

মরিয়ম। হ্যাঁ, দেখতে চাই বৈকি বাবা। তোমার লেখা দেখব না !

জাহানআরা তিন কাপ চা নিয়ে এল। মরিয়ম খাবে না। লোকমানকে বললে, খাবার কিছু আনব ভাই ?

না, একটু পরে ভাত খাব একবারে, জবাব দিলে লোকমান। তুমি খেয়ে যাবে তো রহীম ?

রহীম। না, এখুনি যাব আমি।

হাতেম। কেন বাবা, খেয়ে গেলেই তো পারতে।

রহীম। এই একটু আগে বিস্তর খেয়ে ফেলেছি, রাতে হয়তো আর খাওয়াই চলবে না কিছু।

মরিয়ম। কাল তাহলে খেয়ো। পরে বিকেলের দিকে গল্প শুনব তোমার।

রহীম। বেশ, আসব কাল।

সে চলে গেলে লোকমান বললে, আমার ইচ্ছে ছিল প্রেসের কাজে ওর কিছু সাহায্য নোব। কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

হাতেম। আগে তো অনেক সাহায্য করেছে তোকে।

লোকমান। এখনো করতে পারত। ওর অনেক লোকের সঙ্গে

জানাশোনা আছে, চেষ্টা করলে আরো কিছু কাজ যোগাড় করে দিতে পারত। কিন্তু ও তো থাকছে না এখানে। ছোকরাটার গুণ ছিল কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে আবাদে গিয়ে মাথামোটা হয়ে যাচ্ছে। নেতা হবার শখ হয়েছে।

মরিয়ম। না লোকমান, ও কথা ঠিক নয়। রহীম একেবারে মাটির মানুষ। আজও তো কত কথা হ'ল, নিজেকে বড় করে দেখাবার জন্যে একটি কথাও কখনো শুনিনি ওর মুখে। কাগজপত্রে যে ওর লেখা বেরোয় তাও এখন শুনছি তোমার কাছে, ও বলেনি। আর ব্যবহারের মধ্যে শরীফ যাকে বলে, খুবই ভদ্র।

লোকমান। তুমি জান না মামীমা। আমি রোস্তমের কাছে শুনেছি ওর মাথায় নেতাগিরির খেয়াল ঢুকেছে এখন। তাই বলছি মাথামোটা হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু দিন যাক, তখন দেখবে আমার কথা ঠিক কি না।

মরিয়ম। আমি মানতে পারছি না বাবা তোর কথা। আমি ওকে দেখছি তো কম দিন হ'ল না। কাল আবার শুনব ওর কথা, তখনও দেখব আবার।

হাতেম উঠে বললে, বড্ড গরম, গাহাত মুছে আসি! লোকমান, গোসল করবি তো করে আয়, তারপর খাওয়া যাবে।

হাতেমের বাড়ি থেকে পুরনো বাসায় ফেরবার সময় একটু ঘোর পথে রহীম চার নম্বর পুলের উপর রেলিং-এর পাশে দাঁড়াল। সন্ধ্যাটা গরম ছিল খুব কিন্তু খোলা জায়গায় এই উঁচু পুলটার উপর হাওয়া পাওয়া গেল। রহীম ভাবতে লাগল আজকের লোকমানের ব্যবহার। এর পূর্বে তো এমন ব্যবহার কখনো করেনি সে তার সঙ্গে। প্রেসে সে গিয়েছিল তার সঙ্গে আলাপ করতে নয়, দেখা করতে, অন্য সকলের আগে তারই সঙ্গে দেখা করবে বলে। কিন্তু তার মধ্যে পূর্বেকার হৃদ্যতার পরিচয় পেলে না কেন?

বাড়ি এসেই বা সে কী আলাপ করেছে? সামান্য দুচারটে কথা—সে না বললেও পারত। সে তো তার মা-ভাইদেরও খবর নেয়নি। একটা আন্দোলন যে তারই অঞ্চলে হয়ে গেল, তার কাহিনী শোনা চুলোয় যাক, একবার উল্লেখ পর্যন্ত করলে না সে, কেবল সে নেতা হয়েছে বলে শ্লেষ করলে মাত্র। কৃষকদের আন্দোলন বা তার সাফল্য কি তার পক্ষে আনন্দের বিষয় নয়? কিছু দিন পূর্বেও সে দুঃখ বোধ করেছিল যে সে নিজে তার এলাকায় গিয়ে কাজ করতে পারছে না। অথচ আজ সেই কাজের সুফল দেখে সে কি উৎসাহ বোধ করে না?

লোকমানের এই পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে রহীম মনে বড় আঘাত পেলে। রাগ বা দ্বেষ নয়, ক্ষোভ হ'ল তার মনে। সে-ই একদিন লোকমানকে আন্দোলনের পথে নামিয়েছিল, রাজনীতির মধ্যে টেনে এনেছিল, নিজেদের নীতির খাতিরে দুজনে একসঙ্গে চাকরি হারিয়েছিল। আজ আর সে আন্দোলনের পথে না থাকতে পারে, তা বলে জনগণের আন্দোলনের প্রতি দরদও কি তার থাকবে না?

রহীম ভাবলে হাতেমের কথা। তার ব্যবহার আজ খুবই ভালো

লেগেছিল। এ ব্যবহার শুধু স্বাভাবিক নয়, এর মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা আছে। অনেক পূর্বে এক সময়ে হাতেম তার মাছের ব্যবসার কথা রহীমের কাছে বলত। হতে পারে তাকে কারবারের মধ্যে টানবার ইচ্ছা ছিল তার। আজও তেমনি কারবারের কথা খোলখুলি বলেছে, তাকে নিজের কাজের মধ্যে নেবার ইচ্ছা যে ছিল তাও অসংকোচে প্রকাশ করেছে। কৃষকদের স্বার্থে তাদের আন্দোলনকেও অভিনন্দন জানিয়েছে। এ ধরনের আলাপ হাতেম করেনি তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় হ'ল। বরং মাঝখানে কেমন অস্বাভাবিক ব্যবহারই কিছুদিন করেছিল সে।

তাই হাতেমের এই পরিবর্তন তাকে যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি প্রায় বিস্মিতও করেছে। সে তার প্রতি একটু আকৃষ্ট বোধ করলে, পূর্বের মতো শ্রদ্ধা অনুভব করলে। মরিয়মও নূরজাহানকে সে পূর্বের মতোই স্নেহ-মমতায় ভরা দেখেছে। জাহানআরাকে সে নূরজাহানের মতো স্নেহ করে। তার পরিবর্তন তাকে ব্যথিত করেছে। ভয় হয়েছে তার পাছে তার কোন মানসিক রোগ দেখা দেয়। এই সন্দেহ বা ভয়কে সে তার মা-বাপের কাছে, অন্তত মায়ের কাছে প্রকাশ করবে কিনা ঠিক করতে পারছে না রহীম। যদি তা না হয়—নাই যেন হয়—তাহলে একটা ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকবে। আবার না বললে যদি রোগ বেড়ে যায়, সেও ঠিক নয়। আরো ভেবে দেখবে বলা উচিত কি না।

রাত্রে বাসায় শুয়ে ঠিক করলে রহীম পরদিন সকালে তার কী কী কাজ থাকবে। সমিতির রসিদ বই নিতে হবে অনেক। পতাকাও অনেকগুলি তৈরী করবার ব্যবস্থা করতে হবে। পার্টির উপর সরকারী হামলা সম্বন্ধে অবস্থাটা জানতে এবং আলোচনা করতে হবে। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের প্রধান সুপারিশগুলি জেনে নিয়ে সে সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক আলোচনাও করতে হবে। তাছাড়া খেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন করতে হলে নীতিটা কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

এই কাজগুলো সেরে নিয়ে তাকে ফিরতে হবে আবাদে। হয়তো আরো কিছু কাজ এর মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে, তাও সারতে হবে।

হাট আন্দোলনের সাফল্যের জন্য রহীম সমিতির জেলা ও প্রাদেশিক কেন্দ্রে এবং তার পার্টি নেতাদের নিকট যথেষ্ট অভিনন্দন পেলে। কাগজে খবর আগে বেরোয় নি; সে খবর বাইরের জগতে পৌঁচে দেবার লোক কোথায়! তার লিখিত রিপোর্ট আসবার পর তাই থেকে যেটুকু সংবাদ কাগজে দেওয়া হয়েছিল তা বেরিয়েছে। স্বভাবতই তাতে বিলম্ব হয়েছে অনেক।

তাহলেও আবাদের আন্দোলনের প্রতি এখন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। রহীমকে সাহায্য করবার জন্য অন্তত জেলা কেন্দ্র থেকে একজন কর্মীকে পাঠানো দরকার একথা স্বীকৃত হয়েছে, সেজন্য কাকে পাওয়া যায় তাই বিবেচনা করা হচ্ছে। সে বলেছে এখনি না হ'ক, বর্ষার পরে কিংবা অন্তত ধান কাটার আগে যেন একজনকে পাওয়া যায়।

তার লিখিত রিপোর্টের পর এবং মৌখিকভাবে আরো বিস্তৃত বিবরণ শোনার পর আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত হ'ল তাতে তার কাজের ধারা এবং তালিমের ব্যবস্থা ও প্রণালী অনুমোদন করা হ'ল। একথা সকলেই স্বীকার করলে যে কৃষক এলাকায় এবং বিশেষ করে আবাদ অঞ্চলে খেতমজুর ও কৃষকদের মধ্যে দিয়ে বেশি সংখ্যায় তালিম। কর্মী তোয়ের করতে না পারলে আন্দোলন গড়ে উঠতে, ব্যাপকতা লাভ করতে এবং স্থায়ী হতে পারে না। রহীম ভাবলে বিজয়ের অভিনন্দনের চেয়ে এই স্বীকৃতির মূল্য অনেক বেশি।

সে ঠিক করলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং নীতিগত নির্দেশ ইত্যাদি নিয়ে এক হপ্তার মধ্যে ফিরে যেতে পারবে। পরে আবার বর্ষার সময়টা কলকাতায় এসে কাটাবে।

এর মধ্যে একদিন সকালে লোকমান এল রহীমের বাসায়। রহীম তখন স্টোভে জল গরম করে চা তৈরী করছে। দোকান থেকে কিছু খাবার এনে রেখেছে। দিনটা রবিবার। লোকমানকে আসতে দেখে তার মনে হ'ল সেদিন পুলের উপর দাঁড়িয়ে মনে মনে সে লোকমানকে যেভাবে বিচার করেছে তাতে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। রবিবারে অবসর পেয়ে আজ নিশ্চয় সে আসছে আমাদের আন্দোলনের কাহিনী শুনতে। নিমেষের মধ্যে এই চিন্তা তার মনের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

রহীম তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলে। খুশী হয়ে বললে, বোস। ঠিক সময়ে এসেছ। আর একটু দেরী করলে চা খতম হয়ে যেত।

চা ও খাবার তার সামনে টেবিলের উপর রেখে বললে, তুমি শুরু কর, আমি নীচে থেকে আর একটু খাবার নিয়ে আসি।

আমি শুধু চা খাব, অন্য কিছু লাগবে না, এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি, বললে লোকমান।

রহীম বসল। খেতে খেতে বললে, তোমার যা কাজের চাপ, রবিবার ছাড়া অবসর পাও না বোধ হয়। তবে এইটাই ভালো। কারবার ভালো চললে মনও ভালো থাকবে।

কারবার ভালো চললে তো নিশ্চয়ই ভালো, সায় দিলে লোকমান। কিন্তু তাকে ভালোভাবে চালাবার ব্যবস্থাও দরকার। আমার মুশকিল সেখানে। তোমার কাছে এলাম সেই কথা বলতে। আমার কাজটা এখন যে অবস্থায় এসেছে তাতে তাকে এগিয়ে নেবার জন্যে তোমার সাহায্য খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মাস ছয়েকের জন্যে তোমাকে পেলে প্রেসটাকে লাভের কারবার করে তোলা যায়।

মানে আমাকে তাহলে অন্য সব কাজ ছেড়ে দিতে বলছ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে রহীম।

লোকমান। একেবারে ছাড়বে কেন? ছুটি নেবে ছ মাসের।

রহীম। ছুটি নোব! কী ধরনের কাজ আমাকে করতে হয় তুমি

জান না। এ কি সরকারী আফিসের কেরানীগিরি যে ইচ্ছামতো ছুটি নেয়া চলবে ?

লোকমান। আরে, ছুটি মানে কী ? যদি কাউকে পাও, সে তোমার বদলে গিয়ে কাজ করবে। না পাও, ছ মাস না হয় বন্ধই থাকবে কাজ। এতকাল তো কেউ যায়নি সেখানে, তাতে কার কী বয়ে গিয়েছিল ? এখনো যদি ছ মাস কেউ না যায় তাতেই বা কী বয়ে যাবে ?

রহীম। লোকমান, তুমি বলছ এই কথা ! তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনব কখনো ভাবিনি। এত কাল কিছু করা হয়নি বলে যদি কিছু বয়ে না-ও গিয়ে থাকে, এখন যে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, অসংখ্য লোক তা দেখেছে আর তার সুফল পেয়েছে, আরো পাবার জন্যে নিজেরা প্রস্তুত হচ্ছে। তুমিই বল এ অবস্থায় কি কাজ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব ?

লোকমান। কিন্তু এখন তো বর্ষা আসছে। আবাদের মরসুম। এ সময়ে কী কাজটা করবে শুনি ?

রহীম। এখনো দেরী আছে বর্ষার, কাজেই এখন থাকব সেখানে। আর আবাদের মরসুম তো দুটো মাস, বড় জোর তিন মাসের কাজ। ঐ সময়টা হয়তো আমি থাকব না সেখানে। তখন সম্ভব হলে কিছু সাহায্য করতে পারি।

লোকমান। তিন মাস যদি পার, আর তিনটে মাস পারবে না ? এত কী ক্ষতি হয়ে যাবে তাতে ?

রহীম। না লোকমান, তা হয় না। তিন মাসও যদি কিছু করি, সে অবসর মতোই করব। আমার অন্য কাজও আছে এখানে। তাছাড়া আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না তোমার কারবারে। তাহলে আর বেরোতে পারব না কখনো—ছ মাস কেন, ছ বছরেও না।

লোকমান। আসলে তোমার মাথায় এখন ঢুকেছে নেতাগিরির মোহ। তাই আর অন্য কথা ভাবতে পারছ না।

রহীমের মনে হ'ল লোকমান তাকে হতাশ করেছে। ব্যঙ্গিত-ভাবে হেসে বললে, আমাকে এত কাল দেখবার পর এই ধারণা হ'ল তোমার লোকমান? তবে তাই যদি বল তুমি তো তাই। মানুষকে একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। আমার ঘর সংসার নেই, টাকা পয়সা বা উপায়-উপার্জনও নেই, তাই, তোমার কথায়, আমি না হয় নেতাগিরি নিয়েই থাকব।

লোকমান ভাবলে রহীম তার প্রতি ঈর্ষার বশেই এই মন্তব্য করেছে। সে যে বিয়ে করেছে, প্রেস করে অর্থ উপার্জন করছে, সেজন্যই তার হিংসা। সে উঠে গেল সহজভাবেই কিন্তু রহীমের প্রতি বিদ্বিষ্ট মন নিয়ে। তবে সে ভাবটা প্রকাশ করলে না। সে রহীমকে চটাতে চায় না। এখনো তার সাহায্য অন্তত কিছু পরিমাণেও পাবার আশা আছে জেনে তাকে বরং হাতে রাখতে চায়।

যাবার আগের দিন রহীম গেল মরিয়মদের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক চিন্তা করে সে স্থির করেছে জাহানআরার অসুখ সম্বন্ধে সে যে ভয় করছে তা তার মাকে বলবে আজ।

মরিয়মকে যখন একা পেলে রহীম বললে, মামীমা আজ একটু ভূমিকা করে কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। কথাটা বলি আমাকে ভুল না বোঝেন যদি।

তোমাকে আমি ভুল বুঝব কেন বাবা, হেসে বললে মরিয়ম। আমার কাছে কোন কথা বলতে তোমার সংকোচ কিসের?

কথাটা গুরুতর বলে সংকোচ করছি মামীমা, গম্ভীরভাবে বললে রহীম। আমার ধারণা ভুলও হতে পারে—আমি চাইও যে ভুলই হ'ক। আপনি জানেন নূরজাহান, জাহানআরা দুই বোনকেই আমি স্নেহ করি। তাদের কোন বিপদ-আপদ ঘটে এটা আমি চাই না।

একথা তুমি আমাকে বলছ কেন বাবা? আমি কি জানিনে?

জানেন বলেই আমার কথাটা আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছি, রহীম বলতে লাগল। সেদিন জাহানারা আমাকে যে কথা বলেছিল

তাই শুনে তার অসুখ সম্বন্ধে আমার একটু ভয় হয়েছে। তার শরীর রোগা হয়ে গেছে অথচ ডাক্তার কোন রোগ দেখতে পায়নি। তাই তার কথার ধরন, তার ভাবান্তর, তার ব্যবহারের মধ্যে আগে-কার সজীবতার অভাব—এই সব দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে এ কোন মানসিক রোগের লক্ষণ বলে। এ সন্দেহ মিথ্যে হ'ক এই আমি চাই। কিন্তু যদি বাস্তবিকই কিছু বিপদ ঘটে, তাহলে শুরুতেই একথা অন্তত আপনাকে না জানানোর জন্তে নিজেকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারব না।

শুনে মরিয়ম ঘাবড়ে গেল। রহীমের কথাকে সে গুরুত্ব দেয়। সে যখন এ কথা বলছে তাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। সত্যিই যদি মেয়ের তেমন কোন অসুখ হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে মারাত্মক বিপদ হবে।

উদ্বেগের সহিত সে বললে, তোমার এমন সন্দেহ হ'ল কেন বলতো বাবা? কী বলেছিল সে?

আমি তার রোগা হয়ে যাবার কথা তুললাম, বললে রহাম। বললাম, রোগা হয়ে যাচ্ছ অথচ ডাক্তার বলে রোগ নাই কিছু, এটা চিন্তার বিষয়। সে কথাটাকে বোধ হয় ঠাট্টা মনে করে হেঁয়ালির মতো জবাব দিলে। বললাম, তুমি আগে তো এভাবে কথা বলতে না। এখনো আগের মতো হেঁয়ালি ছেড়ে সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে থাক, দেখবে তোমার শরীর সেরে যাবে। তাতে সে শুধু হাসলে, কোন জবাব দিলে না। আগের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে তার এই ভাবান্তর দেখেই সন্দেহটা জাগছে আমার মনে।

রহীমের কথা থেকে ঠিক কী ধারণা করা যায় তা বুঝলে না মরিয়ম। তবে মেয়ের চালচলন কথাবার্তা যে এখন স্বাভাবিক নয় তা সে জানে। ভাবলে, এই অবস্থাটা তাদের পক্ষে গা-সওয়া হয়ে গেছে বলে বোধ হয় তাঁদের কাছে তেমন অস্বাভাবিক বোধ হয় না, যেমন বোধ হয়েছে রহীমের কাছে তাকে এই অবস্থায় প্রথম দেখেছে বলে। তাই তার কথা শুনে বিচলিত বোধ করলে।

বললে, তাহলে ওকে নিয়ে কী করা যায় বলতো বাবা?

তা তো আমি বলতে পারব না মামীমা, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, রহীম জবাব দিলে।

মেয়েদের মরিয়ম ও হাতেম দুজনেই অত্যন্ত ভালোবাসে। তাদের প্রত্যেকের ধারণা দুজনের মধ্যে সে ইতরবিশেষ করে না। কিন্তু হাতেমের মনে হয় মরিয়ম বড় মেয়েকে বেশি ভালোবাসে—হয়তো তার ছেলে শৈশবে মারা যাবার পর সে প্রথম সন্তান বলে, তবে মরিয়ম অবশ্য তা স্বীকার করে না। হাতেমও হয়তো তার এই চিন্তার কারণে ছোট মেয়ের দিকে ঝুঁকেছে বেশি, এবং মরিয়ম তাকে বলেও সে কথা, কিন্তু হাতেম তা স্বীকার করে না।

দুই সন্তানের প্রতি স্নেহ বণ্টনে পার্থক্য বোধ থাক বা না থাক, নূরজাহানের বিবাহের পর লক্ষ্য করা গেল মা-বাপ দুজনেই ছোটর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বেশি। তার মধ্যে এ চিন্তা থাকা আশ্চর্য নয় যে সে এখনো তাদের "পর" হয়ে যায়নি, ষোলআনা তাদেরই সন্তান থেকে তাদের স্নেহের বড় দাবিদার সে-ই। সেই সঙ্গে তার অসুস্থতার চিন্তাও স্বভাবতই তার প্রতি তাদের মমত্ববোধকে আরো গভীর করেছে।

দুই বোনের মধ্যেও মনের মিল আছে, গভীর স্নেহের টান দুজনেই বোধ করে পরস্পরের প্রতি। জাহানআরার বর্তমান অসুস্থতা নূরজাহানকেও কম দুঃখ দেয় না।

রহীম চলে যাবার পর মরিয়ম তার দুশ্চিন্তা নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। কী করবে, কাকে বলবে ঠিক করতে পারলে না। সেদিন আবার হাতেমও নাই, তার ভাইপোরা কী কাজে দেশে ডেকে নিয়ে গেছে, আজ ফিরতে পারবে না। মরিয়ম ঠিক করলে জাহানআরাকেই একবার বলে দেখবে রহীমের উপদেশ মতো সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার চেষ্টা করতে পারে কিনা।

রাত্রে হাতেম নাই, সে জাহানআরাকে তার কাছে শুতে বললে।

তারা দুই বোন যখন থেকে পৃথক কামরায় শুয়েছে তখন থেকে সে কোন একজন মেয়েকে নিয়ে এমন নিরালায় শোয়নি। হাতেম বাইরে গেলেও মেয়েরা একত্র থেকেছে, সে একা শুয়েছে। আজ মরিয়ম ও জাহানআরা দুজনেই নিজ নিজ কামরায় একা থাকত, তাই সে মেয়েকে ডেকে নিলে।

কিন্তু শুতে গিয়ে তখনি শুতে পারলে না, বিছানায় বসে রইল। মেয়েকে এমন নিকটে পেয়ে অনেক কাল পরে তার প্রতি তার বুকভরা মাতৃস্নেহ উদ্বেল হয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগল। শিশুর সঙ্গে মা যেমন করে সহজ স্বাভাবিক ও অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলে তেমনি ভাবে সে জাহানআরার শৈশবের কথা বলতে লাগল। সে কী বলত, কী করত তার উল্লেখ করে হাসি তামাসা করতে লাগল। শিশুর মতো মেয়ের মুখে বারবার চুমো খেতে লাগল।

জাহানআরাও তেমনি ভাবে সাড়া দিলে। মায়ের হাসি তামাসায় যোগ দিয়ে মায়ের গলা জরিয়ে ধরে বলতে লাগল, হ্যাঁ মা, সত্যি আমি এই কথা বলতাম? সত্যি ও রকম করতাম? আচ্ছা, বুবু কী বলত মা? ইত্যাদি। এমনি আপন, এমনি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা যে মায়ে-ঝিয়ে পরস্পরের মনে আনন্দের জোয়ার এনে দিলে, তাদের মধ্যে যেন কোন রকম ব্যবধানই থাকল না।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর মরিয়ম বললে, এমনি হাসি খেলা তুই কেন করিসনে মা আমার সাথে? তুই আর আগের মতন স্বাভাবিক থাকিস না, গম্ভীর হয়ে থাকিস। আগের সে হাসি কথা নেই আর তোর। কী হয়েছে তাও বলিস না। তোর গম্ভীর মুখ আমাকে বড় কষ্ট দেয় জাহানআরা।

জাহানআরা চুপ করে থাকল। মরিয়ম বলতে লাগল, রহীমও আজ বললে ঐ কথা। তারও তাই মনে হয়েছে।

কী বললেন? আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলে জাহানআরা।

বললে, তোর আগেকার স্বাভাবিক ভাবটা নেই, কেমন এক

ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে। সেদিন তুই কী সব বলেছিলি তাকে, তাই শুনে বললে তোর কথা কেমন হেঁয়ালির মতো শোনায়। তার ধারণা তুই এই অস্বাভাবিক ভাবটা কাটিয়ে ফেললে তোর রোগ-বেয়ারাম কেটে যাবে।

আমাকেও সে কথা বলেছিলেন তিনি, বললে জাহানআরা। আমি নিজেও বুঝছি আমার ব্যবহার একটু অস্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু—কিন্তু তিনি বলার পরে চেষ্টা করেও যে আমি স্বাভাবিক হতে পারছি না মা। নিজের মনের সাথে লড়াই করছি, কিসে বাধা দিচ্ছে বলে জিততে পারছি না।

ঠিক বুঝতে পারছি না তোর কথা, বললে মরিয়ম।

তোমারও হয়তো হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, না মা? তাঁকেও যা বলেছি তার মধ্যেও বোধ হয় হেঁয়ালির ভাব ছিল। কিন্তু সব কথা তো খুলে বলা যায় না মা, জাহানআরা বললে।

বলা যায় রে, বলা যায়। আর কাউকে না বলতে পারিস, আমাকে তো বলবি। আমি তোর মা, আমাকে তো অবিশ্বাস করিস না। আমার কাছে সংকোচ না করে বল না মা, খুলে তেরে মনের কথাটা, মরিয়ম মিনতির সুরে বলে।

জাহানআরা অসহায় হয়ে কান্নায় ফেটে পড়ল। ফোঁস করে উঠে মায়ের বুকে মুখ লুকোলে। মরিয়ম গভীর মমতায় তাকে বুকে চেপে ধরে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামলে সে উঠে সোজা হয়ে বসল। তার মা আঁচল দিয়ে সস্নেহে তার চোখ মুছে দিলে। বললে, রহীমকে যা বলতে চেয়েছিলি খুলে বলতে পারিসনি, যেটুকু বলেছিস তাকে সে হেঁয়ালি ভেবেছে, এই তো?

খুলে বলবার সাহস হয়নি মা, পাছে জবাব শুনে বুকটা আমার ভেঙে যায়। হয়তো আমি ভুল করেছি তাঁর কথা ভেবে। কিন্তু সে ভুল থেকে মনটাকে সরিয়ে আনবার মতো তাকত আমার নেই যে মা। তুমি বলে দাও কী করব আমি।

ভুল কি ঠিক, সে পরে দেখা যাবে, আশ্বাসের সুরে বললে তার মা। কিন্তু কথাটা তাকে না বলতে পারলেও আমাকে কেন বলিসনি? শুধু শুধু দগ্ধে মেরেছিস নিজেকে এতদিন ধরে। তোর ভালোমন্দর কথা আমাকেও তো ভাবতে দিতে পারতিস।

মা, তোমাকে অবিশ্বাস আমি করিনি কখনো, আজও করিনা, আবেগের সহিত বললে জাহানআরা। তুমি যে আমার কতখানি তা আমি জানি। তবু তোমাকেও বলতে সাহস পাইনি। কেবলই মনে হয়েছে তোমরা কেউ আমার এ ভুলকে সমর্থন করবে না। সত্যি মা, তুমি মনে কর আমি ভুল করিনি?

আমি তাই মনে করি। তোর কোন ভুল হয়নি।

মা! বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে জাহানআরা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলে। একটু পরে ছেড়ে দিয়ে বললে, কিন্তু মা, তোমার একার মত হলেই কি চলবে?

না, তোর আব্বার মতও হওয়া দরকার। আমি চেষ্টা করব।

তাতেও তো হবে না মা।

হঁ্যা, রহীমের মতও চাই অবশ্য। সে ভার আমাকেই ছেড়ে দে না।

তুমি এমন ভরসা পাচ্ছ কিসে বুঝতে পারছি না মা।

কেন ভরসা পাব না? তুই জানিস না জাহানআরা, তুই যেমন আমার মেয়ে, রহীম তেমনি আমার ছেলে, খালি তোকে পেটে ধরেছি, তাকে ধরিনি। সে কথা আমরা দুজনেই জানতাম, আজ তোকেই বললাম, আর কেউ জানে না। তার ওপর আমার জোর খাটবে। কিন্তু জোর আমি করব না, তাকে বোঝাতে পারব বলে বিশ্বাস করি আমি।

সে আবার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো তার মুখে চুমো খেলে। মরিয়ম হাসি মুখে তাকে চুমো খেয়ে বললে, এখন তুই নিশ্চিন্ত থাক আমার ওপর ভার দিয়ে। তোর জন্যে যা কিছু দরকার আমি করব। তুই শুধু আমার লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে আগের

মতন স্বাভাবিকভাবে থাকিস, তোর এই চেহারা যেন আর বেশি দিন আমাদের দেখতে না হয়। রহীম তোকে বলে গেছে তাই, আমিও সেই কথাই বলছি। বল জাহানআরা, শুনবি তো মায়ের কথা ?

শুনব মা। তোমার কথা শুনব না ? আমার মায়ের মতন এমন মা আছে কজনের ?

মরিয়ম অবার হাসিমুখে চুমো খেলে মেয়েকে। তার বুকের উপর থেকে যেন একটা জগদ্দল পাষাণ নেমে গেল। মেয়ের জন্য যে দায়িত্ব নিলে সে সম্বন্ধে এখন আর কিছু চিন্তা করতে চাইলে না। বললে আয়, আমার কোলে এসে শুয়ে থাক।

জাহানআরা হেসে পরমানন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে শুল। তারো মন যথেষ্ট হালকা বোধ হ'ল। মায়ের আশ্বাস তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করতে না পারলেও অনেকখানি ভরসা দিয়েছে। ঘুমোবার আগে সে ভাবতে লাগল রহীম আজই গেছে তাদের বাড়ি থেকে। আবার কবে আসবে সে ?

চৌদ্দ

এক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। রহীম যেমন দেখে গিয়েছিল, আবাদে ফিরে এসে প্রায় তেমনিই দেখলে। রোস্তমকে বললে, কাল সকালে একবার মোল্লাপাড়া যাই চল, চাচার বাড়ি। ছুপুরে সেখানে খেয়ে বিকেলের দিকে ফিরে আসব। আর পরশু সকালে সংগঠনী কমিটির সভা ডাকতে হবে, মেম্বরদের খবর দেবার ব্যবস্থা কর। জানিয়ে দেবে যে মেম্বররা যেন নিজ নিজ এলাকায় যত সমিতির মেম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের তালিকা আর চাঁদার পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসে।

পরদিন দেলখোশ মোল্লার বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বৃদ্ধের দাওত কবুল করা আছে অনেক আগে থেকে কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠেনি এ পর্যন্ত, সে কাজটা সারা হবে। তার প্রয়োজন আছে। তবে আসল কাজ হ'ল একজন সম্পন্ন চাষীর মত জানা যাবে—ধানের দর কত হওয়া উচিত আর রোজ মজুরী কত পাওয়া সম্ভব।

মোল্লা বললেন, দেখ বাবা, ছু বছর আগে এক টাকা ছ-আনা দরেও ধান বিক্রী করিছি। তখন মজুরী চার আনার ওপর উঠত না। এ বছর ধর খামারে ছু টাকা দরও পাওয়া গেছে, বর্ষা নামলে আরো ছু তিন আনা উঠবে হয়তো। এবার ধান কাটার মরসুমে মজুরী গেছে চার পাঁচ আনার বেশি নয়। তাতে গরীবদের পোষায় না। তবে বাবা, আমি বললেই তো হবে না, আর পাঁচজন কী বলে দেখতে হবে। ছ আনা দিতে যদি লোকে রাজি হয় তো আমি কি বলব দোব না?

অন্য বড় চাষীরা কত মজুরী দিতে রাজি হবে বলতে পারেন, চাচা? রহীম জানতে চাইলে।

তা কী করে বলি বাবা, কে কী ভাবছে? তবে আবাদের মরসুমে কিছু বেশি দেবে বৈ কি। সবাই তো চায় তাড়াতাড়ি কাজ সারতে, জনের দরকার তখন সবায়েরই। ঐ সময়টায় ছ আনা দিতে পারে। আবার জন না পাওয়া গেলে গরজে বেশিও দিতে পারে।

পরদিনের কমিটির সভায় সোনাপুর ও মোহনগঞ্জ এলাকা থেকে যাতে অন্তত একজন করে যোগ দিতে পারে সেজন্য নীলু মারফত চিঠি পাঠিয়েছিল রহীম। কাসেম ও দুলাল এল। কাসেম বললে তাকে ইস্কুলে যেতে হয়, তাই সভা রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে ডাকলে তার পক্ষে সুবিধা হয়।

হাট আন্দোলনের মধ্যে আরো অনেক কৃষক ও মজুরের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল লড়াকে হিসাবে। কর্মীরা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় তাদের হিসাব রেখেছে। তাদের অনেককে পরবর্তী আলোচনা বৈঠকেও ডাকা হয়েছিল। এ রকম কয়েকজন নতুন কর্মীকে কমিটির মধ্যে নেওয়া স্থির হ'ল।

এই নতুন কর্মীদের মধ্যে একজন হ'ল কুমীরখালির শিবদাস পাত্র ওরফে শিবু। জাতে পোদ। নিজের অল্প জমি আর বাস্তু ভিটে ছাড়া ভাগের জমি চাষ করে, আর কিছু দুধ বিক্রী করে। গ্রামের প্রাথমিক ইস্কুলে পড়ে পাস করেছিল। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। মধুখালির হাটে গুণ্ডা ধরার কাজে সাহায্য করেছিল। পরে সমিতির মেম্বর সংগ্রহের কাজও ভালো করেছে। নিজের গ্রামে তার বেশ প্রভাব আছে। বোঝে শোনে, কথা বলতে পারে।

কমিটি মেম্বর সংগ্রহের হিসাব নিয়ে দেখলে কাজটা করছে যারা কিছু লিখতে পড়তে পারে। এর মধ্যে গাফিলতি করেছে দেখা গেল বংশী। তবে সকলেই স্বীকার করলে এটা তার গাফলতি নয়, কারণ নিজে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে মেম্বরদের নামধাম লিখে রসিদ কাটা বা তালিকা করা তার ধাতের কাজ নয়। সে সমিতির মেম্বর হবার কথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছে, তার ফলে কৃষকরা

অন্য কর্মীর কাছে নাম লিখিয়ে মেম্বর হয়েছে। রহীম পরিহাস করলে, বংশীদাদা তাহলে টিন বাজিয়ে শিকার তাড়িয়ে আনা লোক, শিকার করবে অন্য লোকে।

দাশু নিরক্ষর হলেও কিন্তু এ কাজে হাত দিয়েছে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে সে লোকের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে আর লেখার কাজ করিয়েছে তেমন লোক যাকে পেয়েছে তাকে দিয়ে।

মোট হিসাব করে দেখা গেল সংখ্যাটা ভালোই। শত শত লোক নিজেরাই এসে গরজ করে মেম্বর হয়েছে। এদের মধ্যে গরিব ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই বেশি। এই সময়ে মেম্বর হবার জন্য একআনা খরচ করাও সহজ নয়, একদিনের খোরাক, তবু হয়েছে তারা মেম্বর। অনেকে বললে মেম্বর এখনো বহু লোক হবে, সেজন্য প্রচার দরকার গ্রামে গ্রামে। সমিতির পতাকা আর রসিদ বই থাকলে কাজটা আরো সহজ হবে।

কমিটি সিদ্ধান্ত করলে সাদা কাগজের তালিকায় যে সমস্ত নাম লেখা হয়েছে সেগুলি রসিদ বইতে তুলে রসিদ কেটে মেম্বরদের দিতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে আরো রসিদ বই এবং একটা করে লাল পতাকা দেওয়া হবে। মেম্বর সংগ্রহের কাজ আরো জোর দিয়ে চালিয়ে যেতে হবে।

সংগঠন সম্বন্ধে আরো সিদ্ধান্ত হ'ল এখন থেকে গ্রামে গ্রামে ভলান্টিয়ার দল তোয়ের করতে হবে, তাদের নামের তালিকা তোয়ের করে রাখতে হবে। এখন তাদের কাজ হবে সমিতির প্রয়োজনে যে কোন কাজে যোগ দেওয়া, বিশেষ করে আন্দোলনের সময় প্রচার ও অন্যান্য কাজ করা, এমন কি দুশমনের হামলা হলে লাঠি ধরেও কৃষক ও মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করা। সেজন্য যুবকদেরই এই দলে বেশি সংখ্যায় নিতে হবে।

ভলান্টিয়ারদের মধ্যে যারা প্রচারের কাজ, আন্দোলনের কাজ, সংগঠনের কাজ, চাঁদা সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সমিতির কাজ করবে তাদের কর্মী বলে গণ্য করা হবে। তাদের জন্য

শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে—মোটামুটি ভাবে সমিতির নীতি ও লক্ষ্য, তার রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্ক, তার সংগঠনের নীতি ও পদ্ধতি, কৃষক সংক্রান্ত আইনের কথা ইত্যাদি বিষয় তাদের শেখাতে হবে। রহীম খুব সংক্ষেপে বিষয়গুলি এই সভায় ব্যাখ্যা করলে এবং বললে পরে এই নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করব।

এ সবের উপরে প্রয়োজন একটা নেতৃত্ব গড়ে তোলা—বিভিন্ন দিক থেকে সমিতির কাজ ঠিক করবার ও আন্দোলন পরিচালনা করবার এবং সংগঠন গড়ে তোলবার উপযুক্ত সাহসী, উদ্যোগী ও বুদ্ধিমান কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা দিয়ে এবং তাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা জাগিয়ে তুলে এই নেতৃত্ব তোয়ের করা হবে। তারা নিজ নিজ এলাকার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে, শিক্ষা দিয়ে কর্মী তোয়ের করবে, আন্দোলন পরিচালনা করবে, সংগঠনের কাজে তদারকী করবে, এবং যে কোন বিপদ আপদের সময় তার মোকাবিলা করবার জন্য কর্মী ও ভলান্টিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসবে।

দেখা গেল আন্দোলন এখন এত দূর ছড়িয়ে গেছে যে একটা সংগঠনী কমিটি দিয়ে আর কাজ চলে না। মোহনগঞ্জের মতো দূর এলাকার পক্ষে কমিটির সভায় যোগ দেবার জন্য মধুখালি এলাকায় আসা কঠিন। কাজেই সোনাপুর ও মোহনগঞ্জ মিলিয়ে অন্তত আর একটা কমিটি গঠন করা দরকার। সে কাজের ভার দেওয়া হ'ল রহীমকে কিন্তু তার সঙ্গে এদিকের একজন স্থানীয় কমরেডকেও যেতে হবে ভবিষ্যতের কাজের সুবিধার জন্য।

তাছাড়া দুই এলাকার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের শিক্ষার জন্য অবিলম্বে দুটি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার দায়িত্বও নিতে হবে রহীমকে।

মজুরী বৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হ'ল। ধান চালের দর বেড়েছে কিছু, আরো বাড়ছে, কাজেই জন-মজুরদের মজুরী না বাড়ালে আর চলে না। কমিটির মেম্বররা সকলে বা অধিকাংশও জন খেটে খায় না, বরং অনেকেই মরসুমের সময় কিছু কিছু মজুর

খাটায়। কাজেই অধিকাংশের চিন্তার মধ্যে ছিল মজুরী পাবার চেয়ে মজুরী দেবার প্রশ্নই প্রধান। তাহলেও মজুরদের অবস্থা তারা জানে এবং তাদের প্রতি তাদের দরদও আছে। সে জন্য মজুরী বৃদ্ধির দাবি ও তাই নিয়ে আন্দোলন করার প্রস্তাব সকলেই মেনে নিলে শুধু নয়, উৎসাহের সহিত সমর্থনও করলে। এই এলাকায় জন-মাহিন্দারদের সংখ্যা এত বেড়েছে যে তাদের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। হাট আন্দোলনের সময় অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে তারা যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তাও সকলে লক্ষ্য করেছে। কাজেই মজুরী আন্দোলন পরিচালনা করবার দায়িত্বও নিলে কমিটি।

রহীম সংক্ষেপে তাদের বুঝিয়ে দিলে শহরের মজুর সংগঠন মজুরদের মজুরীর ও অন্যান্য দাবির আন্দোলন কীভাবে করে থাকে, আর ফলাফল কী হয়ে থাকে। বললে, কিন্তু কৃষক অঞ্চলে এই আন্দোলন ঠিক একই ধরনে হতে পারে না। এখানকার মজুর-মাহিন্দারদের চরিত্র শহরের মজুরদের মতো নয়, তাদের কাজ বারোমাস সমানভাবে চলে না, মরসুমী ধরনের কাজ। যে সব জমির মালিক বা কৃষক তাদের কাজে নিযুক্ত করে তারাও কারখানার মালিকদের মতো একই ধরনের শোষক নয় এবং গ্রামের অধিকাংশ মজুরই রোজ মজুর।

সেজন্য আপাতত তারা সিদ্ধান্ত করলে তাদের দাবি—দৈনিক মজুরীর হার ছ আনার কম হবে না, চাষের মরসুমের অবস্থা অনুসারে আরো বেশি হওয়া দরকার। এই দাবি সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের নিয়ে আলোচনা করে আপসে একটা মীমাংসা করতে হবে যাতে মজুরী ছ আনার কম না হয়। সেই সঙ্গে মজুর ও কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে দিন পনর পরে সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, এবং বড় বড় জমির মালিকরা যাতে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় সেজন্য সমস্ত খেতমজুররা এবং ভাগচাষী ও অন্যান্য ছোট চাষীরা যেন মিলিতভাবে চাপ সৃষ্টি করে। ছোট চাষীরা যদি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে মজুরী দেয় তাহলে

বড়দের উপর অনেকটা চাপ পড়বে।

কমিটির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমন সুশৃঙ্খল আলোচনা এর পূর্বে হয়নি কোনদিন। এই আলোচনায় নিজের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে শরিকও হ'ল প্রত্যেক মেম্বর। রহীম লক্ষ্য করলে এর মধ্যে দুটো জিনিস বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে—মেম্বরদের দায়িত্ববোধ এবং শৃঙ্খলাবোধ। তারা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে সভার কাজ শেষ করলে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করবার জন্য নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে নিলে। তাদের উৎসাহ দেখে রহীম নিজেও উৎসাহিত হয়ে উঠল। পরবর্তী সভার তারিখও ধার্য করা হ'ল।

সভা শেষ হলে রহীম বললে, কমরেড, বাংলাদেশে সরকার একটা কমিশন বসিয়েছিল জমিদারী ব্যবস্থা, খাজনার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে। অল্প দিন হ'ল কমিশন তাদের সুপারিশ জানিয়ে গবরমেণ্টের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেছে। তাতে বলা হয়েছে জমিদারী প্রথা তুলে দিতে হবে আর সেজন্যে তাদের আয়ের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; সমস্ত জমিই রাইয়তী স্বত্বে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে আর তারা হবে সরাসরি সরকারের প্রজা; ভাগচাষ প্রথা তুলে দিতে হবে, যতদিন না তোলা হয় ততদিন ভাগচাষীর কাছ থেকে মালিকরা ভাগ পাবে মোট ফসলের তিন ভাগের একভাগ।

শুনে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করলে। বসন্ত বললে, বলেন কী কমরেড! সরকার তাহলে জমিদারী লাটদারী সব তুলে দেবে তো? চাষী, জনমজুর সবাই তাহলে জমি পাবে? ভাগচাষীরা দুভাগ ফসল পাবে? আমাদের কপালে এ সব জুটবে কি কমরেড!

রহীম হেসে বললে, কপাল ধরে বসে থাকলে জোটবার ভরসা নেই কমরেড। তবে সমস্ত গ্রামাঞ্চলের খেটে-খাওয়া মানুষ যদি সমিতি গড়ে জোরালো আন্দোলন চালায় তাহলে চাপে পড়ে হয়তো সরকার বাধ্য হবে এই সব সুপারিশ মানতে—সবটা না হলেও

অনেকটা। শুধু আমাদের এই আবাদে আন্দোলন হলেই চলবে না, সারা বাংলাদেশের জেলায় জেলায় সে আন্দোলন করতে হবে। সে কাজ এখন শুরুও হয়ে গেছে। তেমন আন্দোলন হলে তার ফল পাওয়া যাবে। আগেও আন্দোলন হয়েছিল বলেই এই কমিশন বসানো হয়েছিল। এখানে কৃষকদের বোঝানো দরকার যে এখানকার চাষী অন্যান্য জেলার চাষী থেকে আলাদা নয়, তাদের সকলের স্বার্থ মোটের ওপর একই।

সোনাপুর এলাকায় রহীমের সঙ্গে গেল নিতাই। কাসেম ও দুলাল তাদের এলাকার সমিতির কর্মীদের সভা ডেকেছিল। এই বৈঠকী সভায় যারা হাজির হ'ল তাদের মধ্যে বেশিরভাগই জন-খেটে খায়। তাদের মধ্যে সর্দার ও সাঁওতালের অনুপাত ভালো। আলোচনায় দেখা গেল এদের মধ্যে লড়াকে মনোভাব প্রবল। অভাব-অভিযোগের আলোচনার পর নিম্নতম মজুরী ছ আনার পক্ষে মত দিলে তারা। কিন্তু কয়েকজন মজুরীর চেয়ে জোর বেশি দিলে কাজের উপর। একজন মজুর বললে, কমরেড, বারো মাস কাজ পেলে মজুরী দু পয়সা কম হলেও আমার দুঃখু হ'ত না। আসলে আমাদের কষ্ট হচ্ছে বছরে চার পাঁচ মাসের বেশি কাজ পাই না বলে। কাজের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন?

কাজের ব্যবস্থা করবে কে? এলাকা যে এক-ফসলা। আমন ধান ছাড়া চাষই নেই প্রায় কোন ফসলের। কুটীর শিল্পও গড়ে ওঠেনি এখানে। যারা মজুর খাটায় তারাও কিছু করতে পারে না। আর মজুরী যে তিন গুণ বাড়িয়ে নেওয়া যাবে তাও সম্ভব নয়। এক উপায় বেকারীর সময় এলাকার বাইরে যেখানে নানা রকম ফসলের চাষ আছে সেখানে গিয়ে কাজ করা। কিন্তু সকলে পারে না যেতে, সকলে গেলে কাজও যথেষ্ট পাওয়া যাবে না। এ এক বড় সমস্যা। এ নিয়ে কিছু আলোচনা হ'ল কিন্তু ফয়সলা কিছু হ'ল না।

নিতাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এই সমস্যা ও আলোচনার ধরনটা। তাদের এলাকায় এভাবে আলোচনা করেনি তারা।

এতখানি লড়াকে মনোভাবও সে দেখেনি। কাসেম বললে, তারা সমিতির মেম্বর যেভাবে সংগ্রহ করেছে তাতে মজুর আর গরিব চাষীদের সংখ্যা খুব বেশি। অবশ্য মাঝারি চাষীও আছে। যারা নিজে থেকে মেম্বর হতে এসেছে বেশি, তারা প্রায় সকলেই গরীব চাষী ও মজুর।

এই সভায় একটা সংগঠনী কমিটি গঠন করা হ'ল। এই কমিটির মেম্বরদের এবং আরো কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে কয়েকদিন ধরে ক্লাস করা হ'ল। তাতে রহীম অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃষক ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করলে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য, তাদের সঙ্গে সর্দার-দের পার্থক্য, হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য ইত্যাদির কথা তুলে বললে, ধর্ম বা ধর্মের অনুষ্ঠান যার যা আছে মেনে চলুক, আপত্তি নাই। কিন্তু খাওয়া-ছোঁয়া, বসা-ওঠা নিয়ে যদি কৃষকদের মধ্যে তফাত থাকে, একে অপরকে ছোট বা বড় বলে মনে করে, তাহলে কৃষক ঐক্য গড়ে উঠবে কী করে? কেমন করে তারা এক হয়ে লড়বে শত্রুর বিরুদ্ধে? শত্রু তো তাদের একই।

একজন প্রশ্ন করলে, কিন্তু কমরেড, সবাইকে কি সব জিনিস খেতে হবে তাহলে? যদি তা সামাজিক আচারে কিংবা কারো রুচিতে বাধে তবু খেতে হবে?

সে কথা কেউ বলবে না কমরেড। শুধু ভাত তরকারি সবাই যা খায় তাই খাবে। কিন্তু একসঙ্গে বসে সকলে খেতে পারে কি না, সেই হ'ল কথা, জবাব দিলে রহীম।

অনেকে বললে সেটা চলতে পারে। অন্য কিছু লোক বললে সেটা সমাজের নিয়ম নয়।

রহীম তখন আরো পরিষ্কার করে বললে, আমাদের তো একটা সম্মেলন ডাকার কথা আছে। সেই সম্মেলনে যারা যোগ দেবে তারা তো সবাই হবে মজুর আর চাষী। তারা একসঙ্গে বসে খাবে কি না? খাবে অবশ্য ভাত তরকারি, যা সকলেই খায়।

মোটামুটি একটা মত পাওয়া গেল একসঙ্গে সকলে বসে খাবার পক্ষে। কিন্তু কয়েকজন কিছু বললে না। বোঝা গেল তাদের সংকোচ আছে। নিতাইয়ের উৎসাহ যথেষ্ট দেখা গেল।

কমিটির সঙ্গে পরবর্তী সময়ের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রহীম নিতাইকে নিয়ে ফিরে গেল মধুখালি এলাকায়।

এখানে অন্যান্য কাজ সারা হয়ে গেলে মজুরী সম্পর্কে সম্মেলন ডাকা হ'ল। সম্মেলন হবে চণ্ডীপুরে। বিভিন্ন এলাকার ও গ্রামের প্রতিনিধিরা যোগ দেবে। তার মধ্যে অন্তত অর্ধেক খেতমজুর থাকার কথা। তালিকা তোয়ের করে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার পূর্বে গ্রামে গ্রামে বহু কৃষকের সঙ্গে আলাপ করা হ'ল মজুরী বৃদ্ধির দাবি সম্বন্ধে। হাট তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সর্বত্র যে উৎসাহ-উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল সকল স্তরের কৃষকদের মধ্যে, এখন কিন্তু সে উৎসাহ দেখা গেল না। তবে সকল স্তরের মধ্যে না হলেও খেতমজুরদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল প্রবল—যারা পুরোপুরি মজুর তাদের মধ্যে তো বটেই, যারা আংশিকভাবে জন খেটে খায় তাদের মধ্যেও। তবে ভাগচাষী ও অন্যান্য ছোট চাষীরা সমর্থন জানালে। মাঝারী চাষীদের মধ্যে কিছু বিরোধিতা অবশ্য ছিল কিন্তু মোটের উপর সমর্থন পাওয়া গেল। যে অল্পসংখ্যক বড় চাষীর নিকট যাওয়া হ'ল তারা দাবিটা একেবারে অন্যায় বা অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিতে পারলে না, তবে নিজেরা কিছু বলতেও রাজি হ'ল না।

সম্মেলনে উৎসাহ দেখা গেল যথেষ্ট। সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হ'ল যেমন পূর্বে স্থির হয়েছিল। দু চার জন এ প্রশ্নও তুললে যে এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক মজুরী যদি কেউ না দেয় তাহলে করবার কী আছে?

একজন বললে, তাহলে আমরা জোট বেঁধে কাজ বন্ধ করে দোব। যে দেবে না তার কাজ বন্ধ করে দোব, কেউ যাব না তার কাজে।

এর পিছনে সমর্থন বেশি ছিল না। রহীম নিজেও তখন

আপসের মধ্যে দিয়েই মীমাংসা করতে চায়। এর চেয়ে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে যাবার মতো জোর বা উৎসাহ সে লক্ষ্য করলে না সম্মেলনে। কাজেই শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তের মধ্যে আপসের প্রচেষ্টা ও আবেদনের সুর থাকল। রহীম ভাবলে এর ফলেও কিছু চাপ পড়বে কৃষক ও অপেক্ষাকৃত বড় অকৃষক মালিকদের উপর।

সে প্রভাব অবশ্য পড়ল। চাষের মরসুমে ছ আনা মজুরী দিতে কেউ অস্বীকার করেনি। অনেক ক্ষেত্রে তার বেশী মজুরীও পাওয়া গেল।

সম্মেলনের ফলে মজুরী বৃদ্ধি ছাড়া অন্য একটা ফায়দা হ'ল এই যে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে জন-মজুরদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে ছোট চাষীদের মধ্যেও সংহতি বাড়ল, সংগঠনের মধ্যে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী অংশ হয়ে উঠল। সমিতির সংগ্রামী মনোভাব আরো জোরদার হ'ল।

দুপুরের আহারের জন্য চাঁদা তুলে রান্না করে প্রতিনিধিদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগেই ঘোষণা করে দেওয়া হ'ল যে সকলে একত্র বসে খাবে, তবে যাদের তাতে আপত্তি আছে তাদের জন্য একটু দূরে পৃথকভাবে বসবারও ব্যবস্থা থাকবে। রহীম আবেদন করেছিল যেন সেজন্য কারো প্রতি কটাক্ষপাত বা কোন প্রকার প্রতিকূল মত প্রকাশ করা না হয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মাত্র অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলেই একত্র বসেছে। যারা পৃথক বসল তাদের মধ্যে বংশী সমেত দুজন কণ্ঠিধারী ছিল, কিন্তু জলধর নয়। বংশী সকলের নিকট ক্ষমা চেয়ে বললে, আজই পেরে উঠছি না কমরেড, আস্তে আস্তে চেষ্টা করব এটা কাটিয়ে উঠতে। চিরকালকার অভ্যাস তো, সময় লাগবে কাটাতে।

আন্দোলনের এই ধাপে রহীম ও অন্য কোন কোন কর্মী লক্ষ্য করলে দুর্বলতা কিছু কিছু আছে। কিন্তু সার্থকতাও যে অনেক দিক থেকে আছে তাও তাদের নজর এড়াল না। এর ফলে কৃষকদের ও কর্মীদের রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনা এবং সংগঠনের সংহতি বেড়ে গেল।

তার কয়েকদিন পরে ধীরে ধীরে বর্ষা নামতে শুরু করলে। চাষের কাজ শুরু হবার পূর্বে রহীম নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়ে সমিতির কাজের বিষয়ে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলে।

পনর

মা-মেয়ের অন্তরংগ আলাপের মধ্যে দিয়ে যেদিন রাত্রে বুঝ-সমঝটা হয়ে গেল তখন থেকে জাহানআরার মন অনেকটা হালকা হয়েছে, মায়ের উপর নির্ভর করে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে সে।

তাদের দুই বোনের মধ্যে যথেষ্ট মিল ও হৃদ্যতা আছে। নিজেদের বাইরে শৈশবে খেলার সাথী তারা যথেষ্ট পায়নি সমাজ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে হয়েছিল বলে, যদিও নিকটের বস্তী থেকে হামেশা ছেলেমেয়েরা আসত। দেখতে দুজনেই ভালো, স্বাস্থ্যও ভালো তাদের। লেখাপড়ার আগ্রহ আছে, মায়ের উৎসাহ থাকায় শৈশব থেকেই শিক্ষার প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মেছে। সাংসারিক কাজকর্মে কুণ্ঠা নাই, এবং তা করেও লেখাপড়ার চর্চা করেছে তারা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে।

শিক্ষা সম্বন্ধে লোকমান তাদের তিন জনকেই সাহায্য করেছিল। পরে রহীমের সঙ্গে যখন ওদের পরিচয় হয় তখন লোকমানের অনুরোধে সে তাদের শিক্ষার কাজে আরো বেশি সাহায্য করে। শুধু লেখাপড়ার বিষয়েই নয়, তাদের শহরের সমাজের মতো কথা বলতে, আলাপ আলোচনা করতে এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও মত প্রকাশ করতেও উদ্বুদ্ধ করেছে সে। মরিয়ম এই শিক্ষাকে অন্তরের সহিত গ্রহণও করেছে। সে এবং মেয়েরা এই শিক্ষার ফলে এবং তার মধ্যে দিয়েই রহীমের মতো একজন বেগানা যুবকের সঙ্গেও অবাধে মেলামেশা করেছে।

হাতেম এ বিষয়ে উদাসীন। স্ত্রীর-বিচার-বুদ্ধির উপর তার যথেষ্ট আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে। তাই এই সমস্ত বিষয়টা মরিয়মের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছে। স্নেহপ্রবণ, উদারমনা সংসারী

মানুষ সে, নিজে যথেষ্ট শিক্ষা না পেলেও শিক্ষার কদর বোঝে। রহীমকেও দেখেছে সে, তার সঙ্গে অনেক আলাপ করেছে। তার ব্যবহার তাকে আকৃষ্ট করেছে। তাকে সে লোকমানের পাশে বসিয়েছে, যেমন তার বাড়ির মেয়েরা তাদের দুজনকে একই পর্যায়ে ফেলেছে।

এই শিক্ষা মরিয়মকে খুব বেশি আকৃষ্ট করেছে রহীমের প্রতি। এর মধ্যে দিয়ে সে যেন জীবনের একটা নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে। তার প্রতিদানে সে তাকে দিয়েছে অজস্র স্নেহ। দিয়ে সে তাকে আপন করে নিতে চেয়েছে। আর রহীম এই অযাচিত স্নেহকে মহামূল্য দান বলে গ্রহণ করে তার প্রতিদানে মরিয়মকে ভক্তি করেছে, ভালোবেসেছে মায়ের মতো, আর তার মেয়েদের দিয়েছে ভাইয়ের স্নেহ।

মেয়েরাও তাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে যথেষ্ট, যেন সেও লোকমানের মতো তাদের পরিবারেরই একজন। তাদের দু জনের মধ্যে তফাত যে কিছু আছে তা প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই রহীম লক্ষ্য করেছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দুজনেরই আছে বটে কিন্তু শেখবার ও বোঝবার জন্য জাহানআরার মনের গভীরতা অপেক্ষাকৃত অধিক। সে কথা তার চিন্তার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধেও খাটে। তাছাড়া তর্ক করার সময় সাধারণ আলোচনার মধ্যেও সে নিজের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে। তার সঙ্গে একটু একগুঁয়ে ভাবও প্রকাশ পায়। এ নিয়ে হাসিতামাসা করলেও সে বিচলিত হয় না, নিজের মত বিসর্জন দেয় না। প্রয়োজন বোধ করলে মনের কথা চেপেও রাখে সে, গম্ভীর হয়েও থাকে।

তার তুলনায় নূরজাহান দিলখোলা মেয়ে, একটু হালকা ও ভাবপ্রবণ। হাসি তামাসার দিকে আকর্ষণ তার একটু বেশি। মায়ের মতো তারও মন স্নেহ-মমতায় ভরা। বোনের চেয়েও সে বেশি স্নেহপ্রবণ।

পূর্বে এই ছোট পরিবারটি নিজেকে নিয়েই থাকত বেশি, তবে

নিকটের বস্তীবাসী মেয়েরা প্রায়ই আসত, তাদের সঙ্গে সাধারণ সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে কথাবার্তা বলত। তাদেরই মধ্যে একটি মেয়ে এ বাড়িতে মামার কাজ—রাঁধুনী ও ঝিয়ের কাজ—করত। একজন চলে গেলে আর একজনকে রাখা হ'ত। মামাই অনেক সময় বাজার করত, লোকমানও মাঝে মাঝে যেত বাজারে। ধোয়া মাজা, কুটনো বাঁটনা এবং মামুলী রান্না সাধারণত মামা করত, বাকি রান্নার প্রধান কাজগুলো করত মা ও মেয়েরা।

এর বেশি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাদের অল্পই। অবশ্য দেশ থেকে আত্মীয়রা কখন কখন আসত, তারাও দেশে যেত। মাঝে মাঝে লোকমান তাদের সিনেমায় নিয়ে যেত এবং বাংলা গল্প-উপন্যাস ও সাময়িক পত্র এনে দিত পড়তে। দেশের ও দুনিয়ার খবর এর মধ্যে যতটুকু পাওয়া যায় তার বেশি তারা প্রায় কিছুই রাখত না। লোকমান নিজে খবরের কাগজ পড়ত বাইরে গিয়ে, তার ইউনিয়ন আফিসে বা এমনি কোথাও।

এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের গতানুগতিক ধারা একেবারে বদলে গেল রহীম আসার পর। তার কথায় দৈনিক কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল সকলে। কাগজের কোন কোন খবর নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করার অভ্যাস সৃষ্টি করে দিলে সে। গল্প-উপন্যাস ছাড়া আরো বিভিন্ন শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক বিষয়ের বই পড়ার অভ্যাসও তাদের পারিবারিক জীবনে ঢুকিয়ে দিলে সে-ই। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক বিবেচনা করে অসংকোচে আলোচনা করার উপযোগী নির্দোষ বিষয় বা লেখা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও তর্ক করতেও সে উদ্বুদ্ধ করলে তাদের। এই উপায়ে সংস্কৃতি ও শালীনতার বিচারে শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ এবং কথা বলার ধরনও সে আমদানী করলে তাদের মধ্যে। পুরোন বসিরহাটি বুলির প্রভাব কমে গেল। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে যেসব ত্রুটি বা গলদ দেখলে তা সংশোধন করে দিতে লাগল, যেমন করে এক সময়ে সে নিজের ত্রুটি সংশোধন করেছিল।

এ কাজ রহীম করেছিল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে তাদের ব্যবহার যখন তাকে আকৃষ্ট করে তখন তার মনে হয় নিজের রুচি মাফিক তাদের উন্নত করা কঠিন নয় এবং সেজন্য তাদের সাহায্য করা দরকার।

তাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ও পরিধি বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে রহীম তাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিসরও ধীরে ধীরে বিস্তৃত করতে থাকে। তাতে তাদের শুধু সাড়াই পাওয়া যায় না, তাদের উৎসাহও বাড়তে থাকে, আরো বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার ও আলোচনা করার জন্য প্রেরণাও লাভ করতে থাকে তারা।

রহীম কিন্তু তাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা কখনো ভুলে যায়নি। একথাও ভুলে যায়নি যে সে এমন এক রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যা তাকে সাধারণ সামাজিক জীবনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে দেয় না। তাই সে এই বাড়িতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে এড়িয়ে চলত—এই মেয়েদের নিয়ে সিনেমায় বা বাইরে অন্যত্র কোথাও বেড়াতে যেত না, এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের বিষয় নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করত না। তারা লোকমানের সঙ্গে সিনেমা যাওয়া স্থির করলে মরিয়মের বিশেষ অনুরোধে কখন কখন গেছে সে তাদের সঙ্গে, নিজে একা কখনো নিয়ে যায়নি তাদের—তারা বললেও এড়িয়ে গেছে একটা কিছু অজুহাত দেখিয়ে।

এইসব দেখে, তার অভ্যাস ও ব্যবহার লক্ষ্য করে মরিয়ম ধীরে ধীরে রহীমের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাকে নিজের সন্তানের মতো আপন করে পেতে চায়। এখন তার ধারণা সেইভাবে পেয়েছেও তাকে।

তবু সমাজের চোখে সে তাদের আপন নয়, নিকটও নয়। তাদের মাঝখানে সমাজের ও আইনের দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড ব্যবধান। এই ব্যবধানের কথা মনে পড়লে মরিয়ম অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করে। তাই সেটা দূর করবার কথা ভেবে সে হাতেমের নিকট

প্রস্তাব করেছিল রহীমের সঙ্গে জাহানআরার বিয়ে দেবার জন্য। হাতেম রহীমের আর্থিক অবস্থার প্রশ্ন তুলে আপত্তি করেছিল। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতের বিরোধ ঘটেছিল। সে বিরোধ কাটেনি।

মরিয়ম কিন্তু হাল ছাড়েনি। মেয়েকে সম্পত্তি দিয়ে তার আয়ের সাহায্যে রহীমের বিরুদ্ধে হাতেমের আপত্তি খণ্ডন করতে চেয়েছিল। হাতেম তার এই গোপন মতলবের খবর না জানলেও তারই প্রস্তাব মেনে নিয়ে যখন দুখানা বাড়ি বানিয়ে দুই মেয়ের নামে তাদের নামকরণ করে এবং এই সংবাদ প্রথম তাকে জানায়, তখন সে উৎফুল্ল হয়ে স্বামীকে অভিনন্দন জানালে এবং তার বুদ্ধির তারিফ করলে। তার মনের বাসনা নতুন করে, আগের চেয়ে প্রবল হয়ে জেগে উঠল।

এই সময়ে জাহানআরার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন ডাক্তার রোগ ধরতে পারছে না দেখে দুজনেই বিচলিত হয়ে পড়ে, কী যে করবে বুঝতে পারে না। যে রাত্রে মেয়ের অসুখের রহস্য তার মায়ের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল তখন থেকে মরিয়ম অপেক্ষা করতে লাগল তার পুরোন প্রস্তাবটা আর একবার হাতেমের নিকট তোলবার সুযোগের জন্য।

রহীমের যে দুটো প্রবন্ধ কাগজে বেরিয়েছে বলে লোকমান তাদের সামনে উল্লেখ করেছিল সেগুলি পড়বার জন্য মরিয়মের অনুরোধে রহীম তাকে দুখানা সাময়িক পত্র দিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একদিন রাত্রে হাতেম খ বার পরে তার ঘরে বসে তার একখানার পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখে রহীমের নামে লেখা একটা প্রবন্ধ। তার বিষয় ছিল তিতুমীরের বিদ্রোহ ও লড়াইয়ের কাহিনী। কৌতূহলী হয়ে পড়ে দেখলে। লেখাটা তার ভালো লাগল।

মরিয়ম শুতে এসে দেখলে কাগজখানা তার হাতে রয়েছে। হাতেম প্রশ্ন করলে, তিতুমীরের কাহিনী লিখেছে, একি আমাদের রহীম?

হ্যাঁ, ওরই লেখা। পড়লে? কেমন লাগল? খুশী হয়ে জানতে চাইলে মরিয়ম।

খুব ভালো লাগল, হাতেম জবাব দিলে। ছেলেটা বেশ লেখে দেখছি তো। ওর আর কোন লেখা আছে এখানে?

তার অন্য লেখাটা দ্বিতীয় পত্রখানা খুলে তার হাতে দিয়ে মরিয়ম বললে, এই একটা আছে। ও তো কিছু বলেনি, সেদিন লোকমানের কাছে শুনে চেয়েছিলাম, তাই দিয়ে গেছে।

সেটা একবার দেখে নিয়ে হাতেম বললে, এখন থাক, কাল পড়ব। ভালো লিখেছে, লেখার হাত আছে ছেলেটার। আগে শুনিনি কোনদিন ওর লেখার চর্চা আছে।

এই সুযোগ নিয়ে মরিয়ম বললে, মেয়েটার যে এই অবস্থা হয়েছে, রোগও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কী করা যায় বলতো?

অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে হাতেম বললে, আমি তো ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না। ওর চেহারা দেখলে আমার চোখে পানি আসে। অমন হাসিখুশী মেয়ে, অমন স্বাস্থ্য, আজ যেন কী হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় 'আব্বা' বলে যখন ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরত, আমার মনে হ'ত এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই—মনে হ'ত যেন জান্নাতে বাস করছি। এখনো ওকে কাছে পেলে আমার বুক জুড়িয়ে যায়। অথচ আজ চোখ তুলে ওকে দেখতেও আমার কষ্ট হয়। তার গলা ধরে এল।

মরিয়ম। শরীরে যখন কোন রোগ ধরা যাচ্ছে না, রোগ হয়তো ওর মনে। জোয়ান মেয়ে, হতেও পারে। বড়র মতো সব কথা ও খুলে বলতেও চায় না। আমার মনে হচ্ছে ওর বিয়ে দিলে এ রকম থাকবে না আর।

হাতেম। তার হাবভাব দেখে তেমন কিছু মনে হয়েছে তোমার?

মরিয়ম। তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি। এটা আমার ধারণা।

হাতেম। হলেও হতে পারে। কিন্তু বিয়ে দিতে হলেও তো

বললেই তার ব্যবস্থা করা যাবে না। বড়র বিয়ে ঠিক হয়েই ছিল, হয়ে গেল। এর জন্যে খোঁজ করতে সময় লাগবে তো। খোঁজ তো আমি করছিও, কিন্তু তেমন কাউকে পাচ্ছি না যে। আর ওর শরীর যদি দিন দিন এমনি খারাপ হতে থাকে তাহলে তো বড় মুশকিলের কথ, বিয়ে দেয়াও তো চলবে না।

মরিয়ম। মুশকিল তো বটেই। তবু যতটা জলদি হয় একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

হাতেম। আত্মীয়দের মধ্যে তেমন ছেলে কাউকে দেখি না। আমার ভাইপোদের কারো সাথে ও মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলবে না, মিল হবে না মোটেই। আচ্ছা, তোমার এক ভাইপো বেশ লেখাপড়া করেছিল, বিয়েও এখনো হয়নি। সে কেমন হতে পারে? চলে বিয়ে দেয়া? কী দোষটোষ ছিল আগে শুনেছি?

মরিয়ম। তওবা, তুমি কার কথা বলছ! লেখাপড়া সে করেছে ঠিকই। এমনি দেখলেও খারাপ মনে হবে না। ব্যবহার ভালো। কিন্তু আমার ভাইপো হলে কী হবে, তার দোষ অনেক। বাপের পয়সা আছে, যেখানে সেখানে যেয়ে খরচ করে। রুচি-রগবতেরও বালাই নেই। এখন তো আবার শুনছি শারাবও ধরেছে।

হাতেম। না, তেমন ছেলের হাতে আমার অমন মেয়েকে তুলে দিতে পারব না, মেয়ে মরে গেলেও না।

মরিয়ম একটু নীরব থেকে বললে, আচ্ছা, রহীম তো ছেলে খুব ভালো। আমরা সবাই তাকে দেখছি এতকাল ধরে। আমি বলি তার সাথেই দাও না বিয়েটা।

হাতেম। রহীম ছেলে তো ভালো। ছেলে হিসেবে তার বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নেই। আমার বিশ্বাস জাহানআরাও আপত্তি করবে না। তবে—তবে কী জান—

মরিয়ম। বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। একবার তার কথা আমি বলেছিলাম, তুমি আপত্তি করেছিলে তার রুজি-রোজগার নেই বলে। রোজগার সে এখনো করে না। তবে সে একটা বড় কাজ নিয়েই

আছে। আর আমাদের তো আছে ঐ দুটি মেয়ে। তুমি যা সম্পত্তি করেছ, দুজনকে ভাগ করে দিলে জাহানআরা তার ভাগের আয় থেকে ভালোভাবেই চালাতে পারবে। তাহলে রহীম টাকা রোজগার করে না বলে এত ভাবনার কী আছে?

হাতেম। তা আল্লার মরজি যা আছে দেখে শুনে নিতে পারলে ভালোই চলবে। তবু—আরো ভেবে দেখতে হবে আমাকে। তুমি কিছু মনে কোরো না, ভবিষ্যতের কথা ভেবে হঠাৎ কিছু বলতে পারছি না এখুনি। আমাকে ভাবতে সময় দাও কিছুদিন। আর তুমি বরঞ্চ এর মধ্যে রহীম সম্বন্ধে মেয়ে কী বলে জানবার চেষ্টা করো।

মরিয়ম। মেয়েকে এখনি কিছু বলবার দরকার নাই, তাই নিয়ে আবার মনে মনে তোলাপাড়া করতে থাকবে। তুমি মত ঠিক কর আগে, তখন তার সাথে কথা বলব।

আলোচনাটা আপাতত এখানেই শেষ হ'ল। মরিয়ম দেখলে হাতেম প্রথমবারের মতো অমত করছে না, সম্মতির দিকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। মেয়ে যে রহীমকেই চায় তা জানলে তার নিশ্চয়ই কোন আপত্তি থাকবে না। তবু মেয়ের মনের কথা এখনো তার নিকট ভাঙ্গলে না, ঠিক করলে হাতেম যদি শেষ পর্যন্ত অমত করে তখন মেয়ের ইচ্ছার চাপটা দেবে তার উপর। স্বামীর দিক থেকে সে এখন অনেকটা ভরসা পেলে।

সেই রাত্রের পর থেকে জাহানআরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তার ব্যবহার ও কথাবার্তার মধ্যে অল্প অল্প পরিবর্তন দেখা গেল। প্রথম দিকে মরিয়ম ছাড়া অন্যেরা সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কিছুদিন পরে সকলেই লক্ষ্য করলে—শুধু তার ব্যবহারে নয়, চেহারার মধ্যেও। তার শারীরিক অবস্থাও ধীরে ধীরে পূর্বের মতো স্বাভাবিক হতে লাগল।

মেয়ের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখে মরিয়মের মনে আনন্দ আর

ধরে না। হাতেম মনে মনে কেবল আনন্দই নয়, গভীর স্বস্তি অনুভব করতে লাগল। তার বিয়ে সম্বন্ধে সত্বর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করেছিল সে, কিন্তু রহীম সম্বন্ধে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না—অমত করতে মন চায় না, সম্মতি দিতে উৎসাহ পায় না। তবু এই দোটানা থেকে অন্তত সাময়িকভাবে সে নিষ্কৃতি পেতে পেরেছে এই ভেবে সে মেয়ের বিবাহে কিছু বিলম্ব হলেও এখন সঙ্কটের আশংকা নাই।

নূরজাহান স্বভাবতই খুব খুশী হয়েছে জাহানআরার অবস্থার উন্নতি দেখে। মা ও মেয়েরা একদিন একত্রে বসে ছিল। সে বললে, মা, দেখ ও কেমন বিনা চিকিৎসাতেই সেরে উঠছে। রোগ যাই হ'ক, শুধু মনের জোরেই বোধ হয় রোগটা কাটিয়ে উঠছে।

হ্যাঁ আল্লা সারিয়ে দিক আমার বাচ্চাকে, জলদি সেরে উঠুক ও, লে তার মা। ওর চেহারা যা হয়েছিল, দেখে ভয় হ'ত আমা

জাহানআরা, তুই এখনও বুঝতে পারিস না হয়েছিল কী? আর সারছিসই বা কী করে? প্রশ্ন করলে নূরজাহান।

জাহানআরা তার স্বাভাবিক মিষ্টি হাসি হেসে বললে, শুনলে মা, বুবুর কথা? আমি রোগের খবর যতটুকু জানি, সারবার খবরও ততটুকুই জানি।

মা ও মেয়ের নিভৃত নৈশ আলাপ ও তার ফলাফলের সংবাদ আজও তারা নিজেদের মধ্যে গোপন রেখেছে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেনি। নিজেদের মধ্যেও তারা এ নিয়ে আর কোন কথা বলেনি। জাহানআরা জানে না তার মা হাতেমের সঙ্গে কথা বলেছে কি না বা তার ফল কী দাঁড়িয়েছে। মায়ের কথায় সে বিশ্বাস করেছে তার আশ্বাস ব্যর্থ হবে না। তাতে সময় লাগলে তার আপত্তি নাই। সময় যে কিছু লাগবে তাও সে ধরেই নিয়েছে।

মেয়ে সেরে উঠতে না উঠতে হাতেম অসুস্থ হয়ে পড়ল। সাধারণ স্বাস্থ্য তার ভালো। কিন্তু সেদিন বিকালে বাড়ি ফিরে এসে বললে,

পেটের মধ্যে কেমন একটু যন্ত্রণা হচ্ছে। আজ রাতে খাব না কিছু। সে মুখহাত ধুয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত্রে মরিয়ম বললে, একবারে খালি পেটে থাকবে? বরং একটু গরম দুধ খাও।

তারা ধরে নিয়েছিল সামান্য ব্যাপার, হয়তো খাবার বিষয়ে কিছু গোলমাল হয়েছে, পেটটা সাফ হয়ে গেলে কেটে যাবে। সকালে উঠে দেখলে সে যন্ত্রণা নাই। হাতেম নিয়ম মাফিক কাজে বেরোল।

দিন কয়েক পরে আবার তেমনি যন্ত্রণা দেখা দিলে রাতে। পরদিন সকালে যন্ত্রণা না থাকলেও সেদিন আর কাজে গেল না। তার পরদিন বেরোল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল সেই যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে। ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করতে না পারলেও সন্দেহ করলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বলে এবং বিশ্রাম নেবার কথা বলে গেল। বিশ্রামের মধ্যেও দু একদিন অন্তর সেই যন্ত্রণা হয়, আবার কেটে যায়।

এর মধ্যে রহীম কলকাতা ফিরে এল। পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দেখা করতে গেল হাতেমের বাড়ি। ভেবেছিল কিছুক্ষণ সেখানে থাকলে লোকমানের সঙ্গেও দেখা হবে। জাহানআরাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল যেমন, তেমনি উৎফুল্লও হ'ল। বললে, তোমাকে দেখে আমার আজ ভারি আনন্দ হচ্ছে জাহানআরা। গতবারে এসে দেখে বড় দুঃখ হয়েছিল। ওষুধপত্র খেতে হয়েছিল, না এমনিই সেরে উঠলে?

না, এমনিই সেরে গেছে, সে সহজভাবেই জবাব দিলে।

মামু আছেন কেমন? প্রশ্ন করলে রহীম।

নূরজাহান বললে, আব্বার শরীর ভালো নয় ভাই। ঘরে শুয়ে আছেন কিছুদিন থেকে।

সে অসুখের বিবরণ দিয়ে রহীমের অনুরোধে তাকে দেখা করতে

নিয়ে গেল। তখন হাতেমের কোন যন্ত্রণা ছিল না। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বললে।

মরিয়ম সেখানেই ছিল। রহীমকে জিজ্ঞাসা করলে, এবার কদিন থাকবে বাবা?

বর্ষাটা বোধ হয় কলকাতাতেই কাটাতে পারব মামীমা, রহীম একটু হাসলে—যেন কাজে ফাঁকি দিয়ে কাউকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ নিচ্ছে সে।

তোমার অবসর থাকে তো এই সময়ে ছোট মেয়েটার জন্যে আর একটু পড়াশুনায় সাহায্য কর না বাবা, মরিয়ম অনুরোধ করলে। ও বলছিল পড়তে চায় কিন্তু সাহায্য করবার মতো পাচ্ছি না কাউকে।

রহীম বললে, তিন চারদিন একটু জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকব মামীমা, এই সময়টা মাফ করবেন। তারপরে বলব ব্যবস্থটা কীভাবে করা যায়।

কাল আসবে?

কাল নয়, পরশু আসব। কাল সময় পাব না।

তাহলে সকাল করে এসো। তোমার কথা শুনব। আজ এখন রয়েছ তো?

আছি খানিকক্ষণ, বললে রহীম। লোকমানের সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে তো।

এর পরে এসে রহীম মরিয়মকে যখন একা পেলে, বললে, মামীমা, আপনি জাহানআরাকে পড়াবার কথা বলছেন আমায়, সেটা কি ঠিক হবে? আমি মামুর সামনে বলতে পারলাম না সেদিন।

মরিয়ম। বেঠিক কী হবে বল?

রহীম। ও এখন বড় হয়েছে, আগের মতো ছোটটি তো নাই।

মরিয়ম। আমার মেয়ে বড় হয়েছে কিনা সে খবর তুমি আমাকে বলবে তবে জানব?

রহীম হেসে ফেললে। বললে, মামীমা, কী যে বলেন আপনি! সেই কথাই বুঝি বললাম আমি?

মরিয়ম। বেশ, বলনি। এখন তোমাকে যা বলেছি তুমি করতে পারবে কি না তাই বল আমাকে।

রহীম। পারব কি না সে প্রশ্ন তুলছে কে? আপনি বলেছেন, তাই যথেষ্ট। কিন্তু—

মরিয়ম। কিন্তু কেন রহীম? তোমার আপত্তিটা কিসের আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? মেয়ের মা-বাপ যদি বলে পড়াতে, তবু তোমার সংকোচ কেন? মেয়ের ভালোমন্দ সম্বন্ধে তার মা-বাপের চেয়ে তোমার মাথাব্যথা কি বেশি বলতে চাও?

আবার হেসে ফেললে রহীম। বললে, মামীমা, এমন খোঁচা দিয়ে এত চোখা-চোখা কথা বলতে আপনাকে আগে তো শুনিনি কখনো!

মরিয়ম। শোননি, এখন শুনবে। দরকার হলে আবার বলব। তোমার যতটুকু দায় তার বেশি পোয়াতে চাইলে খোঁচা তোমায় খেতেই হবে।

এবার মরিয়ম হেসে ফেললে। মুখভাবের কৃত্রিম গাম্ভীর্য তার খসে পড়ল। বললে, পড়াতে বলছি কেন জান বাবা? মেয়ে ভালোয় ভালোয় সেরে উঠেছে, খোদার কাছে হাজার শোকর। তুমিও এখন কিছুদিন থাকছ এখানে। শিক্ষার দিকে টান একটা আছে ওর, তুমিও দেখেছ। এই সময়ে যদি দু তিনটে মাস সেই টানে মনটা খানিকটা ডুবিয়ে রাখতে পারে তাহলে হয়তো ঐ অবস্থায় আর পড়বে না মেয়েটা। অথচ শিক্ষাটাও তার এগিয়ে যাবে।

এটা অবশ্য তার মনের কথাই। সেই সঙ্গে আরো উদ্দেশ্য রহীমের সান্নিধ্য দেওয়া।

রহীম। আচ্ছা মামীমা, ও এমন সেরে উঠল কী করে বলুন তো? ওকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, খুশীও হলাম তেমনি।

মরিয়ম। চিকিৎসাটা তুমিই করেছ।

রহীম। ঠাট্টা করবেন না মামীমা। সত্যি কথাটা বলুন না।

মরিয়ম। মা কি ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করে রে বোকা ছেলে। আমি সত্যি কথাই বলছি বাবা, শুধু তোমাকেই বলছি। তুমি ওর সম্বন্ধে যে সন্দেহের কথা আমাকে বলেছিলে সেটা ধরেই আমি ওকে তোমার উপদেশ শুনিয়ে বলি স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কর। তাই নিয়ে আমার অনেক কথা হয় ওর সঙ্গে। শেষে ও রাজি হয়, বলে চেষ্টা করবে। আমি বুঝেছি ওর সেরে ওঠা সেই চেষ্টারই ফল। তবে একথা কাউকে বলিনি, উপদেশটা তোমারই ছিল বলে তোমাকেই বললাম।

শুনে রহীম মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আবেগের চঞ্চলতা অনুভব করলে। তখনি তাকে জোর করে চেপে রেখে বললে, যে কারণেই হ'ক মামীমা, ও কিন্তু মনের জোর দেখিয়েছে বলতে হবে। নইলে ওর যা অবস্থা হয়েছিল, এত শীঘ্রি সেরে ওঠবার কথা নয়।

একটু পরে বললে, যাই হ'ক, ওর পড়ার জন্যে আমি বিকালের দিকে আসব, তবে যেদিন বিকালে তেমন কাজ থাকবে সেদিন সকালেই আসতে চেষ্টা করব। কী পড়বে সেও ওর সঙ্গে বসে ঠিক করে নিতে হবে।

কয়েক দিন পরে বিকালে রহীম যেতেই জাহানাআরা বললে, আব্বার অসুখ বেড়েছে, আসুন দেখবেন।

সে হাতেমের ঘরে ঢুকে দেখলে হাতেম একখানা বালাপোশ মুড়ি দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে আর মরিয়ম পাশের চেয়ারে বসে আছে উদ্বিগ্নভাবে। মরিয়ম তাকে দেখে আস্তে আস্তে বললে, পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে আর জ্বর এসে গেছে।

রহীম কপালে হাত দিয়ে দেখলে বেশ জ্বর। জিগ্যেস করলে, কতক্ষণ হ'ল জ্বরটা এসেছে?

এক ঘণ্টাও হবে না, বললে মরিয়ম। আমি কী করি বাবা বলতো। ভালো ডাক্তার ডাকা দরকার। কোন্ ডাক্তারকে ডাকতে হবে তাও বুঝি না। তুমি এই সময়ে আসবে ভেবে অপেক্ষা করছিলাম।

রহীম ইতিমধ্যে হাতেমের অসুখের খবর জানবার পর কথা প্রসঙ্গে তার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের লক্ষণ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করেছিল। হাতেমের রোগের লক্ষণ দেখে তার ধারণা হ'ল শীঘ্রি অপারেশন করা প্রয়োজন। বললে, হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। দেরি করলে চলবে না। বমি হয়েছিল কি?

না, বমি হয়নি, বললে মরিয়ম। হাসপাতালের চেয়ে ডাক্তার ডাকাই তো ভালো হ'ত।

হাতেম বললে, একজন ভালো ডাক্তারকে খবর দাও, তিনি বলেন তো তখন হাসপাতালে যাব।

না মামু, আপনি এখন কিছু বলবেন না, হাসপাতালেই যাওয়া দরকার। মামীমা, আপনি কিছু দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে তৈয়ের হোন, আর টাকা কিছু নিন। আমি হাসপাতালে টেলিফোন করে

খোঁজের জন্যে খবর নোব, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে আসব, বলে রহীম আর কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

হাতেম বললে, আগে একজন ডাক্তার ডাকাই উচিত ছিল।

চল, হাসপাতালেই যাওয়া যাক, বললে মরিয়ম। ছেলেটা হয়তো কিছু একটা ভেবেছে, না হলে এমন তাড়াহুড়ো করত না।

ধাপা এলাকা। টেলিফোন করবার জন্য অনেকটা যেতে হ'ল। আরো কিছু দূর যাবার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কাজেই তার ফিরতে দেরি হ'ল। মরিয়ম ততক্ষণে প্রস্তুত হয়েছে। রোগীকে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না ; দোহারা শরীর, রহীমের একার ক্ষমতায় কুলোল না। হাতেম বললে, আমি তোমার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে পারব আস্তে আস্তে।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হ'ল। রহীমের পরিচিত হাউস স্টাফের একজন ডাক্তার তাকে বললে, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে খুব ভালো করেছেন। দেরি হলে কেস খারাপ হতে পারত। দেখি সার্জন কী বলেন। সম্ভব হলে কালই অপারেশন করতে হবে।

ভর্তি করার পর রোগীর কেবিনে বসে মরিয়ম বললে, বাড়িতে একটা খবর দিতে পারলে ভালো হ'ত কিন্তু তা হলে তোমাকে যেতে হয়।

এখন যাওয়া চলবে না মামীমা, বললে রহীম। এখন হয়তো মাঝে মাঝে ডাক্তার বা নার্স আসবে, এলে কথা বলার দরকার হবে। তবে একটু পরে লোকমানকে খবর দিতে চেষ্টা করব। তার প্রেসের পাশে টেলিফোন আছে, বলে দিলে তারা খবর দেবে।

লোকমান খবর পেয়ে তখনি আসতে পারলে না, কাজ সেরে সন্ধ্যার পর এল। রহীম তাকে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনার কথা বললে, ভর্তি করার আগে ডাক্তাররা দেখে কী মন্তব্য করেছেন তাও জানালে। মরিয়ম আগে শোনেনি সে কথা। এখন শুনে বললে,

তাহলে তুমি তো ঠিক কাজই করেছ বাবা। আমি ভাবছিলাম, উনিও বললেন আগে ডাক্তার ডেকে দেখানো উচিত ছিল।

রাত্রে তো একজন থাকা দরকার এখানে, বললে লোকমান।

রহীম বললে হ্যাঁ, থাকতেই হবে। আমি থাকব, তুমি একটু বোস, আমি বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসি। তারপর তুমি মামীমাকে নিয়ে যাবে। তবে আমার মেসে একটু খবর দিতে হবে যে রাত্রে আমি ফিরব না। নইলে তারা ভাবনা করতে পারে গাড়ি চাপা পড়লাম কি না।

মরিয়ম বললে, তুমি সারা রাত জাগতে পারবে কেন? আমি থাকব রাতে, তুমি বরং খানিক পরে চলে যেয়ো।

অপারেশনের পর অনেক রাত জাগার দরকার হবে মামীমা, আজ আমি থাকলেই চলবে, রহীম বললে। কিন্তু মরিয়ম কিছুতেই রাজি হয় না দেখে শেষে হেসে বললে, মামীমা আপনার বাড়িতে আপনার কর্তৃত্ব মেনে নোব, কিন্তু এখানে আমার কথা শুনতে হবে।

সে খেয়ে এলে লোকমান মরিয়মকে নিয়ে বাড়ি গেল। রহীম তাকে বলে দিলে, তুমি কাল খুব সকালেই একবার আসবে। আমি তাহলে তোমাকে রেখে বাসায় গিয়ে কাজকর্ম সেরে সময় মতো আসতে পারব। অপারেশন কালই হবে মনে হয়।

তাই হ'ল। রহীম ও মরিয়ম অপারেশনের সময় বাইরে বসে থাকল। হাউস স্টাফের পরিচিত ডাক্তার খবর দিলে অপারেশন খুব ভালো হয়েছে। লোকমান দুপুরের পর খবর নিতে এসেছিল। পরে সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পূর্বে নূরজাহান ও জাহানআরাকে নিয়ে আবার এল।

দুজন নার্স নিযুক্ত করা হ'ল রাতের ও দিনের জন্য। তাহলেও মরিয়ম ও রহীম থাকল রাত্রে, জেগেই থাকল। তার মধ্যে রোগীর জ্ঞান ফিরেছে।

সকালে একটু বেলা হলে দিনের নার্স আসার পর তারা ফিরে গেল। আবার এল বিকালে, দুই মেয়েও এল। সন্ধ্যার পর

লোকমান এলে রহীম বললে, মামীমা আপনি ওদের সঙ্গে চলে যাবেন।

তাহলে একলা আবার আসব কী করে বাবা?

আমি খেয়ে আসবার সময় নিয়ে আসব, রহীম জবাব দিলে।

তুমি আজও রাত জাগবে?

জাগি না জাগি থাকতে হবে তো।

প্রতিদিন রাত্রেই রহীম ও মরিয়ম এসে থাকে রোগীর কেবিনে। রহীম সকালে বাসায় ফিরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমোয়। তারপর খেযে একটু বিশ্রাম করে গিয়ে জাহানআরাকে সাহায্য করে তার পড়ার ব্যাপারে। কিন্তু সে কাজটা এই অবস্থার মধ্যে দু জনের দিক থেকেই ঠিকভাবে চলে না।

কয়েকদিন পরে নার্স রাখার আর প্রয়োজন থাকল না। স্টাফ নার্স দিয়েই চলে। তবে রাত্রে মরিয়ম ও রহীম থাকে প্রতিদিন। আর বিকালে নূরজাহানরা দুই বোনে আসে, লোকমান এসে তাদের নিয়ে যায়। তারা বাড়ি ফিরে যাবার আগে মরিয়ম ও রহীম খেয়ে চলে আসে। এখন মরিয়মের অনুরোধে রহীম সন্ধ্যার পর হাতেমের বাড়িতেই খেয়ে নেয়।

রহীম সারারাত ঠায় জেগে বসে থাকে, একদম চোখে পাতায় করে না। বই নিয়ে পড়ে, আর রোগীর জন্য যখন যা প্রয়োজন সে কাজগুলো করে। হাতেম ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখে রহীম জেগে রয়েছে, কখনও বা দু চারটে কথাও বলে। জেগে থাকে মরিয়মও, পড়েও, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। ঘুম ভেঙ্গে গেলে রহীমকে জেগে থাকতে দেখে লজ্জিতভাবে বলে, একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল বাবা।

আপনি ঘুমোন না মামীমা, আমি তো রয়েছি জেগে, বলে রহীম। দিনে তো ঘুমোতে পান না, রোজ রোজ রাত জাগবেন কী করে?

একদিন লোকমান বললে, কাল রবিবার আছে, আজ আমি রাত জাগতে পারব, তোমার দরকার নেই।

চল আমিও যাই, সেখানেই না হয় চেয়ারে ঠেস দিয়ে ঘুমোব আজ, বললে রহীম।

রাত একটু বেশি হলে দেখা গেল লোকমানের মাথাটা চেয়ারের একদিকে ঝুলে পড়েছে। রহীম যেমন থাকে তেমনি জেগে থাকল। ভোরে ঘুম ভাঙ্গলে লোকমান দেখলে তারা দুজনেই জেগে বসে আছে। তারপর আর কোন দিন সে রাত জাগতে আসেনি।

মাসখানেক হাসপাতালে থাকার পর সুস্থ অবস্থায় হাতেমকে তারা বাড়ি নিয়ে গেল। তখন একটু একটু চলাফেরা করতে পারে সে। ডাক্তারের পরামর্শ হ'ল রোগীকে কিছুদিন বাইরে কোথাও রাখলে ভালো হয়, তাহলে সুস্থ হয়ে উঠবে জলদি।

মরিয়ম ও রহীমের চোখে কালি পড়েছে, দুজনেই একটু রোগা হয়ে গেছে। হাতেমকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে রহীম এসে বারান্দায় বসলে নূরজাহান সপ্রশংস দৃষ্টিতে বললে, আশ্চর্য মানুষ আপনি ভাই! একটানা এতদিন রাত জাগলেন, তবু যেন শরীরে ক্লান্তি নেই আপনার। এদিকে তো দেখছি রোগা হয়ে গেছেন, চোখে কালি পড়েছে।

ও কিছু নয় নূরজাহান, রাত জাগলে অমন একটু হয়, রহীম হেসে বললে। দেখবে দু-চার দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর মামীমাও তো জেগেছেন, অথচ দিনেও ঘুমোননি। আমি তবু তো দিনে ঘুমিয়েছি রোজ।

মরিয়মকে বললে, মামীমা, এখন যদি আমার কোন কাজ না থাকে তো দু-চারদিন আমাকে ছুটি দিন। এখন আমি বাসায় গিয়ে গোসল করে খেয়ে ঘুমোব, দু তিনদিন ধরে সমস্ত বাকিপড়া ঘুমটা সারতে হবে। তাহলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারব। এর মধ্যে দরকার পড়লেই খবর দেবেন। রহীম যাবার সময় তাকে একটা কাগজ দিলে। তাতে এই এক মাসে তার হাত দিয়ে যা খরচ হয়েছে

তার খুটিনাটি হিসাব লেখা আছে। সেটাই দেখবার আগেই মরিয়ম বললে, এখানেই দুটো খেয়ে ঘুমোলে পারতে।

না মামীমা, বাসাতেই যাই এখন, বলে সে হাতেমের নিকটও বিদায় নিতে গেল। তার খাটের পাশের চেয়ারে বসে বললে, মামু, আমি এখন বাসায় যাচ্ছি, দু তিন দিন হয়তো আসতে পারব না, ঘুমোতে হবে, বলে সে হাসলে।

খোদা তোমার ভালো করুক বাবা, বলে হাতেম তার পিঠে একটা হাত রাখলে। তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, সে আর কোন কথা বলতে পারলে না। সে হাতটা সরিয়ে নেবার পর রহীম আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেল।

তারপরই মরিয়ম ঘরে ঢুকে দেখলে হাতেমের চোখে জল। সে চেয়ারটাতে বসলে হাতেম বললে, ঐ ছেলেকে মেয়ে দিতে আমার মন সরছিল না, আমার মনটা কত ছোট বল তো! আবার জল গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। মরিয়ম তার চোখ মুছে দিয়ে বললে, তার জন্যে দুঃখ করছ কেন? মন সরলেই তো তখুনি বিয়ে হয়ে যেত না। আর বিয়ের প্রস্তাব সে তো দেয়নি যে তোমাকে ভাবতে হবে সে যদি কিছু মনে করে।

সে কিছু ভাববে না, আমিই ভাবছি সে কথা, অপরাধীর মতো বললে হাতেম। এখন আমি বুঝতে পারছি আমি তাকে চিনতে পারিনি, তুমি ঠিক চিনেছিলে। সে যদি রাজি হয়, মেয়েও রাজি হয়, এ বিয়ে আমি দোবই। ওদের মতটা জানা দরকার।

বেশ তো দিয়ো বিয়ে। সে তো খুশীর কথা, বললে মরিয়ম। ভালো করে সেরে ওঠ আগে, তখন সব হবে। মত জানবার ব্যবস্থা করব আমি।

কথাটা তোমায় না বলে পারছিলাম না, বললে হাতেম। হাস-পাতালে পড়ে কত-বার ভেবেছি, তোমাকে বলতে পারিনি। বলব কখন? তার-সামনে তো বলতে পারি না।

মরিয়ম রহীমের হিসাবের কাগজটা দিলে হাতেমের হাতে। সে দেখে বললে, ও বাবা এ যে পাই পয়সাটিরও হিসেব দেখছি। কী দরকার ছিল লেখবার ? তাকে কী কেউ অবিশ্বাস করতে পারে ?

রাত্রে মরিয়ম বললে, ডাক্তার বলেছে এখন তোমাকে কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জে যেতে হবে।

চেঞ্জে আর যাব না, এখানেই কিছুদিনের মধ্যে সেরে যাব।

কেন যাবে না ? টাকা খরচ হবে ? সারা জীবন খেটে উপায় করেছ কার জন্যে যদি এই অবস্থাতেও খরচ না করবে ?

হাতেম বললে, না খরচের জন্যে ভাবছি না, কিন্তু যাব কী করে বলতো কাউকে সঙ্গে না পেলে ? পাবই বা কাকে ? লোকমান যেতে পারবে না তার কারবার ছেড়ে। একমাত্র ভরসা রহীম, যদি সে যেতে পারে। কিন্তু পারলেও এই একটা মাস সে যা করেছে তারপরে আবার তাকে বলা যায় না চল আমাদের সঙ্গে।

কেন বলা যাবে না ? তোমাকে বলতে হবে না, আমিই বলব। কী বলব জান তাকে ? মরিয়ম হেসে বললে, বলব বোকা ছেলে, আমার সোনার চাঁদ মেয়েকে যদি বিয়ে করতে চাস তো চল আমাদের সঙ্গে।

হাতেমও হেসে উঠল। বললে, তাই বলবে তাকে, কেমন ? বেশ তাই ব'লো। তবে আমার মেয়ে যদি সোনার চাঁদ হয়, সেও হীরের টুকরো। আমি খালি ভাবি কী খেদমতটাই করলে সে আমার এই একটা মাস। হাসপাতালে নিয়ে গেল সে জোর করে, আমাদের কথা না শুনেই। তখন না নিয়ে গেলে হয়তো বিপদ ঘটত আমার। আর এত রাত জাগলে, তবু কোন কাজে কখনো না বলতে শুনেছ ? যাই হ'ক, সে যদি যেতে পারে তো যাবার ব্যবস্থা ক'রো।

রহীমের দেখা পাওয়া গেল তৃতীয় দিন বিকালে। নূরজাহান বললে ঘুম কেমন হ'ল ভাই আপনার ?

ওঃ সে আর বোলো না। পরশু এখান থেকে গিয়ে খেয়েই

ঘুমিয়েছি, উঠে রাত্রে খেয়ে আবার ঘুমিয়েছি। ঘুম তো ঘুম মড়ার মতো ঘুম। কাল খাওয়া দাওয়া ছাড়া সারা দিনরাত ঘুমিয়েছি। আজও সকালে ঘুমিয়েছি। দুপুরে উঠে মনে হ'ল এবার শরীর ঝরঝরে হয়েছে, আর ঘুমের দরকার নেই। জীবনে কখনো এত ঘুমোইনি।

জীবনে কখনো এত রাতও জাগেননি। তাও বলুন।

হ্যাঁ, তা সত্যি। মামুর শরীর কেমন ?

ভালো আছেন। যান না ভেতরে।

রহীম গিয়ে হাতেমের সঙ্গে দেখা করলে। মরিয়ম রান্নাঘর থেকে এসে বললে, ঘুম হয়ে গেল বাবা ? শরীর বেশ ভালো আছে এখন ?

হ্যাঁ মামীমা, দুটো দিন প্রাণপণে ঘুমিয়েছি। এখন আর শরীরে কোন গ্লানি নেই। আপনি কেমন আছেন ?

আমি ভালোই আছি বাবা। আচ্ছা, তোমার সাথে একটু কথা আছে। চল বাইরেই বসিগে, বলে মরিয়ম গিয়ে বারান্দায় বসল রহীমের সঙ্গে।

মরিয়ম। তোমার এখন কী কাজ বলতো ?

রহিম। এখন বর্ষায় আমার এলাকায় কাজ কিছু নেই। এখানে কাজের মধ্যে কিছু লেখাপড়া করা আর মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা করা। পুলিসের কড়া নজর বলে আলোচনাও খুব কম হয়। কিন্তু কেন জিগ্যেস করছেন একথা ?

মরিয়ম। এই একটা মাস যা করেছ তার কথা তুলে তোমাকে আর ছোট করতে চাই না এখন মাসখানেক সময় দিতে পারবে কি আমাদের জন্যে ?

রহীম। কী করতে হবে বলুন ?

মরিয়ম। ডাক্তার তো বাইরে যাবার কথা বলেছে। তা তুমি ছাড়া আর তো কাউকে সঙ্গে নেবার মতো লোক দেখছি না।

রহীম। কোথা যেতে চান ?

মরিয়ম। কিছু ঠিক হয়নি। নাম তো শুনি অনেক—মধুপুর,

গিরিডি, দেওঘর, আরো কী কী। চোখে কখনো দেখিনি বাবা। তুমিই বল না কোথা গেলে ভালো হয়।

রহীম। আমিও কখনো যাইনি ওসব জায়গায়।

শেষে মেয়েদের সুদ্ধ ডেকে নিয়ে হাতেমের ঘরে বসে স্থান নির্বাচন করা হ'ল। কেউ কিছু জানে না; যে নামটা সবচেয়ে বেশি শোনা যায় সেটাই ঠিক করা হ'ল—মধুপুর।

কে কে যাবে সেখানে? প্রশ্নটা উঠল। হাতেম, মরিয়ম ও রহীম তো যাচ্ছেই, মেয়েদের মধ্যে জাহানআরা আর ছোকরা চাকরটা। নূরজাহানের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। লোকমান থাকছে, সংসার দেখতে হবে। তার যাবার ইচ্ছা অবশ্য খুবই কিন্তু উপায় নেই। সেও তা বুঝলে।

কথা হ'ল প্রথমে রহীম গিয়ে বাড়ি ঠিক করে আসবে, তারপর সকলে যাবে।

লোকমান বাড়ি এসে শুনলে কথাটা। শুনে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ল কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারলে না। তার মনে হ'ল চেঞ্জে না যাওয়াই উচিত ছিল, কারণ তাহলে রহীম কলকাতায় থাকত এবং সে তার সাহায্য পেত প্রেসের কাজে। এই একমাস কাটল হাসপাতালে, আর একমাস যাবে মধুপুরে। ঝড়তি পড়তিও যাবে কিছুদিন। কাজেই এ যাত্রা রহীমের সাহায্য সে মোটেই পাবে না।

আক্রোশটা গিয়ে পড়ল রহীমের উপর। যেন অপরাধটা তারই —হাতেমের রোগ এবং চেঞ্জে যাবার প্রয়োজন সে বন্ধ করলে না কেন? ভাবতে ভাবতে তার কল্পনা এগিয়ে যেতে লাগল: সেই এখন হবে হাতেম ও মরিয়মের প্রিয়পাত্র, জাহানআরার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাও ঠেকে থাকবে না নিশ্চয়। সে এখন তার মামু-মামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে না জানি আরো কী করে ফেলে।

সতর

মধুপুর শহরের এক কিনারায় রাস্তার ধারে ছোট একটা বাড়িতে থাকল তারা। সময়টা বর্ষা। কাজেই বেশী বাইরে বেড়াতে যাবার সুবিধা পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি না থাকলে যেতে পারত।

বাড়ির ঘেরার মধ্যে ইমারতটা ছোট হলেও উঠন বেশ বিস্তৃত। খোলা চৌরস বেলে মাঠের মতো। অল্প অল্প ঘাস আছে। বিভিন্ন জাতের ফুলের গাছ ও ঝাড় উঠনের উপর খানিকটা শৃংখলার সহিত ছড়ানো আছে। একদিকের কোণে আছে একটা মাঝারি আকারের আম গাছ। উঠনে হাতেমের পক্ষে হেঁটে বেড়াবার সুবিধা যথেষ্ট।

গতমাসে জাহানআরার শিক্ষার দিক থেকে প্রায় কোনই অগ্রগতি হয়নি। তার খেসারত আদায় হ'ল এখানে। সময়ের অভাব নাই। রহীমকে বাইরে থেকে এসে পড়াতে হয় না। কাজেই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রচুর সময় পাওয়া যায়। রান্নাঘরের কাজও এখানে অনেক কম, এবং সে কাজ থেকে মেয়েকে রেহাই দেবার জন্য মরিয়মই অধিকাংশ দায়িত্ব নেয়, জাহানআরা প্রায় জোর করে মাকে সরিয়ে দিয়ে কিছু কিছু করে। রহীমেরও কাজ বলতে কেবল একবার করে বাজার যাওয়া, তবে বাজারটা বেশ দূরে।

বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা সকলেরই। কিন্তু হাতেম প্রথম দিকে বাড়ির বাইরে যেত না, পরের দিকে অল্প অল্প যেতে পারত। বৃষ্টির ফাঁকে অন্যেরা যাক সেটা চাইত। বৃষ্টি যে সময়টা থামে তখন হাতেম বলে মেয়েকে, এই বেলা তোরা ঘুরে আসতে পারতিস। রহীমকেও বলে সে কথা। রহীম কিছু না বলে এড়িয়ে যায়, একা জাহানআরার সঙ্গে কিছুতেই বেরোয় না। মরিয়ম সুদ্ধ গেলে তবেই

যায়। হাতেম ও মরিয়ম দুজনেই লক্ষ্য করলে প্রায় প্রথম থেকেই যে রহীম একটি বারের তরেও জাহানআরাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোল না। শুধু বেড়াবার জন্য সে একাও যায় না, পাছে জাহানআরাকে সঙ্গে না নেওয়াটা তার ইচ্ছাকৃত ব্যাপার বলে তার মা-বাপের চোখে ধরা পড়ে যায়। তাও তাদের দৃষ্টি এড়াল না।

জাহানআরাও অবশ্য দেখছে এবং বুঝছে সব। তার ধারণা তার মা রহীমকে এখনো বিয়ের কথা কিছু বলেনি, সেই কারণেই সে তাকে বেড়াতে যাওয়া সম্বন্ধে এড়িয়ে যায়। কিন্তু তার বাপকে বলা এবং তার মত নেওয়া হয়েছে কিনা বুঝতে পারে না, যদিও মাঝে মাঝে ধারণা করে যে তার মত পাওয়া গেছে, নইলে একা তাকে নিয়ে বেরোবার জন্য রহীমকে বলা হ'ত না। কিন্তু তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মনে করে হাতেমের অসুখের কারণে হয়তো কথাটা তার কাছে তোলা সম্ভব হয়নি।

রহীম অবসর পেলে পড়াশুনা করে, লেখার চর্চাও করে কিছু কিছু। জাহানআরা যে সময়ে একা তার কাজ করে, রহীম তাকে যে সমস্ত কাজ দেয় সেই কাজ যখন করে, তখন রহীম ফুসরত পায়। জাহানআরার শিক্ষার মধ্যে এখানে প্রধান অংশ হ'ল বাংলা লেখা, প্রবন্ধের ধরনে রচনা লেখার অভ্যাস করা, আর ইংরেজী ভাষাটা যতটা সম্ভব আয়ত্ত করা। তাছাড়া রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাঝে মাঝে পড়ে নেয়।

এমনি অবসরকালে সেদিন একটা লেখার কাজ নিয়ে বসেছিল রহীম। মরিয়ম আস্তে আস্তে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল; জাহানআরা তখন রান্নাঘরে। রহীম মুখ তুলে চেয়ে বললে, কী মামীমা, বসুন।

মরিয়ম। তোমার কাজে ব্যাঘাত হ'ল না তো?

রহীম। না না, কিছু না।

মরিয়ম। মায়ের একটা কথা শুনবে বাবা?

রহীম। আপনাকে মামীমা না বলে মা বললে বেশি খুশী হন?

মরিয়ম। তা হই না? সে কথা তুমি জিগ্যেস করছ?

রহীম। মা বলে ডাকলে কিন্তু আপনি বলব না, তুমি বলব।

মরিয়ম। সে তো আরো ভালো হবে।

রহীম। বেশ, তাই কথা থাকল। কিন্তু কী বলছিলেন?

মরিয়ম। বলতে সংকোচ হচ্ছে, তবু বলছি। আমার একান্ত ইচ্ছে তুমি জাহানআরাকে বিয়ে কর।

রহীম তার হাসি মুখ গম্ভীর করে মরিয়মের দিকে চেয়ে রইল। একটু পরে বললে, আমার যে বিয়ে করাই চলে না—কোন মেয়েকেই—শুধু জাহানআরার কথাই নয়।

মরিয়ম। কেন চলে না বাবা? একটু খুলে বলবে?

রহীম। প্রথম কথা, আমি পয়সা রোজগার করি না, নিজেরই খাওয়া-পরার কোন পাকা ব্যবস্থা নাই, কাজেই সংসার চালাবার কথা চিন্তাই করতে পারি না। দ্বিতীয় কথা, আমার রাজনীতির কারণে পুলিসের নজর থাকবে আমার ওপর, যে কোন দিন ধরে নিয়ে তারা জেলে আটকে রাখতে পারে। এরকম অনিশ্চিত জীবন যার তার পক্ষে কি বিয়ে করা সাজে? এমন লোকের সঙ্গে বিয়ের ফাঁসে কোন মেয়েকে জড়িয়ে ফেললে তাকে সরাসরি খুন করা না হলেও দগ্ধে মারা হবে না কি?

মরিয়ম। যদি তোমার সংসার চালাবার জন্যে খরচের দায় থেকে তুমি রেহাই পাও, জাহানআরা নিজেই যদি তার পাকা ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে তোমার প্রথম আপত্তি খাটবে না। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে ভরসা আছে আমার। আর তোমার জেল-পুলিসের বিপদকে সে যদি ভয় না করে, সেটুকু চেতনা যদি তার থাকে যা তুমিই দিতে পার তাকে, তাহলে তোমার দ্বিতীয় আপত্তিও নাকচ হয়ে যাবে। সেসব কথা জেনে শুনেও যদি সে তোমার সঙ্গে বিয়ের ফাঁসে জড়িয়ে পড়তে চায় তাহলে কী বলবার থাকবে তোমার?

রহীম হেসে বললে, মনে হচ্ছে আপনি একটা বোঝাপড়ার জন্যে আমার সঙ্গে লড়বেন বলে তোয়ের হয়ে এসেছেন।

মরিয়মও হাসলে। বললে, তোমরাই তো লড়াইয়ের কথা বল বেশি। কাজেই আমাকেও সেজন্যে তোয়ের হতে হয়েছে। এখন বল আমার কথার জবাবে তোমার কী বলবার আছে?

রহীম। বলবার কথা অবশ্য আছে। আর্থিক বিষয়ে হয়তো বলবেন আপনাদের সম্পত্তির অদ্ধেকের ভবিষ্যৎ মালিক সে। তার মধ্যেও বিবেচনা করার বিষয় আছে। কী সম্পত্তি, কী তার আয় সে কথা বাদ দিয়েও ভাবতে হবে ছেলেপিলে মানুষ করবার যোগ্যতা আমার না থাকলে আমার প্রতি তার কতটুকু শ্রদ্ধা থাকবে। আর রাজনীতিক বিপদ সম্বন্ধে সে কী বোঝে আর কী ভাবে তাও ভালো করে জানা দরকার। অনভিজ্ঞ মনের আবেগ নিয়ে যে কাজ করা যায় তার পরিণাম অনেক সময় ক্ষতিকর হয়। আরো বলবার বিষয় আছে।

মরিয়ম। বল আর কী আছে বলবার।

রহীম। আপনি যে প্রস্তাব করেছেন সে কেবল আপনারই ইচ্ছা, না তার ইচ্ছা অনুসারে তার তরফ থেকে আপনি কথা বলছেন? তাছাড়া এ বিষয়ে মামুর মতামত কী তাও আমি জানি না।

মরিয়ম। ইচ্ছা দুজনেরই। তুমি আমার মনের কথা জান, তাই আমার পক্ষে বলা সহজ। তোমাকে আমি পেতে চেয়েছিলাম ছেলের মতন আপন করে। কিন্তু তোমার-আমার অন্তরের সম্পর্ক যাই হ'ক, সমাজের দিক থেকে তাতে বাধা ছিল। তাই ভেবেছিলাম মেয়ের বিয়ে দিয়ে তোমাকে টেনে নোব। কিন্তু আমার সে ইচ্ছাও বাধা পেলে; জাহানআরা দিক থেকে নয়, কারণ তাকে কখনো বলাই হয়নি। পরে জানলাম সেই তোমাকে চায়। কিন্তু চাইলেও সে কথা প্রকাশ করতে পারেনি। আর তোমার দিক থেকে কোন রকম আভাস ইঙ্গিত না দেখে তার আশা ভঙ্গ হয়। তাই কাউকে কিছু বলবার সাহস না পেয়ে নিজের মনের অশান্তিতে শুকিয়ে মরছিল। এই ছিল তার অসুস্থতার কারণ। আমি সেটা জানতে পেরে তাকে ভরসা দিই আমি তার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করব— তোমার ওপর জোর খাটিয়ে নয়, তোমাকে বুঝিয়ে।

রহীম। মামুর মতটা তো জানতে পারলাম না।

মরিয়ম। হ্যাঁ, তাঁর অমতই প্রথমে আমার ইচ্ছায় বাধা হয়েছিল। পরে মেয়ের ইচ্ছা জেনে তাঁকে সে ইচ্ছার কথা না জানিয়েও যখন আবার প্রস্তাব করি, তিনি নিমরাজি হন, ভেবে দেখবেন বলেন। কিন্তু মত দেবার আগেই তাঁর হ'ল অসুখ। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি আমাকে যা বলেন তাতে শুধু আমার প্রস্তাবে রাজিই হননি, আমি রাজি না থাকলেও হয়তো বিয়ে দিতে চাইতেন। তিনি তোমার তারিফ করে যা বলেন সে কথা তোমার সামনে বলে তোমায় বিব্রত করব না।

রহীম তার এই ছন্নছাড়া ধরনের রাজনাতিক জীবনকে গুরুত্ব দেয়, সমস্ত রকম বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও সেই জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায় না। তাই তার এই দীর্ঘদিনের সচেতনভাবে বেছে নেওয়া কাঁটাপথে গতানুগতিক সংসার ধর্মের কোমল আস্তরণকে কেবল একটা বেমানান ফাঁকির ব্যাপার বলেই মনে করে না, একটা নীরব অনিষ্টকর প্রলোভনের মূল বলে ধরে নেয়। তাই এই গতানুগতিক ব্যবস্থাকে সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

বললে, বড্ড ফাঁপরে ফেললেন মামীমা।

মরিয়ম হেসে বললে, আমি এখনো কি তোমার মামীমা?

রহীম। হ্যাঁ, এখনো। কারণটা পরে বলব। আপনার যুক্তিগুলো খণ্ডন না করেও আমি এখনো ভাবছি বিয়ে করাই আমার উচিত হবে না। আপনাকে মা বলে ডাকবার অধিকার আর সুযোগ আমার কাছে কত মূল্যবান তা আপনাকে বলা দরকার মনে করি না। জাহানআরাকে আমি যতটা দেখেছি, চিনেছি তাতে আমার মতো মানুষের পক্ষে মেয়ে হিসেবে সে একটি রত্ন। তা সত্ত্বেও একমাত্র পড়াশুনার ব্যাপারে ছাড়া আমি সব সময়ে তার একক সঙ্গ এড়িয়ে চলেছি। এখানেও, আপনাদের বলা সত্ত্বেও, তাকে নিয়ে একা যেরুইনি। এড়িয়েছি এই ভেবে যে তাতে দুর্বলতা আসতে পারে— আমার দিক থেকেও পারে, তার দিক থেকেও পারে। কিন্তু এখন

দেখছি অবস্থা আরো জটিল হয়ে পড়েছে ; সে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং আপনি তাকে আশ্বাসও দিয়েছেন।

মরিয়ম। তার ইচ্ছার গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার আশ্বাসকে তুমি সে গুরুত্ব দিয়ো না। আমি এখনো তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব কিন্তু তোমার রাজনীতিক জীবনে বাধা দিতে চাইব না। তার ইচ্ছার কথা বিবেচনা করে যদি তোমার মনেও সাড়া জাগে তাহলে অন্তত সেই ইচ্ছার কদর হবে তোমার কাছে, এটা আমি আশা করি।

রহীম একটু ভেবে নিলে। তারপর চিন্তিতভাবে বললে, মামীমা, এখন মনে হচ্ছে এতদিন যেটা এড়িয়েছি সে কাজটা করতে হবে আমাকে। এই বিষয় নিয়ে জাহানআরার সঙ্গে আমার আলাপ করা দরকার। তাকে যতই চিনে থাকি, সে তো অন্য দৃষ্টি নিয়ে চিনেছি। এখন এই বিষয় নিয়ে সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলে তার মন জানতে হবে, দুজনকেই বুঝে দেখতে হবে ভবিষ্যতে কোন সংকট এসে দুটো জীবনকেই, বা অন্তত একটাকেও, বরবাদ করে দিতে পারে কি না।

মরিয়ম। তাতে তো কোন বাধা নেই বাবা। বরং আমিও চাই তোমরা পরস্পরকে চিনে নাও, বুঝে নাও, কোথায় তোমাদের মিল আর কোথায় গরমিল যাচাই করে দেখ। তুমি যখন খুশী আলাপ ক'রো তার সঙ্গে। বলতো এখুনি পাঠিয়ে দিই।

রহীম। না, এখুনি নয়। নিজে একটু ভেবে নিই আগে, পরে আমিই তাকে ডেকে নোব। আজ নয়, কথা বলব কাল।

দীর্ঘ আলাপের মধ্যে রহীমের সমস্ত কথা ধীরভাবে মন দিয়ে শুনলে জাহানআরা। রহীম তার বিয়ে না করার পিছনে কী কী কারণ আছে তা ব্যাখ্যা করলে। তার মধ্যে বিশেষভাবে বললে তার রাজনীতির দিকটা—তার রাজনীতির তাৎপর্য, তার জীবনে সে রাজনীতির গুরুত্ব, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে

তার বিপদের আশংকা, এবং বিয়ে হলে বিবাহিত জীবনে সে বিপদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। মরিয়মের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে তার যে আলাপ হয়েছে তাও বললে সে। আর্থিক দিক থেকে পরিবার প্রতিপালনে তার নিজের অক্ষমতার সঙ্গে যে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা জড়িয়ে থাকতে পারে তারও উল্লেখ করলে।

অনেক সময় দেখা যায়, শেষের দিকে বললে রহীম, অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা রোম্যান্সের মনোভাব থেকে রাজনীতির দিকে বা কোন রাজনীতিক কর্মীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে যে সমস্ত সমস্যা বিবাহিত জীবনে দেখা দিতে পারে তার বিষয় চিন্তা না করেই তারা বিয়ে করে বসে। পরে সেই সব সমস্যার মুখে পড়ে তার সমাধান করতে না পেরে পরস্পরকে ভুল বুঝতে থাকে। তার ফলে নিজেদের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে বিষময় করে তোলে, সেই আবহাওয়ায় থেকে তাদের সন্তানদের জীবনও জর্জরিত হয়ে উঠে। বিয়ে করে আমরাও এমনি অবস্থায় পড়তে পারি, এ রকম চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।

জাহানআরা তার বক্তব্য প্রথমে একটু আড়ষ্টভাবে বললেও পরে সে ভাব কাটিয়ে উঠল। বললে, আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ রাজনীতি থেকে আসে নি। আমি দেখেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে আপনার ব্যবহার, আপনার শিক্ষা, আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার জন্যে আপনার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা। তখন আপনার রাজনীতির খবর বিশেষ রাখতাম না, রাজনীতি কাকে বলে সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যখন তা শুনলাম আর একটু একটু বুঝতে পারলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত আকর্ষণটাই আরো গভীর হ'ল, আপনার রাজনীতিক কাজকর্মের জন্যেও শ্রদ্ধা বাড়ল। আমার আকর্ষণের গোড়াতে রোম্যান্স ছিল কিন্তু সেটা রাজনীতির কারণে নয়।

রহীম। তোমার জীবনে যদি রাজনীতির, বিশেষ করে আমার রাজনীতির প্রভাব না থাকে, আর আমার জীবনে তার প্রভাবই যদি

প্রধান হয়, তাহলে কি আমাদের বিবাহিত জীবন সুখী বা শান্তিময় হতে পারবে?

জাহানআরা। না হবারই কথা। কিন্তু আপনার রাজনীতি সম্বন্ধে আমি এখন যতটুকু জানি, তাই ধরেই বলছি আমি তো চাই আপনি আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঐ রাজনীতিক জীবনের জন্যে তোয়ের করে নেন—শুধু ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের জন্যেই নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের জীবনের জন্যেও। এটা রোম্যান্সের দিক থেকে বলছি না, ঐ রাজনীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধার কারণেই বলছি।

রহীম। যদি তার ফলে বিপদ আসে তোমার?

জাহানআরা। তখন ভালো করে যাচাই করে আমার পরিচয় নিয়ে দেখবেন আমার মনটা শুধু কাদায় গড়া, না ইস্পাতে তৈরী। এর বেশি এখন কিছু বলতে পারব না, বলা উচিতও হবে না।

রহীমের মনের উপর দিয়ে নিমেষের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের লেখা খেলে গেল, একই সময়ে সে বিস্মিত ও আনন্দিত বোধ করলে। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, বিবাহিত জীবনে শুধু মেয়ে-পুরুষের দুটো জীবন থাকলে হয়তো অসুবিধে বেশি হয় না, কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি করে সন্তান। আমার মতো লোকের জীবনে সন্তান যে সমস্যা এনে দেয় তাকে বলা যেতে পারে দায়িত্বহীন পিতৃত্বের সমস্যা। এ হ'ল আমার কথা। কিন্তু তোমার চিন্তা অন্য রকম হতে পারে।

জাহানআরা। এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানিও না, বুঝিও না। কাজেই এখন কোন জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রহীম। ধর আমি যদি বিয়েতে রাজিও হয়ে যাই কিন্তু বিয়ের আগে ধরা পড়ে জেলে থাকতে হয় আমাকে, তাহলে কী করবে?

জাহানআরা। সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। আপনি জেলে গেলে আমি খুবই দুঃখ পাব অবশ্যই, কিন্তু অপেক্ষা করব।

রহীম। তুমি বরাবর সচ্ছল অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছ, অভাব কখনো দেখনি। কখনো অভাবের মধ্যে পড়লে তা সহ্য করতে

পারবে ?

জাহানআরা। অভাবের মধ্যে পড়লে তাকে মেনে নিতেই হবে। প্রথম প্রথম হয়তো কষ্ট হবে। মনের জোর থাকলে তা সইতেও পারা যাবে। আপনি সম্পত্তির প্রশ্ন তুলেছেন। এ সম্বন্ধে আমার কোন লোভ নেই। মা-বাপের সম্পত্তি আমার একার কাজে না লেগে যদি আপনারও কাজে লাগে, আমি তাতে খুশীই হব বেশি।

রহীম একটু হেসে বললে, আমি এই সমস্ত প্রশ্ন করব জেনে কি তুমি আগে থেকে জবাব তৈরী করে রেখেছিলে ?

আগে থেকে জানব কেমন করে আপনি এই সব প্রশ্ন করবেন ? তবে আমাকে অনেকদিন ধরে অনেক কথা ভাবতে হয়েছে। আমি জানতাম রাজনীতির খাতিরে আপনি আর সবই ছেড়েছেন, রোজ-গারের পথে কেউ আপনাকে টানতে পারেনি—আব্বা, লোকমানভাই কেউ না। আবাদে কাজ করতে গিয়ে আপনাকে অনেক রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাও শুনেছি। সমাজের মামুলী চালচলন রীতি-রেওয়াজকে আপনি মেনে চলেন না। দেখেছি আপনার কথাবার্তার মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে। এ সব কথা বিবেচনা করে আপনার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার কথা চিন্তা করেছি। আজ হয়তো সেই চিন্তারই কিছু কিছু ফল শুনছেন আপনি।

দেখছি তোমাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করে পারলাম না আমি। আমাকে হারিয়ে দিয়ে তুমিই জিতেছ, হেসে স্বীকার করলে রহীম।

জাহানআরাও হেসে জবাব দিলে, তাহলে ভাঙ্গবার চেষ্টা যখন শেষ হ'ল, এবার একবার আমাকে গড়ে নেবার চেষ্টা করুন, তখন দেখবেন আপনিই জিতেছেন। তাতে অবশ্য আমার হার হবে না।

তারপর গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, আমি যে বাজে কথা বললাম না তা আপনি জানেন। আজ আপনি আমাকে যে অবস্থায় দেখছেন, আমার মুখ থেকে যে সব কথা শুনছেন, তার পিছনে যেটুকু চিন্তাধারণা রয়েছে, সেও তো আমাকে আপনার গড়বার ফল। শুধু

আমাকে কেন? বুবুকেও এমনি ভাবে গড়েছেন। মা-ও বলেন, তিনি আপনার কাছে কত জিনিস যে শিখেছেন তার কোন হিসাব নেই। আপনার সামনেই বলছি, সে হিসেবে আপনি নিজে হাতে অনেকখানি আমাদের দুজনকে, অন্তত আমাকে তো বটেই, মানুষ করে তুলেছেন। আমি হয়তো সেই জোরেই আজ আপনার সঙ্গে এই আলাপ করার হকদার হতে পেরেছি।

সবিস্ময় হাসি নিয়ে রহীম কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জাহানআরার মুখের দিকে। ভাবলে মেয়েটা বলে কী! সত্যিই কি এ তার শিক্ষার ফল? তার শিক্ষা যে এর অন্তরকে এমন করে নাড়া দিয়েছে তার খবর তো সে কখনো জানতে পারেনি।

সে বললে, তুমি আমায় অবাক করলে জাহানআরা। আমার ধারণা ছিল তোমাকে আমি চিনি। এখন দেখছি চিনতে অনেক বাকি ছিল। হয়তো আরো বাকি আছে।

জাহানআরা। আমার তারিফ আপনি করছেন, কিন্তু তার কৃতিত্ব আমার নয়, আপনারই। আপনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন সমাজে মেয়েদের স্থান, মেয়েদেব অধিকার পুরুষদেরই সমান। শিখিয়েছিলেন মনের স্বাধীনতার কথা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা। সেই শিক্ষার জোরেই আমি আজ আমার অন্তরের দাবি নিয়ে আপনার কাছে এমন করে হাজির হতে পেরেছি, সে দাবির কথা মুখ ফুটে বলতে পারছি। এখন এই দাবিকে আপনি বাতিল করে দেবেন কোন বিবেচনায় বলুন তো?

কোমল কণ্ঠে রহীম বললে, বাতিল তো আমি করিনি জাহান-আরা। কিন্তু যে ধারণার ওপর আমি নিজের পক্ষে বিয়ে করাই অনুচিত ভেবেছিলাম, সাধারণ অবস্থায় সে ধারণা আমার ভুল নয়। তবে এখন বুঝতে পারছি যে তোমার বা তোমার মতো অন্য মেয়ের ক্ষেত্রে সে ধারণা অচল। আমি যখন মামীমাকে তোমার সঙ্গে বিয়েতে মত দিতে পারিনি, তখন তোমাকে বাতিল করিনি, বাতিল করেছিলাম বিয়েকেই, তোমার বা অন্য যে-কোন মেয়ের সঙ্গে

বিয়েতেই আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তো সে এই কারণে যে আমি কখনো বিয়ের প্রসঙ্গে তোমাকে যাচাই করে দেখিনি। তাই তোমার অন্তরের অনেক পরিচয় জানতে আমার বাকি ছিল যা হয়তো কিছু পরিমাণে এখন জানতে পারলাম। এর পর তোমার দাবিকে বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে না, বরং তুমি যে আমার জীবনে এমনভাবে ধরা দিতে চেয়েছ সেজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

একটু থেমে সে আবার বললে, হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তুমি আমার কথা বিশ্বাস ক'রো জাহানআরা। আমিও তোমার প্রত্যেকটি কথাকে তোমার অন্তরের কথা বলেই বিশ্বাস করব।

জাহানআরা। সেও তো আপনারই শিক্ষার ফল। আপনি কখনো আমাকে মোনাফেকী করতে, মুখে-এক-মনে-আর হতে শেখাননি।

রহীম। সেটা খুব দরকার। তাতে ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে স্পষ্ট বুঝসমঝ থাকবে, পরস্পরকে ভুল বোঝার আশংকা থাকবে না। ভুল বোঝাবুঝি মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে, তার মধ্যে ভাঙ্গন এনে দেয়।

জাহানআরা। সেকথা আপনি অন্য ক্ষেত্রে আগেও বলেছিলেন, মনে আছে আমার।

রহীম। আরো দু একটা কথা বলি। সামান্য কথা। বিয়েটা সাধারণত আমাদের সমাজে যে কায়দায় হয় সে আমার ভালো লাগে না। সিবিল ম্যারেজ আইনেও চলবে না, তাতে সামাজিক দিক থেকে বাধা হবে। শরিয়তের নিয়মে বিয়েতে কেবল ইজাব আর কবলু দরকার, মানে বর নিজে বা তার পক্ষের একজন তার হয়ে কনেকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, কনে তা কাবুল করবে। এইটুকুই যথেষ্ট, কেবল দুজন সাক্ষী আর একটা দেনমোহর লাগবে। এ পর্যন্ত চলবে। তার পরে আত্মীয়বন্ধু ডাকতে চাও, আপত্তি নাই।

জাহানআরা। আর কী বলবেন ?

রহীম। বিয়ে কিন্তু এখনি হবে না, দেরি হবে। ফয়সলাটা আমাদের পাকা হয়ে থাকল, কিন্তু অবস্থাটা আর কিছুদিন দেখতে দাও আমাকে। আর বিয়ের সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করলাম একথা আমরা দুজন আর মামু-মামীমা ছাড়া অন্য কেউ জানবে না এখন। জানবে সকলে আমরা বিয়ের দিন ধার্য করলে তবে। এর মধ্যে তোমার বিয়ের প্রশ্ন যদি তোলে কেউ, তার জবাব হবে—তুমি এখন বিয়ে করতে চাও না, পড়াশুনা করছ। নূরজাহানকে না বলতে পেলে হয়তো তোমাদের কষ্ট হবে। আমার আপত্তি হ'ত না। কিন্তু তাতে কথাটা বেরিয়ে যেতে পারে এখন। বল এসব কথায় রাজি তুমি?

জাহানআরা। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মা-আব্বা কী বলবেন জানি না।

রহীম। তাঁদেরও জানাতে হবে। এখনি মামীমাকে ডাক না একটু।

মরিয়ম জাহানআরার সঙ্গে এসে বসলে রহীম স্নেহভরে ডাকলে, মা!

মরিয়ম কেমন একটু চমকে উঠল। বললে, কী ব্যাটা! কী ঠিক করলে তোমরা?

মা, আপনার পীরেই সিন্নি খেলে শেষ পর্যন্ত। আমি আপনার কাছে হার স্বীকার করছি। মায়ের কাছে ছেলের হার অগৌরবের বিষয় নয়, বলে রহীম হাসলে। রহীম ও জাহানআরা তার পা ছুঁয়ে সালাম করলে।

খোদা তোমাদের ভালো করুক বাবা, বলে মরিয়ম আবেগ ভরে তাদের মাথায় হাত দিলে। এ আমার অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা, খোদা এতদিনে কবুল করলে। তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এখনো দেরি আছে, বলে রহীম তাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য জানিয়ে দিলে তাকে। শুনে মরিময় বললে, তোমরা যা ঠিক

করেছি তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে বড় মেয়েকে বলতে মানা করছ সেই যা মুশকিল।

তাকে বলা যায় তদি সে লোকমানকে না বলে। তা সম্ভব কিনা ভেবে দেখবেন। লোকমানের সঙ্গে আমার কমরেড্‌দের দেখা হয়। কথায় কথায় সে তাদের বলে ফেলতে পারে, তাহলে সব রাষ্ট্র হয়ে যাবে, এই আমার ভয়, বললে রহীম।

তোমার মামুকে বলব তো সব কথা ?

নিশ্চয় বলবেন, এখনি বলবেন, বললে রহীম। আপনাকে যা যা বলেছি সবই জানাবেন। আর, আপনাকে আর একটা কথা বলছি। এখন আর আমি আপনাকে মা বলে ডাকব না, মামীমাই বলব।

তাহলে আমি তোমার মা হতে পারলাম না ? এখুনি যে বললে, মা ?

রহীম জবাব দিলে, আপনি আমার মা হয়েছেন অনেক আগে। আজও আমার মা-ই আছেন। আপনার আমার মধ্যেকার মা-ছেলে সম্পর্ক ঠিকই আছে। অন্য কেউ জানত না, এখন জাহানআরা জানলে। আপনাকে মা বলে ডাকলাম মন চাইলে বলে। কিন্তু এখন মা বলে ডাকলে লোকে সন্দেহ করবে আমাদের বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে বলে, তাই শুধু ডাকটা এখন এড়িয়ে যাচ্ছি। বিয়ের পর ডাকলে লোকে জানবে বিয়ের কারণেই সম্পর্কটা হয়েছে।

আচ্ছা বাবা, তাই হবে, মরিয়ম তার যুক্তি মেনে নিয়ে উঠে গেল। বলে গেল, তোমরা এখানেই ব'স, আমি আসছি।

মরিয়ম হাতেমকে রহীম ও জাহানআরার আলাপের পূর্বেকার কথা সব জানিয়েছিল, জাহানআরার ইচ্ছার কথাও। এখন রহীম যা বলেছে তাকে তাই শোনালে, মামীমার বদলে মা বলার কথা পর্যন্ত।

হাতেম পরম আনন্দের সহিত বললে, ওদের একবার দেখব না আমি ?

মরিয়ম। দেখবে বৈকি। আমি ডাকছি।

হাতেম। একটু থাম, পরে ডাকবে। তার আগে একটা কথা বলি তোমায়। আমার অসুখ যখন হয়নি তখন এ কথা ভাবিনি, অসুখের পর ভাবছি। আমি চাই না আমার অনেক কষ্টের সম্পত্তি আমার মেয়েরা ছাড়া অন্য কেউ ভোগ করে। কিন্তু হঠাৎ আমি মরে গেলে অনেকটা অংশ আমার ভাইপোরা পেয়ে যাবে। তাই এখান থেকে ফিরে যাবার পর যতটা পারি দলিল রেজিষ্ট্রি করে দুই মেয়েকে আর তোমাকে দিয়ে দোব। এখনি নতুন বাড়ি দুটো দুই মেয়ের নামে রেজিষ্ট্রী করে দোব। একথা এখন কাউকে ব'লো না কিন্তু। তাতে নানা রকম কথা উঠতে পারে। আচ্ছা, রহীমের নামেও যদি কিছু লেখাপড়া করে দেয়া যায় তাতে তোমার মত আছে ?

ও সব কথা পরে হবে, বলে মরিয়ম গিয়ে রহীম ও জাহান-আরাকে ডেকে নিয়ে এল। তা রা এলে হাতেমকে সালাম করতেই তার দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়াতে লাগল। কোন কথা বলতে পারলে না, কেবল দুজনকে দুই হাতে ধরে রইল। জাহান-আরাও কেঁদে ফেলে বাপের কাঁধের উপর মাথা রাখলে।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে, আল্লাহ তোমাদের খায়ের করুক, সালামত রাখুক, বলে ছেড়ে দিলে তাদের। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললে, মধুপুর আসার পর আমার শরীর বেশ সেরে উঠছে, গায়ে বল পাচ্ছি। আর কটা দিন থাকলে হয় তো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাব। এখন তোমাদের দুজনকে দেখে আমি মনের আনন্দেই আরো তাড়াতাড়ি সারতে পারব। আল্লা ভালো করুক তোমাদের।

রহীমের দিকে ফিরে বললে, দেখ বাবা, তুমি শুধু তোমার মায়ের ছেলেই নও। জাহানআরা যেমন আমার মেয়ে, আজ থেকে তুমি আমারও ছেলে।

আঠার

এলাকায় গিয়ে যখন ঢুকল রহীম, সে দেখলে দিগন্ত বিস্তৃতা সবুজের মেলা—যেন সারা মাঠখানায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। আবাদের এই শ্যামল শোভার দৃশ্য তার মনকে নাচিয়ে তুললে।

যাবার পূর্বে কলকাতায় তার পার্টি কেন্দ্রের কমরেডদের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হ'ল এবার এখানে তাকে পার্টির ভিত পত্তন করতে হবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে সে কাজ আরম্ভ করার সময় থেকেই। গতবার কলকাতা যাবার পূর্বে সমিতির নেতৃত্ব গঠনের জন্য যে সকল কর্মীকে বিশেষভাবে রাজনীতিক তালিম দিয়ে গিয়েছিল, তাদের নিয়ে অনেক ছোট ছোট গ্রুপ তোয়ের করেছিল, তারাই হবে এখন পার্টির বুনিয়াদ। এই চিন্তা নিয়েই তালিম দিয়েছিল সে। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হবে। এই হ'ল তার কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত।

সমিতির সংগঠনী কমিটির সভা ডাকা হ'ল। বর্তমানে স্থানীয় অবস্থা কী তাই নিয়ে আলোচনা হ'ল। দেখা গেল গরিবদের মধ্যে খাদ্যের সংকট। ভাগচাষীরা চড়া সুদে হলেও তবু মালিকদের কাছ থেকে ধান কর্জ পায়। কিন্তু মজুরদের অবস্থা শোচনীয়। তাদের সঞ্চয়ও নাই, ঋণও পায় না তারা। তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা কর বার না। এটা সমস্যা হয়েই থাকল। চাষ আবাদ হয়ে গেছে, আর কাজ নাই তাদের, রোজগারও নাই।

কমিটির বৈঠকের পর রহীম বিশেষভাবে কয়েকজন কর্মীকে এক সময় ডেকে নিয়ে তার পার্টির সিদ্ধান্তের কথা জানালে। তাদের কাছে সাংগঠনিক দিকটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করলে। তাদের বুঝিয়ে দিলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমলে বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে একটা বেআইনী পার্টির মেম্বর থাকার দায়িত্ব এবং বিপদের

ঝুঁকি কতখানি; গভীর রাজনীতিক চেতনা এবং কঠোর শৃংখলাবোধ বজায় রাখতে না পারলে, যেখানে-সেখানে অসংযতভাবে কথা বললে, এবং বেপরোয়া যেকোন কাজের মধ্যে এগিয়ে গেলে বিপদ ডেকে আনা হবে।

এ সমস্ত কথা বিবেচনা করে জেনে-বুঝেও সকলেই উৎসাহের সহিত সমর্থন করলে পার্টিতে যোগদানের প্রস্তাব। সেজন্য তাদের পক্ষে যা আনুষ্ঠানিক করণীয় তারও ব্যবস্থা হ'ল।

এক একটা গ্রামের মধ্যে যে কজন কর্মী পার্টি মেম্বর পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হ'ল তাদেরই কেবল এক সঙ্গে নিয়ে রহীম আলাপ করলে এবং তাদেরই নিয়ে এক একটা ইউনিট তোয়ের করার জন্য প্রস্তুত করলে। তাদের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে বিশেষভাবে জোর দিলে তাদের শৃংখলাবোধের উপর। রাজনীতিক চেতনার কথা তারা আগে শুনেছে। এখন শুনলে শৃংখলা চেতনার কথা। তাদের অধিকংশই নিরক্ষর হলেও এই নতুন ধারণা তাদের মধ্যে আশ্চর্য দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুললে।

শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে রহীম দেখেছে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে যারা পার্টিতে নতুন যোগ দিয়েছে তাদের দায়িত্ববোধ ও উৎসাহ। এখন কৃষকদের মধ্যে তার যে নতুন পরিচয় পেলে সে তাতে বিস্ময় বোধ না করে পারলে না। তার মনে হ'ল এত উৎসাহের কারণ কৃষক এলাকার এই সমস্ত মানুষ বর্তমান জগতের হালচাল সম্বন্ধে শহরের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি অনভিজ্ঞ, অনেক বেশি কাঁচা ও আনকোরা, আর অভাব ও দারিদ্রের সঙ্গে তাদের অসহায়তা বোধও বেশি। কারণ যাই হক, সে দেখে গভীর আনন্দ বোধ করলে।

এই কাজে রহীমকে বিশেষভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হ'ল। যে সমস্ত গ্রামে তাদের কর্মী আছে তেমন অধিকাংশ গ্রামে গিয়ে সে বৈঠক করলে কর্মীদের নিয়ে। সেই সকল গ্রামের এবং পাশাপাশি থাকলে এক সঙ্গে দু-তিনখানা গ্রামেরও কর্মীদের নিয়ে বসল। তার সঙ্গে

সকল সময়ে অন্তত দু-একজন স্থানীয় কমরেড থাকে। গ্রাম গুলোর বিশেষত আবাদের ভিতরে এবং বাইরে রাস্তা তখন খুব খারাপ। শুকনো কম, কাদা বেশি। আর এঁটেল মাটির রাস্তা দিয়ে বর্ষার সময় গরু মোষ হামেশা চলার ফলে সে সব রাস্তা দিয়ে হাঁটাও খুব আরামদায়ক নয়।

সেই কারণে বৈঠক করতে বেশি দূরের পথ যাওয়া চলে না। তাই বিভিন্ন গ্রামে তাদের কয়েকটা কেন্দ্র ঠিক করে নিতে হ'ল। এক একটা কেন্দ্র থেকে তারা সকালে বেরিয়ে নিকটের গ্রামে যায়, সারাদিন সেখানে আলাপ আলোচনা করে ফিরে আসে। তারপর আবার সেই কেন্দ্রের পরিধি পার হয়ে দূরে গিয়ে আর এক কেন্দ্র নিয়ে ঘোরে।

এই সূত্রে বেশ কয়েকটা পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। তার মধ্যে ছিল শোলমারির বংশীর, কুমীরখালির শিবুর এবং হাজি-নগরের দাউদের পরিবার।

বংশীর পরিবারে আছে তার স্ত্রী যমুনা, মেয়ে লক্ষ্মী এবং জামাই কালাচাঁদ ওরফে কালু আর তাদের শিশু কন্যা। দোহারা ভারিক্কি গোছের চেহারা যমুনার, বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। প্রথম পরিচয়েই রহীমের সঙ্গে সহজভাবে কথা বললে। বয়সে অনেক ছোট হলেও রহীমের সাথে সম্ভ্রমের সঙ্গে আলাপ করলে এবং কমরেড বলে ডাকতে লাগল। রহীম তাকে বৌদি বলে, লক্ষ্মীকে বলে মা-লক্ষ্মী। কালু নিরীহ মানুষ, চাষে যথেষ্ট খাটে, কথা বলে কম। তার ব্যবহারে রহীমের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখা গেল।

শিবু ভাগচাষী। নিজেরও কিছু জমি আছে। হালবলদ ছাড়া গোটা চারেক গাই রেখেছে, দুধ বিক্রী করে। তার পরিবারে তার স্ত্রী কালী, বিধবা বোন মেনকা, এবং দুটি ছেলেমেয়ে। গাইগুলোর জন্ত বিশেষ যত্ন নেয় মেনকা। সংসারের অন্যান্য কাজও যথেষ্ট করে। ছেলেবেলায় গ্রামের ইস্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিল সে, যেমন শিবুও পেয়েছিল। বিধবা হয়েছে কয়েক বছর হ'ল, আর বিয়ে করতে

চায়নি। একটা মেয়ে হয়েছিল, সে জন্মের কয়েকদিন পরেই মারা যায়। কালী নিরক্ষর। শিবুদের ভাইবোনের সম্পর্ক ভালো। মেনকার প্রতি কালীর ব্যবহারও খারাপ নয়।

দাউদ ভাগচাষী। তার বৌ, ছুটো ছোট ছেলে, বাপ, সৎমা ও ছোট সৎভাই নিয়ে তাদের পরিবার। তার ভাই হারুনের বয়স সতর আঠার হবে এবং বাপ ফকির মোল্লার ষাটের কাছাকাছি। দাউদের পরিবারে মেয়েদের সঙ্গে রহীমের পরিচয় হয়নি; সামাজিক কারণে তাতে বাধা আছে।

এই সমস্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে ছু তিন দিন করে পরিচয় হ'লেও সে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ পেলে। অবসর সময়ে জেনে নিলে তাদের জীবনযাত্রার নিয়ম ও ব্যবস্থা, সুখছুঃখ ও অভাব-অভিযোগের পরিচয়।

ভাগচাষীরা আবাদের মরসুমে খোরাকীর জন্য সাধারণত জমির মালিক বা মহাজনদের নিকট থেকে ধান ধার করে। সেজন্য চড়া হারে সুদ বা বাড়ি দিতে হয় পরবর্তী ফসল উঠলে খামার থেকে শোধ দেবার সময়। এই সুদের চড়া হারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ।

কিন্তু সুদ দিতে হলেও তারা অসময়ে খোরাকীর একটা ব্যবস্থা করতে পারে। জনখাটা লোকের সে ব্যবস্থাও নাই। ভাদ্রমাসের মধ্যেই তাদের কাজ যখন ফুরিয়ে যায়, আর উপায়-উপার্জন প্রায় থাকে না, তখনই শুরু হয় তাদের জীবনের বার্ষিক সংকট। আবাদের সময় কাজ করে সঞ্চয় করার মতো মজুরী তারা পায় না, পেলেও অতি সামান্য যা অল্পদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

তখন তারা রাত জেগে মাছ ধরার চেষ্টা করে। যেখানেই সামান্য জল আছে বা জলের স্রোত চলছে সেইখানে নানা কৌশলে মাছ ধরে, সাধারণত চুনোপুঁটি। কিন্তু তাও যথেষ্ট জোটে না। তাই খাবার জন্য ধরে শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদি। এ সব কাঁকড়াও বড় নয় যে খাদ্য হিসাবে তার মধ্যে যথেষ্ট শাঁস থাকবে। ছোট কাঁকড়াই

বেশি কিন্তু তাই সিদ্ধ বা চচ্চড়ি করে তার খোলাগুলি চিবোয় তারা। খাওয়া না হলেও মন বোঝাবার ব্যবস্থা।

রহীম এই এলাকায় থেকে দেখতে লাগল এই রাত জেগে দিনের পর দিন মাছ ধরা অভিযান চালিয়ে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে তাদের শরীরের কী শোচনীয় হাল হয়ে পড়ে। চেহারা দেখে তাদের আর মানুষ বলতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় যেন ঝিল থেকে উঠে এল প্রেতের দল, যেন বেঁচে আছে তারা কেবল মরেনি বলে। এক এক সময় এই দৃশ্য তার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। তারা ধীরে ধীরে আবার বেঁচে উঠতে থাকে ধান কাটার মরশুমে কাজ পাবার পর—অঘ্রাণ-পোষ মাসে।

বংশীর বাড়ি রহীমের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যত্ন নেয় লক্ষ্মী ও তার মা দুজনেই। বংশী তার পাশে বসেই খেতে আরম্ভ করে। দুজনেরই থালা মেয়েরা ধোয়। প্রথম দিন রহীম নিজে এঁটো থালা নিয়ে ধুতে যাচ্ছে দেখে যমুনা জিভ কেটে কেড়ে নিয়ে বলে, কেনে কমরেড, থালা আপনি ধোবে, আমি কি মরে গেছি? রহীম জোর করতে পারে না।

শিবুর বাড়ি তার যত্ন নেয় মেনকা। প্রথম প্রথম ঘোমটা একটু টেনে সংকোচের সহিত খাবার থালা এনে দেয় তার সামনে এবং থালা ধোয়ও সেই। পরে সংকোচ কাটিয়ে সহজভাবেই আসে, আস্তে আস্তে কমরেড বলে কথা বলতে আরম্ভ করে। কালী কিন্তু দূরে দূরেই থাকে। রহীম মেনকাকে দিদিমনি বলে ডাকে।

শিবুর বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগের দিন মেনকা তার দাদাকে বলে, কমরেড তোদের সাথে যেসব কথা বলেন, আমরা তো কিছুই শুনতে পাইনা। আমাদের জন্যে অমনি বৈঠক করে কিছু বলতে বল না কমরেডকে। আমি আরো জনাকতক মেয়েকে ডেকে আনব।

শিবু বললে, তুই তো কথা বলিস, নিজেই বলে দেখ না কমরেডকে।

সকালে রহীম ও শিবু বেরিয়ে অন্য গ্রামে যাবার পূর্বে মেনকা সংকোচের সহিত পাশের দিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললে, কমরেড, আপনি তো কত লোককে কত কথা শোনাচ্ছেন। আমরা যে কিছু শুনতে পাই না। দাদাও বলে না কিছু। আমাদের কাছেও কিছু বলুন না এক সময়ে।

রহীম হেসে বললে, দিদিমণি, তুমিও তাহলে আন্দোলনের কাজ করতে চাও?

কী কাজ করতে হবে তা তো জানি না।

বৈঠক ডাকলে আরো মেয়ে আসবে?

তা আসবে। আপনার কথা শুনলে ঠিক আসবে।

তাহলে আজই ডাক সন্ধের পর। কাল তো অন্য এলাকায় চলে যাচ্ছি।

বৈঠকের ব্যবস্থা হ'ল। শিবুর পাড়ার দশ-বারোটি মেয়ে যোগ দিলে বৈঠকে। বিভিন্ন বয়সের মেয়ে, বেশির ভাগ বয়স্থা। রহীম বুঝলে কাজটা অত্যন্ত কঠিন। মেয়েরা সকলেই নিরক্ষর, একমাত্র মেনকা ছাড়া। যাই বলা হ'ক, তাদের বোঝবার মতো বিষয় ও ভাষা হওয়া প্রয়োজন। বিষয় অবশ্য কৃষক জীবন—কৃষকদের অবস্থা, তাদের বক্তব্য এবং কর্তব্য, তাদের ভবিষ্যৎ, আর হাট আন্দোলনের কথা। তেমন সন্তোষজনক না হলেও তার কথা মেয়েদের মধ্যে কিছু উৎসাহ সৃষ্টি করলে, আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু আগ্রহ জাগালে তাদের মনে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা গেল মেনকার; বৈঠক ডাকার কৃতিত্বও তাকে উৎসাহ দিয়েছে।

সোনাপুর ও মোহনগঞ্জ এলাকায় গিয়েও একই কাজ করতে হ'ল রহীমকে। একইভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বৈঠক করা, বৈঠকে যারা সবচেয়ে অগ্রসর বলে মনে হ'ল সেই সব কর্মীকে নিয়ে ছোট ছোট পার্টি ইউনিট তৈরী করা। তাদের বিশেষ ধরনের তালিম দিয়ে

রাজনীতিক চেতনা ও শৃঙ্খলা বোধ বাড়িয়ে তোলা—সবই করতে হ'ল। এখানেও কয়েকখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে ঘোরা হ'ল কতকগুলি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

এখানে কাসেম মেয়েদের বৈঠকের কথা বলতে পারবে না ভেবে প্রশ্নটা সে তুললে না। কিন্তু অর্জুন বললে সে কথা। সে নিজে চেষ্টা করে ভালো বৈঠকের ব্যবস্থা করলে মেয়েদের। আন্দোলনের চেতনা যে কৃষক মেয়েদের মধ্যে ঢুকছে তাই দেখে রহীমও উৎসাহিত হ'ল। বললেও সে আগে মেনকাদের বৈঠকে যেমন বলেছিল তার চেয়ে ভালো। এর পর সে আরো কয়েকটা বৈঠক করলে মেয়েদের নিয়ে।

অন্যান্য বিষয়েও এখানে পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ কোন তফাত নাই।

মেয়েদের বৈঠক এক নতুন অভিজ্ঞতা। সাধারণত এই মেয়েরা খেতখামারে কাজ করে না, সামাজিক রীতিতে বাধে। সর্দার মেয়েরা সাধারণত কৃষির কাজ করে, সেজন্য "বাঙ্গালীদের" সামাজিক বিচারে তাদের মর্যাদা কম। কিন্তু যে মেয়েরা নিজ হাতে চাষের কাজ করে না তাদের মধ্যেও কৃষক স্বার্থের আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। জমির খাজনা, ঋণের বোঝা, সুদের হার, শস্যের দর, এমন কি মজুরীর হার সম্বন্ধেও তাদের আগ্রহ যথেষ্ট। এ সকল বিষয়ে আন্দোলন করে কৃষকদের অভাব-অভিযোগের কিছু প্রতিকার করা সম্ভব, সুতরাং তারাও চায় আন্দোলন হ'ক। তার প্রয়োজন বোধ করে তারা নিজেদের জীবনেও।

সেজন্য সমিতির মেম্বর হবার ডাকেও তারা সাড়া দিতে প্রস্তুত; তারাও যখন কৃষক তখন সমিতির মেম্বর তারা হবে না কেন? তবে প্রশ্ন আছে—সে প্রশ্ন তুলেছিল মেনকা তাদের বৈঠকে। সে বলে, কিন্তু কমরেড, মেম্বর হলেও তো আমরা ঘরেই বসে থাকব, সমিতি কী করবে তা জানতে পারব না। আন্দোলন করতে হলে বাড়ির বাইরে যেতে হবে। আমরা যাব কেমন করে?

বাইরে যাওয়া যদি উচিত মনে কর তো যাবে, তাতে বাধা দেবে কে? রহীম সমাজের অবস্থা ভালোভাবে বিবেচনা করে এ জবাব দেয়নি, তার নিজের মনের ভাবটাই ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু এ জবাব অচল। উপস্থিত এক বৃদ্ধা বললেন, তা কি হয় বাবা? বৌ-ঝিরা কি বাইরে যেতে পারে চট করে? পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে তো। আমাদের মতন বুড়োসুড়ো মানুষের কথা আলাদা।

সে নিজেকে একটু সংশোধন করে নিয়ে বললে, সে কথা ঠিক, সবাই এখুনি বেরোতে পারবে না, পুরুষরাই হয়তো বাধা দেবে। তবে তারা সমিতির ভেতর যত বেশি আসবে ততই বাধাটা কাটতে থাকবে। আন্দোলন জোর ধরলে তখন পুরুষরাও বুঝবে মেয়েরাও যদি বেরোয় তাহলে তাদের আন্দোলনের জোর বাড়বে।

এ উত্তরের প্রতিবাদ হ'ল না কিন্তু কথাটা যে সকলে মন থেকে মেনে নিলে তা নয়। কেবল মেনকার মতো দু একজন উৎসাহী মেয়ের মনে এইটুকু ভরসা জাগল যে আন্দোলন একটা হবে যখন তখন তারাও সুযোগ পাবে যোগ দেবার।

সে সুযোগ যতই অসম্ভব বা দূরের বিষয় মনে হ'ক, মেয়েদের বৈঠক হওয়ার ফলে রহীম ও অন্য কর্মীরা এটা লক্ষ্য করলে যে তাদের মধ্যে একটা নতুন সামাজিক চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। পারিবারিক জীবনের বাইরে সামাজিক জীবন বলে তারা যেটুকু যা দেখেছে এ পর্যন্ত, তা নিতান্ত নগণ্য এবং তাৎপর্যহীন। কোন অপরিচিত ব্যক্তির সামনে ঘটা করে বসে তার কথা শোনবার অধিকার যে তাদের আছে, তাও কেউ কখনো ভাবতে পারত না। এখন অনেকেরই মনে, বিশেষত অল্পবয়সী মেয়েদের মনে একটা নতুন ধারণার সৃষ্টি হ'ল যে পুরুষদের মতো তারাও মানুষ বলে গণ্য হচ্ছে, সমাজের কাজে তাদেরও প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করা হচ্ছে। সামাজিক মর্যাদাবোধের একটা অস্পষ্ট আভাস জাগল তাদের মনে।

মেনকা বলেছিল তাদের বৈঠকের পরে, আপনি যদি মাঝে মাঝে

আমাদের কাছে এই সব কথা বলেন কমরেড, আমরা তাহলে অনেক জিনিস শিখতে পারব।

মোহনগঞ্জের বৈঠকের পর অর্জুনের স্ত্রী উমাও বলেছিল এমনি কথা।

অর্জুনের পরিবারে আছে উমা ও তাদের দুটি শিশু সন্তান আর তার মা। তার দাদা নকুল পাশের বাড়িতে বাস করে পৃথক অন্নে, কিন্তু তাদের সম্পর্ক খারাপ নয়। নকুল কিছু নিজের জমি আর কিছু ভাগের জমি মিলিয়ে চাষ করে। সমিতি ও আন্দোলন সম্বন্ধে তারও যথেষ্ট উৎসাহ। তার স্ত্রী কোকিলাও তেমনি। নকুল যে পৃথক হয়েছে সে কেবল কোকিলার সঙ্গে তার শাশুড়ীর বনিবনাও হচ্ছিল না বলে, যদিও ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল যথেষ্ট, হৃদ্যতাও আছে, এবং দুই বৌয়ের মধ্যেও সম্পর্ক ভালো। বুড়ীর কতকগুলো খাম-খেয়ালী চালচলন আর শুচিবায়ু আছে যা কোকিলা সহ্য করতে পারত না। উমা কিন্তু সয়ে যায়।

অর্জুন বিয়ের পর উমাকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছে। তার ছোট বোন বুলিকেও শিখিয়েছে একই সঙ্গে। বুলি উমার চেয়ে ছোট, এখন গ্রামেই শ্বশুর বাড়ি থাকে। অর্জুন এই তিনটি মেয়েকে নিয়েই পূর্বে এক সময়ে কিছু কিছু আলাপ করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে, যদিও কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি তখন। সেই কারণে তারা তিনজনেই রহীমের নিকট মুখ খুলতে পেরেছে।

এবার এখানে এসে রহীম কাসেমের বাড়ি থাকল না, অর্জুনের আগ্রহে তার বাড়ি থাকল। খেলে সে দুই ভাইয়েরই বাড়ি। বুলির নিমন্ত্রণে তার বাড়ি গিয়েও অর্জুনের সঙ্গে একদিন রাত্রে খেয়ে এল। এর মধ্যে অর্জুনের অনুরোধে সে বিশেষভাবে এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে একত্র বসে অনেক বিষয় আলোচনা করলে, তাদের মধ্যে চেতনা ও দায়িত্ববোধ জাগাতে চেষ্টা করলে। কিছু ফলও হ'ল।

এ যাত্রায় রহীম প্রায় দু মাস ধরে একটানা সফর করে সমিতির

দুটো এলাকারই প্রত্যেকটি গ্রামে গেল, সমিতির কর্মী ও মেম্বরদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করলে, অসংখ্য লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেলে। অধিকাংশ গ্রামে পার্টি ইউনিট তৈরি করলে এবং বাকি গ্রামে সেজন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা করে রাখলে। এই দুই এলাকার বাইরে আশপাশের কিছু গ্রামেও তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সংগঠনের ক্ষেত্র প্রসার লাভ করতে থাকল। এই সফরের মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় কিছু কিছু স্থানীয় কমরেড দুচার দিন করে থেকেছে তার সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ধান পাকতে আরম্ভ করেছে। গ্রাম ও রাস্তা শুকিয়েছে, চলাফেরার অসুবিধা অনেক কমেছে। কিছুদিন পরে ধান কাটার কাজ শুরু হবে।

উনিশ

আবাদ থেকে আসবার পূর্বে মাঝে মাঝে রহীম কলকাতার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করত। আসবার পর তার মনে হ'ল আকর্ষণটা এখন আরো গভীর হবার কারণ রয়েছে। এই সময়টার মধ্যে জাহানআরার শিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছে তাই দেখে সে আশ্চর্য বোধ করলে। জাহানআরা নিজেও স্বীকার করলে তার শিক্ষার প্রয়োজনকে সে পূর্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে শিখেছে। সেই কারণে এখন সে এই কাজে সাধ্যমতো বেশি সময় এবং মনোযোগ দিয়ে থাকে।

রহীম বর্ষার পর আমতলী ফিরে গেলে রোস্তমরা তার মুখে প্রথম শুনেছিল হাতেমের অসুখের কথা। তখন রোস্তমের মা দুঃখ করেছিলেন তার কাছে, দেখতো বাবা, হাতেম আমার আপন ভাই। তবু তার অমন ভারি বেয়ারাম হ'ল, বৌ আমাকে একটা খবরও দিলে না, লোকমানও কিছু জানালে না!

তাঁর এ অনুযোগ যে নিতান্ত সংগত ও স্বাভাবিক তা রহীম নিজের মনে স্বীকার করেছিল এবং মন্তব্যও করেছিল যে খবর দেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। পরে রোস্তম তার মাকে নিয়ে দুদিনের জন্য এসে হাতেমকে দেখে গিয়েছিল। সে খবরও রহীম জানত।

এখন মরিয়ম তাকে বললে, দেখ তো বাবা, কী কেলেংকারিটা করলে লোকমান। অপারেশন যেদিন হয় সেইদিনই আমি নিজে তাকে বলেছি বুবুকে চিঠি দিতে। এতদিনের মধ্যে তার সময়ই হ'ল না। আমার বলবারই বা কী দরকার, তার নিজেরই উচিত ছিল লেখা। পর তো নয়, তোরই মা, তোরই মামু। তা কী বলব বল! বুবু এসে দুষলে আমাকে। তাকে অন্যায় মনে করিনি আমি। তবে ভাগ্যি ভালো যে লোকমান স্বীকার করলে আমি

বলেছিলাম তাকে লিখতে। নইলে আমার সম্বন্ধে বুবুর কী ধারণা হ'ত বলতো বাবা।

রহীম শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কিছুতেই বুঝতে পারলে না কী ভেবে লোকমান খবর দেয়নি। এ কি তার আক্রোশের ফল— সে এই অসুখের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়েছিল বলে ? কিন্তু এতে তো তারই লোকসান।

সে কেবল প্রশ্ন করলে, মামু জানেন ?

মরিয়ম। তা জানেন বৈ কি। বুবু নিজেই তো কেঁদেকেঁটে বলেছে তাঁকে।

রহীম। কী বললেন মামু ?

মরিয়ম। বলবেন আর কী ! গুম হয়ে থাকলেন। লোকমানকে ভালোবাসেন তো খুব। সে যে তাঁরই অসুখে এমন কাজ করেছে তাতে মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। পরে আমাকে বলেছিলেন আজকাল তার ব্যবহার তাঁর ভালো লাগছে না। আমি তার ওপর কিছু না বলাতে কথাটা ঐখানেই চাপা পড়েছিল।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব থাকার পর মরিয়ম বললে, কৈ তুমি তো কিছু বললে না।

রহীম। কী বলব মামীমা ? এটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমি যেই হই, এখনো বাইরের লোক।

মরিয়ম। তুমি তাকে বলবে না কিছু ?

রহীম। মামীমা, লোকমান আমার এতকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই কথাটা শুনে বড় বেদনা বোধ করছি। খবর দেবার কথা কেউ ভুলে যেতে পারে না, যখন একমাস ধরে মামু থাকলেন হাসপাতালে। তবে আমার ধারণা আমি তাকে বললে কোন লাভ হবে না। বরং সে উলটো ভুল বুঝবে আমাকে।

মরিয়ম। তা হতে পারে। তোমার মামু তো ঐ কথা শোনার পর থেকে লোকমানের সঙ্গে আগের মতন মন খুলে কথাই বলেন না। তবু সে এর মধ্যে আবার ওঁকে বলেছিল প্রেসের জন্যে আর

একটা মেশিন কিনতে হবে, ক হাজার টাকা চাই। উনি বলেছেন যা মেশিন আছে তার কাজ ভালো করে চলুক, তখন দেখা যাবে।

রহীম প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করবার জন্য বললে, মামুর শরীর দেখে তো এখন ভালোই মনে হ'ল। তিনিও বললেন ভালো আছেন। এর মধ্যে কোন রকম খারাপ লক্ষণ দেখা যায়নি তো ?

মরিয়ম। না বাবা, আল্লা রহম করেছে, খারাপ কিছু দেখিনি। উনি নিজের কাজেও বেরোচ্ছেন নিয়মিত। তবে খাটনির কাজ কম করেন। বলেন করতে হয়তো এখনি পারেন আগের মতন কিন্তু আরো কিছুদিন করবেন না।

মরিয়ম একবার চারিদিক দেখে নিয়ে বললে, রহীম, একটা কথা বলব তোমায়, কাউকে বলবে না তো ? নতুন বাড়ি দুখানা দুই মেয়ের নামে দলিল করে দেয়া হয়েছে, রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। কেউ জানে না। উনি বলেছেন এখন যেন কাউকে জানানো না হয়। শুধু তোমাকে বললাম। দেখিস বাবা, কাউকে বলিসনে, মায়ের কথা রাখিস।

রহীম। না মা, বলব না কাউকে।

মরিয়ম। বাড়ি দুটোয় এখন লোক এসে গেছে, ভাড়া চলছে।

এই আলাপের পর বাসায় গিয়ে রহীম ভাবতে লাগল লোকমানের ব্যাপারটা কী হতে পারে। ধারণা তার মনে যাই হ'ক, এ একটা রহস্যের মতো বোধ হ'ল। লোকমান ব্যবসা করতে গিয়ে যে ক্রমেই বেশি বেশি স্বার্থপর হয়ে উঠছে, লোভও তার বেড়ে যাচ্ছে, এ ধারণাকে নাকচ করতে পারলে না সে। নতুন করে মেশিন কেনবার জন্য টাকা চাওয়া মানে আরো কিছু টাকা হাতেমের নিকট থেকে হাতিয়ে নেওয়া। রহীমের প্রতি যে একটা বিদ্বেষের ভাব সে পোষণ করছে সে ধারণা আগেই পাওয়া গিয়েছিল।

হয়তো লোকমান ভাবছে রহীম ক্রমেই হাতেমের এবং বিশেষ করে মরিয়মের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, তাদের প্রিয় হয়ে

লোকমানকে টেক্কা দিতে চাইছে, এবং সেজন্য মামু-মামীর উপর তার রাগ। হয়তো ভাবছে সে যে রহীমের সঙ্গে জাহানআরার বিয়ে দিয়ে তারা তাকে সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করতে চায়, এবং তার এই ধারণার সপক্ষে সে মনে করতে পারে যে এক সময়ে রহীম জাহানআরা থেকে সরে থাকতে চেয়েছিল অথচ এখন তাকে নিয়মিতভাবে পড়াতে যায়।

এমনি সাত-পাঁচ অনেক কথাই উঠল তার মনে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারলে না তা সত্ত্বেও এ চিন্তা মাথায় আসছে না কেন লোকমানের যে তার মামু-মামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না রাখলে ব্যক্তিগতভাবে তারই ক্ষতি হতে পারে। অথবা সে হয়তো নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবতে শুরু করেছে।

এখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে মরিয়ম অন্তত তাকে লোকমানের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে, যদিও এই তুলনাকে সে তার স্নেহ বণ্টন সম্বন্ধে খাটাতে চায় না। এই অবস্থা তার কাম্য ছিল না। সে চায়নি হাতেম বা মরিয়মের চোখে কোন বিষয়েই সে লোকমানকে পিছনে ফেলে নিজে এগিয়ে থাকে। অথচ দেখা যাচ্ছে আজ তাই ঘটেছে। লোকমানের জন্য সে ব্যথিত হ'ল। ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনীতিক জীবনেও এক সময়ে যে লোকমান ছিল তার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, আজ সে যে তার থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, তাই ভেবেও রহীম বেদনা অনুভব করলে।

সত্যিই এ তার প্রায় আত্মীয়বন্ধুহীন জীবনে বড় লোকসান। অথচ সামাজিক দিক থেকে যে নতুন আত্মীয়বন্ধু সে পেয়েছে এখন তা লোকমানেরই দৌলতে, এবং সেজন্য সে তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে পারে না।

অমনি তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। জাহানআরা, মরিয়ম, নূরজাহান হাতেমও ভেসে উঠল তার অন্তরের মাঝে। এবার এসে জাহানআরার কাজ দেখে সে কেবল প্রীতই হ'ল না, আরো আকৃষ্ট হ'ল তার প্রতি, আগের চেয়েও ভালো লাগল তাকে। সে যেন

শুধু একটা দরকারী কাজই করছে না, একটা সাধনায় নিযুক্ত আছে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের দুটো জীবন আনন্দময় হতে পারে, একত্র হয়ে সমাজের কাজে লাগতে পারে। জাহানআরার কথা ভাবতে এখন তার বড় ভালো লাগে, মন প্রাণ ভরে ওঠে।

যে কয়েকটা সপ্তাহ এবার কলকাতায় কাটালে সে, নিয়মিত-ভাবে জাহানআরার শিক্ষার সাহায্য করলে। তার অগ্রগতি আরো দ্রুত হতে লাগল। তার বাংলা লেখার মধ্যে সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গী ক্রমেই পরিস্ফুট হতে দেখা গেল। ইংরেজী পড়া ও লেখার কাজেও সে বেশ এগিয়ে যেতে লাগল।

এতদিন ধরে এই কাজে তারা একত্র ঘনিষ্ঠভাবে থাকলেও রহীম কোন সময়ে সংযম হারিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে একটি কথাও বললে না। সে সংযম জাহানআরার ব্যবহারেও সমানভাবে প্রকাশ পেলে।

এলাকায় ফিরে যাবার পূর্বে সমিতির ও পার্টির জেলা ও প্রাদেশিক কেন্দ্রে আলোচনা করে রহীম স্থির করলে সমিতির মেম্বরদের নিয়ে সম্মেলন করা হবে, নিয়মিত স্থানীয় কমিটি নির্বাচন করা হবে, এবং এই উপলক্ষে জন সমাবেশও ডাকা হবে। সম্মেলন ও জনসভার প্রচারের জন্য ইস্তাহারের খসড়াও তৈরী করে দিলে সে। তার মধ্যে এলাকার পরিস্থিতি, খেতমজুর ও কৃষকদের মূল এবং আশু বক্তব্য ও দাবি, তাদের কর্তব্য এবং সাংগঠনিক কাজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল এবং কৃষকদের প্রতি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজের জন্য আবেদনও থাকল। জমিদারী-লাটদারী ও মহাজনী প্রথা উচ্ছেদের এবং কৃষক ও খেতজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টনের দাবি নিয়ে আন্দোলনের কথাও বলা হ'ল।

যথাসময়ে এই ইস্তাহার ছাপিয়ে এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে

বলে ব্যবস্থা করা হ'ল। সম্মেলনের জন্য সমিতির প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে একজন নেতৃস্থানীয় কমরেড যাবেন বলেও সিদ্ধান্ত করলে তারা। এবার জেলা কেন্দ্র থেকে রহীমকে সাহায্য করার জন্য রমেশকে তার সহকারী হিসাবে দেওয়া হ'ল। রহীমের সঙ্গেই গেল সে।

ধান কাটা তখন শেষ হয়ে গেছে। ঝাড়ামাড়া চলছে। যারা সে কাজও সেরে ফেলেছে তেমন কর্মীদের মধ্যে দু একজনকে সঙ্গে নিয়ে রহীম ও রমেশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখতে লাগল ফসল ফলেছে কেমন, এবং জমির মালিক ও মহাজনদের ফসল আদায়ের ব্যবস্থা কেমন।

মালিকরা তাদের ভাগীদারদের কাছ থেকে নিজেদের অর্ধেক ভাগ আদায় করছে। বড় মালিকরা নিজেরা ভাগীদারের খামারে যেতে পারে না, পেয়াদা-পাইক পাঠায়। অনেকে সেজন্য লাঠিধারী পশ্চিমা রেখেছে। তারা কেবল বাড়ি ধান এবং অর্ধেক ভাগই আদায় করে না, জোর করে নিজেরাও চাষীর অংশ থেকে কিছু ধান কেড়ে নেয়। আবার মাপের কারচুপির দরুনও চাষীকে ঠকিয়ে তার পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করে।

এইভাবে বহু চাষীকে প্রতারণা করে বড় মালিকদের পেয়াদারা যে ধান সঞ্চয় করে তাই দিয়ে মহাজনী কারবার করে। সুদের উপর তা ক্রমেই ফেঁপে উঠতে থাকে। সেই ধানের টাকায় ধীরে ধীরে তারা জমি কিনতে থাকে, নিয়মিতভাবে মহাজনী কারবার করে, এবং এইভাবে কালক্রমে এক একজন যথেষ্ট জমির মালিক হয়ে পড়ে, জোতদারে পরিণত হয়।

মহাজনরা তাদের কর্জ দেওয়া ধান সুদ সমেত খামারেই আদায় করে নেয় এবং তার মধ্যেও মাপের কারচুপি করে চাষীদের ঠকায়। এইভাবে চাষীর ভাগের বেশ একটা অংশ বেরিয়ে যায় জমির মালিকদের, সুদখোর মহাজনদের এবং অন্যান্য প্রতারকদের হাতে।

ফলে অসংখ্য ভাগচাষী কয়েক মাসের মধ্যেই কেবল খোরাকীর দায়ে আবার গিয়ে পড়ে মহাজনের খপ্পরে।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এবং জমিদারী-জোতদারী-মহাজনী চক্রের শোষণের বন্ধন থেকে উদ্ধারের কোন পথ না পেয়ে ছোট ছোট রাইয়ত-চাষীরা জমি হারিয়ে ক্রমে ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছে। পরে জোতদার-মহাজনের শোষণ ও প্রতারণার কারণে হালবলদ রেখে ভাগচাষ করবার অবস্থাও যখন বজায় রাখতে পারেনি, তখন তারা পরিণত হয়েছে জনমজুরে। এটাই যেন ছিল তাদের নিয়তি, তাদের ভাগ্যলিপি। অনেক চাষীই এইভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং এমনি চিন্তার মধ্যেই খোঁজে তারা বঞ্চনার মধ্যে সান্ত্বনা।

সারা বছরের ফসল উঠে গেছে। দেনাপাওনার হিসাব যথাসাধ্য চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধান এবার ভালো ফলেনি। তাহলেও মোটের উপর কৃষকদের এবং মজুরদেরও ঘরে খাবার সংস্থান আছে, উপবাস করতে হচ্ছে না।

যথাসময়ে ছাপানো ইস্তাহার এসে গেল। তামাম এলাকাটায় এবং তার বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। যে কটা ইউনিয়নে সমিতির সভ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে সম্মেলন ডাকা হয়েছে, দিন ধার্য হয়ে গেছে, প্রচারও করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের সভায় যথেষ্ট সময় দিয়ে সমস্যাগুলির আলোচনা করতে হবে, সেজন্য চাঁদা তুলে তাদের এক বেলার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এক একজন দায়িত্বশীল কর্মীর নেতৃত্বে ভলন্টিয়াররা সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে। সুশৃংখলভাবে কাজ হচ্ছে। উৎসাহ যথেষ্ট।

বিভিন্ন সম্মেলনে প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েকেও দেখা গেল। বেশি নয় কিন্তু আছে। মধুখালি অঞ্চলে ছিল মেনকা, যমুনা এবং মোল্লাপাড়ার মধ্যবয়সী সর্দার খেতমজুর সীতা। আর মোহনগঞ্জ অঞ্চলে ছিল উমা, কোকিলা ও বুলি ছাড়া আরো

দুজন। তাদের দেখে রহীম খুশী তো হ'লই, একটু বিস্মিতও হ'ল। এতটা আশা করেনি সে। তাদের মধ্যে সীতা ও মেনকাকে এবং উমাকে আলোচনায় যোগ দিতে দেখে সে আরো বিস্মিত হ'ল। সীতার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল সম্মেলনেই। সে এসেছে বংশীর প্রচারের ফলে।

প্রতিনিধিরা পারতপক্ষে অনুপস্থিত থাকেনি। আলোচনাতেও অনেকেই যোগ দিলে। কথা বেশি বলতে পারে না দু চারজন ছাড়া, কিন্তু কাজের কথাটা মোটামুটি প্রকাশ করে। প্রতিনিধিদের মধ্যে ভাগচাষীর সংখ্যাই বেশি, তবে মজুরের সংখ্যাও ভালো। ছোট এবং মাঝারি চাষীও বেশ আছে। বড় চাষীর সংখ্যা কম। আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ইউনিয়ন কৃষক কমিটি নির্বাচনের কাজ শৃংখলার সহিত সম্পন্ন হ'ল।

খাবার সময় দেখা গেল সমস্ত প্রতিনিধিই একসঙ্গে বসেছে। এবার আর মুসলমান আর বোষ্টম বা সর্দার বলে কোন কথা তোলেনি কেউ। বংশীও বসেছে অন্য সকলের মতো। কেবল রহীমের পরামর্শে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন বাড়িতে বাড়ি পিছু একজন করে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে তাদের বিব্রত হতে না হয়।

প্রতিনিধিদের সভায় উৎসাহ যতই হ'ক, সে সভা সীমাবদ্ধ ছিল অল্প লোকের মধ্যে। সাধারণ কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেল জনসভায়। তাতে বিপুল জনসমাবেশ। কোন কর্মীই এতখানি আশা করতে পারেনি, রহীমও না। দেখেশুনে রমেশ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহ দেখা গেল প্রাদেশিক নেতারও। তিনি মন্তব্য করলেন, আনকোরা এলাকা, নতুন আন্দোলন, সেই কারণেই এত লোকের সমাবেশ।

রহীম হেসে বললে, সেটা আংশিক সত্য কমরেড।

আসলে বড় সমাবেশের প্রধান কারণ ছিল শোষণের তীব্রতা, ব্যাপক অভাব, দারিদ্র ও বেকারি। আর ছিল গত কয়েক মাসের সাধনার পরিণতি—সর্বত্র সচেতন ও সুশৃংখল কর্মী তৈরির প্রচেষ্টার

ফল। তারা ব্যাপকভাবে প্রচার না করলে লোকে জানতে পারত না জমায়েতের খবর, বুঝতে পারত না তার তাৎপর্য এবং তাদের জীবনে তার গুরুত্ব। এই হ'ল রহীমের বক্তব্য।

যাই হ'ক, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত জেনে এবং নেতাদের বক্তৃতা শুনে সকলেই উৎসাহিত হয়ে ফিরে গেল। পরে রমেশ উৎসাহিত হয়ে রহীমকে বললে, কমরেড, পূর্বে কখনো আসিনি আবাদ এলাকায়। এখানকার এই অবস্থা জানতে পারলে আমি নিজে চেষ্টা করে অনেক আগেই আপনার কাছে এসে হাজির হতাম।

এক একটা সম্মেলন শেষ হলে বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে বসে পর্যালোচনার ব্যবস্থা করলে তারা। তার প্রস্তুতি থেকে জনসভা পর্যন্ত কী কী গলদ দেখা গেছে, ভবিষ্যতে যাতে সে সব গলদ না হয় তার ব্যবস্থা, নেতাদের কাজের বা বক্তৃতার মধ্যেকার ত্রুটি কি কি দেখা গেছে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মন খুলে সমালোচনা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হ'ল। অনেকে করলেও সমালোচনা। এই পদ্ধতি সকলের মনে আরো উৎসাহের সঞ্চার করলে। জনসভায় স্থানীয় সাধারণ কর্মীদের বলতে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যারা বলেছিল তাদের মধ্যে সকলে নিজেদের বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারেনি। ভবিষ্যতে যাতে তেমন কর্মীদের আগে থেকে প্রস্তুত করে বলতে দেওয়া হয় সেজন্যও দাবি উঠল। সম্মেলনগুলি থেকে যেমন তেমনি এই বৈঠক থেকেও রহীম ও রমেশ শিক্ষা গ্রহণ করলেঃ জানতে হবে কর্মীরা কী বলে, কৃষকরা কী চায়।

এর পর তারা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ কর্ম আরম্ভ করা হয় যাতে সেজন্য কতকগুলো কেন্দ্রে গিয়ে সাহায্য করলে। স্থানীয় নেতাদেরও সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠানো হ'ল। তাছাড়া সম্মেলনের কাজের মধ্যে দিয়ে যেসব নতুন কর্মী ও ভলান্টিয়ার বেরিয়ে এল তাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে আলোচনা করে তালিমের ব্যবস্থা করা হ'ল, তাদের সচেতন কর্মী হিসাবে তোয়ের করার কাজ চলতে লাগল॥

তার ফলে এত নতুন নতুন উৎসাহী লড়াকে কর্মী পাওয়া গেল যে তাদের যথেষ্ট তালিমের ব্যবস্থা করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তবে স্থানীয় নেতাদের উপর অনেক পরিমাণে সেই দায়িত্ব দেওয়াতে সুরাহা করা গেল। তাসত্ত্বেও দুটি বিষয়ের বড় অভাব বোধ হ'ল; তালিম দেবার জন্য আরো শিক্ষিত কর্মীর সাহায্য এবং সরল ভাষায় লেখা যথেষ্ট বাংলা বই প্রয়োজন।

রমেশ রহীমকে পূর্বের মতো রহীম সাহেব না বলে এখানে অন্য সকলের মতো শুধু কমরেডই বলে। অবস্থাটা দেখে সে বললে, কমরেড, এত কর্মীর জন্যে যথেষ্ট তালিমের ব্যবস্থা করা তো অসম্ভব ব্যাপার মনে হচ্ছে। আমি ভাবছি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে থেকে, বিশেষ করে যারা একেবারে নিরক্ষর লোক তাদের মধ্যে থেকে বেশি কর্মী না পেলেও তো চলে। যারা ইতিমধ্যে তোয়ের হয়েছে তাদের দিয়ে সমিতির কাজ চলতে পারে বলেই আমার ধারণা। নইলে বাইরে থেকে শিক্ষিত কর্মী আনার ব্যবস্থা করতে হয়।

রহীম হাসলে। বললে, এ বিষয়ে আমি তোমার মত ঠিক সমর্থন করতে পারছি না রমেশ। বাইরে থেকে তোমার মতো একজন কমরেডকে এখানে পেতে আমার প্রায় এক বছর লেগে গেছে। আরো কাউকে পেতে হলে কতদিন লাগবে জানি না। অতএব বাইরের ওপর আমার বেশি ভরসা নাই। অথচ সমিতিকে যদি এখানে স্থায়ী আর শক্ত বুনিয়াদের ওপর খাড়া করতে চাও তাহলে গ্রামে গ্রামে কর্মী আর ভলন্টিয়ারের ঘাঁটি গড়ে তুললে হবে। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও রাখতে হবে। তবেই দেখবে কৃষক সমিতি জনমজুর আর কৃষকদেরই নেতৃত্বে চলছে, অসংখ্য মজুর আর কৃষক এসে যোগ দিচ্ছে তার মধ্যে। সেই সব নেতা আর কর্মীদের পেতে হবে মজুর আর কৃষকদেরই মধ্যে থেকে, তালিম দিয়ে তোয়ের করে নিতে হবে।

রমেশ। আপনি যা চান তা আমি সমর্থন করি। কিন্তু সেটা তো ভবের কথা। সেটাকে বাস্তবে সম্ভব করতে হবে তো।

রহীম। আমি বাস্তবের কথা বিবেচনা করেই বলছি, তত্ত্বের কথা নয়। আজ তুমি আবাদের যে চেহারা দেখছ এটা বছরখানেক আগে, মানে আমি কাজ শুরু করার আগে অবশ্য দেখতে পেতে না। এর কৃতিত্ব তো এখানকার কৃষকদেরই। অবশ্য আমার বা অন্য কারো সাহায্য না পেলে তারা আপনা থেকে হয়তো এই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারত না। কিন্তু তবু যা করেছে তারাই তো করেছে। আর করেছেও যখন নমুনা হিসাবে কিছুই ছিল না তাদের সামনে সেই অবস্থায়। এখন করা তার চেয়ে সহজ। তাই দেখতে হবে তাদেরই দ্বারা যাতে নতুন লোক তোয়ের করানো যায়। তাতে তোমার আমার সাহায্য এখনো দরকার হবে। আর তোমাকে আমি এখনো সঙ্গে রেখেছি তুমি নতুন এসেছ বলে। এর পর তোমাকে দায়িত্ব নিয়ে আলাদা থেকে কাজ করতে হবে, আমরা দুজনে এক সঙ্গে থাকলে চলবে না।

রমেশ। আপনি যা করেছেন, আমি কি তাই পারব?

রহীম। কেন পারবে না? আর একটু আত্মবিশ্বাস থাকলেই পারবে। প্রধান কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে গেছে। কর্মীরাও অধিকাংশই চেনে তোমাকে। এখানকার কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধেও তুমি যথেষ্ট ওয়াকেফহাল হয়েছ। এখন তুমি দায়িত্ব নিয়ে নিজ উদ্যোগে কাজ করবে। কর্মী আর এলাকা যা আছে তাকে আরো পাকা করবে, সংহত করবে, আর নতুন এলাকায় ঢুকে নতুন কর্মী তোয়ের করে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকবে। এই তো তোমার কাজ এখন। আমারও তাই।

কয়েকদিনের মধ্যেই তারা পৃথক হয়ে গেল। রমেশ যাবার সময় রহীম বললে, আমার মূল ঘাঁটি তুমি দেখেছ। তুমিও এমনি একটা মূল ঘাঁটি বেছে নেবে নিজের সুবিধে বিবেচনা করে। এই দুই ঘাঁটির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে ভলন্টিয়ারের মারফতে। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ এখন নিয়মিত, কাগজও আসছে। কাগজ পেলে দেখে তোমাকে পাঠাব। তেমন দরকার পড়লে তুমি

চলে আসবে এখানে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সর্বত্রই হবে, তবে আমার মতো নুনপান্তা খেতে অভ্যাস ক'রো, নইলে শুকিয়ে মরবে। কিন্তু কোন গ্রামে বা কোন বাড়িতে একটানা বেশি সময় কাটাবে না। এ যা এলাকা, হামেশা ঘুরে বেড়াতে না পারলে কাজ এগোবে না। আর প্রাথমিক ইস্কুল-পাঠশালার শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চেষ্টা করবে। তারা অধিকাংশই কৃষক এবং স্থানীয় লোক। এখানে শিক্ষিত লোক বলতে ওরাই।

রমেশ। এর মধ্যে কোন আন্দোলন হবে না?

রহীম। হবে। সম্মেলনের যা সিদ্ধান্ত আছে তাই নিয়ে হবে। এবার দেখছ তো ধানের দর বেশ একটু চড়েছে। কাজেই মজুরী বাড়ানো দরকার। আর কর্জ ধানের সুদ কমাবার চেষ্টা করতে হবে। কীভাবে হবে আন্দোলন সেটা অবস্থা আরো একটু বুঝে ঠিক করা যাবে। ইতিমধ্যে মহাজনদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথাটা প্রথমে ভাগচাষীদের দিয়েই বলাতে হবে। তারা ছোট ছোট দল করে যাবে মহাজনদের কাছে। কঠিন কাজ। গরজ তো চাষীরই; খোরাকীর ধান পেতেই হবে তাকে।

বর্ষার পূর্বে ধানের দর আরো বাড়ল। বড় বড় চাষী ও মহাজনদের সঙ্গে কথা বলে মজুরী বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা গেল, তবে দর অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি কিছু কমই হ'ল। বিভিন্ন এলাকায় জনসভা ডেকে সমিতি থেকে সে কথা প্রচার করা হ'ল। বলা হ'ল আপাতত এই হার মেনে নেওয়া হচ্ছে নিম্নতম হার বলে, পরে বাড়াতে হবে।

সুদের হার কিন্তু মহাজনরা কমাতে রাজি নয়। কেবল কোথাও কোথাও ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন মহাজন সামান্য কমাতে রাজি হ'ল, তাও মাত্র হাল সনের জন্য। তারাও আবার ছোট ছোট মহাজন। এই সুবিধাটা পেলে অল্প কৃষক।

বর্ষা আরম্ভ হতেই রহীম স্থানীয় নেতাদের এবং রমেশের কাছে

বললে সে এইবার এলাকা ছেড়ে কলকাতা যাবে। গত বছরের মতো মাস তিনেক পরে ফিরবে আবার। রমেশকে বললে, তুমিও এ সময়ে যেতে পার, তবে ইচ্ছা করলে থাকতেও বাধা নাই। অবশ্য এখন কাজ কিছু করা যাবে না এখানে, সকলেই ব্যস্ত থাকবে চাষের কাজে।

কুড়ি

দিনটা যে রবিবার তা খেয়াল ছিল না তার। বিকালে জবর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর মনে হ'ল আকাশ একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। এই ফাঁকে রহীম মাথায় ছাতা, পায়ে রবারের জুতো দিয়ে বেরোল ধাপার বাড়ির পথে।

ভিতরে গিয়ে দেখলে চওড়া বারান্দায় টেবিলের পাশে বসে আছে হাতেম, মরিয়ম ও লোকমান। লোকমানকে দেখে তার মনে পড়ল এটা রবিবার। ভাবলে রহীম ভালোই হ'ল, ওর সঙ্গেও দেখাটা হয়ে গেল। হাতেম ও মরিয়মের সস্নেহ অভ্যর্থনা পেয়ে বসল সে। লোকমান বললে, কবে এলে?

রহীম। কাল। তোমাদের বাড়ির খবর ভালো।

মরিয়ম। বুবুর না কি বাত হয়েছে? খবর দিয়েছে রোস্তম।

রহীম। হ্যাঁ মামীমা। বাত বলেই আমার মনে হ'ল। গাঁটে গাঁটে ব্যথা একটু একটু হচ্ছে কিছুদিন থেকে। তবে সব সময় থাকে না। লোকমান, তোমার প্রেসের কাজ কেমন চলছে?

লোকমান। চলছে ভালো। কাজ আস্তে আস্তে বাড়ছে।

তারা চায়ের প্রতীক্ষায় বসে ছিল। জাহানআরা চা ও কিছু নাশতা নিয়ে এল। রহীমের আওয়াজ পেয়ে তার জন্যও এনেছে। রহীম কুশল প্রশ্ন করলে তাদের দুজনের। সে কেবল সংক্ষেপে জবাব দিলে, ভালো আছি। বুবুও ভালো আছে।

চা খাবার সময় সামান্য দু চারটে কথা হ'ল হালকাভাবে। একটু পরে লোকমান উঠে গেল। রহীম লক্ষ্য করলে সে তাকে এলাকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে না, প্রেসের জন্য তার সাহায্যের কথাও কিছু বললে না। যেন একটু উপেক্ষার ভাব। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

হাতেম বললে, এবার তো অনেক দিন বাইরে থাকলে মনে হয়। সেই শীতের সময় গিয়ে মাঝে আর তো ফেরনি?

রহীম। জি না, মাস পাঁচেকের বেশি ছিলাম এবার।

হাতেম। থাকবে তো এখন কলকাতায়?

রহীম। বর্ষার তিনটে মাস থাকতেই হবে।

মরিয়ম। এখানে তেমন কোন কাজ তো নেই তোমার?

রহীম। না, লেখাপড়া একটু করব আর কি। কাজ বরং এখন আগের তুলনায় কমেছে।

মরিয়ম। কমেছে কেন?

রহীম। আলাপ-আলোচনা এখন নাই বললেই হয়। নেতারা কিছু ধরা পড়েছেন আর কিছু লুকিয়ে গেছেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে তাঁদের ওপর।

হাতেম। তোমাকে ধরবে না?

রহীম। না মামু, ধরবে না-ই মনে হয়। কেউ লাগা দেখিনি এখনো। কলকাতায় কিছু করি না তো এখন। আর আবাদে এপর্যন্ত পুলিসের আনাগোনা দেখা যায়নি। ওদের কাছে সেখানকার আন্দোলনের গুরুত্ব নাই এখনো।

মরিয়ম। ধরা না পড়লেই ভালো বাবা। তাহলে তুমি এখন আবার ওদের পড়াতে পারবে তো?

রহীম। পড়াতে কেন পারব না মামীমা? ফুরসতের তো অভাব নেই।

মরিয়ম। ভালো হ'ল বাবা। মেয়েটার লেখাপড়ার শখ খুব। বড়ও আবার বসে তার সঙ্গে। আচ্ছা, একটা কাজ কর না বাবা। এই বর্ষাবাদলের দিনে রোজ রোজ বাসা থেকে আসা যাওয়া না করে এখানে থাকলেই তো পার। তাহলে গত বছরের মতো ও অনেক বেশি সময় পেতে পারবে।

রহীম। না মামীমা, সেজন্যে ভাববেন না। আসা যাওয়ায়

আমার কোন কষ্ট নেই। ওরা যত সময় চায় আমি দিতে পারব। দরকার হয়, দুবার করেও আসব রোজ।

হাতেম। এখানে থাকলে তোমার অসুবিধে কী?

এই সময় লোকমান এসে বললে হাতেমের সঙ্গে দেখা করার জন্য কারা এসেছে বাইরে। আসার সময় হাতেমের কথা তার কানে গেল। বললে, রহীম কী থাকছে এখানে?

মরিয়ম। থাকবার কথাই তো বলছি, তাতে মেয়ে দুটোর পড়ার সুবিধে হয়। ও তাতে রাজি নয়।

লোকমান বললে রহীমকে, থাকলে তোমার ক্ষতি কী?

রহীমের মনে পড়ল সে এক সময় তাকে বলেছিল এ বাড়িতে তার যাতায়াত কম করার কারণ জাহানআরা তখন বড় হয়ে উঠছিল। তবু লোকমান তার এখানে থাকা সমর্থন করে কেন? তাকে যাচাই করবার উদ্দেশ্যে না কি?

সে হেসে জবাব দিলে তুমি তো জান আমার বাসাটায় অনেক কাল আছি। একটা মায়া জন্মে গেছে। দেখছ না বাইরে গেলেও ভাড়া চালাই, ছাড়তে পারি না?

হাতেম ও লোকমান বেরিয়ে গেলে মরিয়ম বললে, তুমি বাবা, বড্ড একগুঁয়ে ছেলে, আমার কথা কিছুতেই শুনতে চাও না। আমার কাছে থাকলে তোমার বাপের কী সর্বনাশটা হয় বলতো?

রহীম হেসে ফেললে। বললে, সকলের কথাই শুনি, খালি আপনারটাই শুনতে চাই না, তাই না মামীমা? আপনার ওপরই যে আমার যত রাগ, দু চক্ষে দেখতেই পারি না আপনাকে!

মরিয়মও হাসলে। বললে, যাও তুমি ঐ সব বাজে কথা বলে আমাকে ভুলোতে চাও। আমরা সবাই যখন বলছি, কেন তুমি থাকবে না বলতো?

রহীম মুখ গম্ভীর করে আস্তে আস্তে বললে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন মামীমা। আমার এখানে থাকা নিয়ে কথা উঠতে পারে। লোকে তো জানে না ভেতরের সমস্ত খবর। জানলেও

সমাজের বিচারে বাধা রয়েছে এখনো। কাজেই কেউ কোন প্রশ্ন তুললে সেটা অবাঞ্ছনীয় হবে—সকলের দিক থেকেই। আরো একটা কথা আছে। আমাকে এখন ধরবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু যদিই কোন কারণে ধরা পড়ি তাহলে আমার ইচ্ছে নয় যে আপনারা তাতে কোন রকমে জড়িত হন। তার জন্যেও আপত্তি করছি। নইলে আপনার কাছে থাকার ইচ্ছে কি আমার কম মনে করেন আপনি ?

মরিয়ম উঠে গেল। বলে গেল, ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সময়-টময় যা ঠিক করতে হয় করে নিয়ো। তোমার যাতে সুবিধে হয় তাই করবে।

নূরজাহান প্রথমে হাসতে হাসতে এসেই আক্রমণ করলে, যা হ'ক ভাই, আপনি যে কী মানুষ বোঝাই মুশকিল। এবার তো প্রায় অদ্দেক বছর কাটিয়ে এলেন। চা তো পাচ্ছেন না। পান্তা খাচ্ছেন এখন ?

রহীম। কী করি বুবু, বল ? পান্তা না খেলে বেলা ছুটো পর্যন্ত যে শুকিয়ে থাকতে হবে। তাহলে তো মরেই যাব।

নূরজাহান। জাহানআরাকে আবার পড়াবেন নিশ্চয় ? এবার কিন্তু আমাকেও পড়াতে হবে ভাই। আমি কিছু কিছু পড়ব। ও যে রকম খাটে অত খাটতে পারব না আমি। ও কিন্তু ভালো পড়াশুনা করছে, দেখবেন আপনি।

জাহানআরা এসে বসল। তার সঙ্গে কথা বলে রহীম দেখলে সে এবারেও আগের মতোই অগ্রসর হয়েছে। তার তালিকা মতো নতুন বইও কিনেছে এবং পড়েছে।

সে তার পরদিন থেকেই পড়ানো আরম্ভ করলে। তার অনুরোধে একটা কাগজে লিখে দিলে জাহানআরাকে কোন্ কোন্ বিষয় কতখানি শিখতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বইয়েরও তালিকা করে দিলে। নিজে দোকানে গিয়ে দেখেশুনে বই কিনেও আনলে।

একদিন জাহানআরা বললে, এখন আমাকে একটু রাজনীতির বই পড়ে বুঝিয়ে দেবেন?

রহীম অবশ্য বুঝলে সে কোন রাজনীতি জানতে চায়। সেজন্য কয়েকখানা বই তাকে এনে দিলে। অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শনের মূল কথাগুলি কয়েকদিন ধরে তার কাছে ব্যাখ্যা করে এবং নোট করিয়ে বইগুলো হিসাব মতো পর পর পড়তে বলা হ'ল। সেজন্য তার অন্য শিক্ষার কাজ থেকে কিছু সময় বার করে নেওয়া হ'ল। বই পড়ে রহীমের কাছে বুঝিয়েও নিলে সে।

ইংরেজী পড়তে গিয়ে একদিন জাহানআরা বললে, ইংরেজী কবিতা আমি খুব কমই পড়েছি। কিন্তু শেকসপীয়ারের নাম যেখানে সেখানে দেখি। আমাকে তাঁর কবিতা একটু পড়িয়ে দেবেন?

এটা তার শখের কথা বলেই মনে হ'ল রহীমের। তাহলেও সে কয়েকটা সনেট পড়ে বুঝিয়ে দিলে। আসলে এটা কেবল তার শখেরই কথা ছিল না। একদিন তাকে ইংরেজী পড়তে দেখে লোকমান ঠাট্টা করেছিল, এতদূর পড়েছিস অথচ শেকসপীয়ারের কিছু পড়ালে না রহীম! সে নিশ্চয় ফাঁকি দিয়েছে তোকে। কিন্তু লোকমানের তামাসার কথা সে বললে না রহীমকে।

রহীমের কাছে পড়া আরম্ভ করবার অল্পদিন পরে একদিন রহীম এল না দেখে জাহানআরা চিন্তিত হ'ল, তার অসুখ হ'ল না কি? নূরজাহান ও মরিয়মও বললে তাই। লোকমান বললে, আমার বোধ হচ্ছে খবরটা শোনবার পর সে আর আসতে চায়নি, মানে সোবিয়েত দেশের ওপর ফাশিস্টদের আক্রমণ করার খবর। লোকমানের ধারণা ঠিকই ছিল। দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কোন কাজে তার মন বসছিল না সেদিন। লোকমান নিজেও উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে এমনি আরো একদিন এল না রহীম — রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শোকযাত্রায় যোগ দিয়েছিল বলে।

এর কিছুদিন পরে একদিন সকালেই রহীমের মেসের একজন কমরেড এসে লোকমানকে খবর দিলে সেদিন ভোরে পুলিস এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। ভারত রক্ষা আইনে আটক রাখা হবে তাকে।

লোকমান এসে মরিয়মকে বললে। জাহানআরা তার নিজের ঘরে কী করছিল, শুনতে পেয়ে বিছানায় বসে পড়ল, স্তব্ধ হয়ে রইল। তার মা গিয়ে তার পাশে বসতেই সে দেখলে তার চোখে জল। সে মায়ের বুকে মাথা রেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করলে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে পাছে অন্য কেউ দেখতে পায়। চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে বললে, এতদিন যে ধরেনি তাই ভালো। মরিয়ম তখন নূরজাহানকে বললে রান্নাঘরে গিয়ে। সকলেই আফসোস করলে। অবশ্য এটা যে ঘটতে পারে তা এক রকম ধরেই নিয়েছিল তারা।

রহীম আটক থাকা কালেও জাহানআরা তার নির্দেশ অনুসারে লেখাপড়ার কাজ নিয়মিত চালিয়ে গেল। এখন অবশ্য প্রত্যেক বিষয়ে তার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, যা শিখেছে তাতে নিজে বুঝেও কাজ করতে পারে। সুতরাং শিক্ষায় তার তেমন ব্যাঘাত হ'ল না।

এই সময়টায় জেলে বসে রহীম নিজেও পড়াশুনা করলে। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডের সাহায্যে অর্থনীতি ও দর্শনটা আগের চেয়ে ভালো করে শিখলে। তাছাড়া প্রয়োজন মতো আরো রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি পড়লে। কিছু লেখার কাজও করলে।

প্রায় একটা বছর জেলে কাটিয়ে সে মুক্তি পেলে। তার অল্পকাল পরে সরকারী ঘোষণায় তার পার্টি বেআইনী থেকে আইনী পার্টিতে পরিণত হ'ল।

জেল থেকে বেরিয়ে সে এসে উঠল তার মেসে। কিন্তু দেখলে ঘরখানা অন্য একজন দখল করেছে। আগে থেকেই আছে সে মেসে,

তার অপরিচিত লোক নয়। সে জেলে থাকতে ভাড়া দিয়ে ঘর রাখতে পারে নি, কাজেই অপরের দখলে যাবারই কথা। তাহলেও তার কামরা তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সে আবার পূর্বের মতোই থাকতে লাগল। সেজন্য দিন দুই দেরি হ'ল অবশ্য। ঐ দুদিন মেসেরই দুজন কমরেডের সঙ্গে সে অন্য কামরায় থাকল।

রহীম বেরিয়ে এসে দেখলে কলকাতা শহরে যুদ্ধের হাওয়া বেশ বইছে। মিলিটারির দৃশ্য যেখানে সেখানে। ব্যবসা-বাণিজ্য জোর চলছে। লোকমান তার প্রেসে কাজ নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। মেসিনও কিনেছে আর একটা। প্রেসের ও আফিসের কাজে আরো লোক নিয়েছে।

তার পার্টি আইনী বলে ঘোষিত হবার পর রহীম দেখলে পার্টি মহলেও আবহাওয়া বদলে গেছে। তার মতো বন্দী কমরেডদের যেমন মুক্তি হয়েছে, তেমনি গোপন কর্মীদেরও পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, তাঁরা অনেকেই বেরিয়ে এসেছেন। প্রকাশ্য আফিস খোলা হয়েছে পার্টির বোর্ড লাগিয়ে। কমরেডদের মধ্যে তৎপরতা ও চাঞ্চল্য দেখে অবস্থার পরিবর্তনটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আবাদ এলাকা সম্বন্ধে রমেশের সঙ্গে আলাপ করলে রহীম। তার কাজকর্মের কথা শুনে সে খুশী হতে পারলে না, তবে এলাকার অবস্থা খারাপ মনে হ'ল না। রমেশ সেখানে মাঝে মাঝে গেছে বটে কিন্তু একা থাকতে উৎসাহ পায়নি। এক একবার গিয়ে অল্প দিন থেকে ফিরে এসেছে, আবার গেছে। কিন্তু যে সমস্ত পার্টি ইউনিট ও কৃষক কমিটি তোয়ের করা হয়েছিল রহীম বাইরে থাকতে, সেগুলো তাদের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সভা ডাকা হয়, অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তারা। কিছু কিছু আন্দোলন ও সংগঠনের কাজও করেছে।

গত মরশুমে ধান ভালো হয়েছিল, তবু ধানের দর কমেনি,

বরং বেড়েছে। সেজন্য এবারও স্থানীয় নেতারা উত্যোগী হয়ে জন-মজুরদের মজুরী কিছু বাড়িয়ে নিয়েছিল। সমিতির মেম্বরও সংগ্রহ করা হয়েছিল আগের বছরের চেয়ে বেশি।

তবু যে রমেশের উৎসাহে ভাটা পড়ল কেন রহীম তখন বুঝতে পারলে না। বুঝলে এলাকায় যাবার পর। কয়েকজন কমরেড তাকে রমেশ সম্বন্ধে যা বলে তার অর্থ হ'ল সে মাতব্বরী চালে কথাবার্তা বলত, নিজে যথেষ্ট কাজ না করে অপরকে হুকুম দিয়ে করাতে চাইত। তার এই ব্যবহার কৃষকদের খুশী করতে পারেনি, বরং খোলাখুলি কিছু না বললেও তারা অনেকে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। রহীমের আচরণ দেখবার পর রমেশের এই আচরণ বিসদৃশ ঠেকেছিল, তাদের ক্ষুণ্ণ করেছিল।

রহীম ঠিক করলে রমেশকে নিয়ে কয়েকদিন পরেই সে যাবে তার এলাকায়।

মুক্তির পর বেরিয়ে এসে যখন সে হাতেমের বাড়ি গেল, সকলেরই নিকট সে অভ্যর্থনা লাভ করলে। কী আন্তরিকতা তাদের সে অভ্যর্থনায়! রহীম মুগ্ধ হ'ল। সে তাদের কাছে জেল থেকে কোন চিঠিপত্র লেখেনি—ইচ্ছা করেই; তাদের জড়িত করতে চায়নি সে। কিন্তু সেজন্য তাকে ভুলে যায়নি কেউ, তার মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং বেড়েছে। এখন সকলে তাকে ঘিরে বসে জেলের অভিজ্ঞতা শোনাতে বললে।

কিছুক্ষণ পরে সে তাদের পারিবারিক কথা ও রোস্তমদের খবর জিগ্যেস করলে। নূরজাহান বলে গেল, আমি নাশতা আনছি ভাই, আপনি ততক্ষণ গল্প করুন। আর রাতে খাবেন এখানে।

তার বাসার অসুবিধার কথা শুনে মরিয়ম বললে, তুমি এখানে চলে এস না বাবা। শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ কেন সেখানে?

কষ্ট কিছু না মামীমা। দুদিন পরেই তো ফিরে পাব ঘরটা, বললে রহীম।

ব্যথিতভাবে মরিয়ম বললে, আচ্ছা বাবা, তাই ভালো। আমি আর কী বলব বল!

এতদিন জেলে থাকার পর রহীম ফিরে এল। এসেও সে তার সামান্য কামরাটার দখল পেলে না, কবে পাবে কে জানে! তার এ কষ্ট লাঘব করার জন্য যেটুকু সাহায্য মরিয়ম করতে চায় তাও সে নিতে প্রস্তুত নয় এখনো। তার যে যুক্তিসংগত কারণ আছে তাও সে ভুলে যায়নি। সেজন্য যে জোর করে নিজের দাবি খাটাতে পারছে না রহীমের উপর, তাতে আরো বিষণ্ণ বোধ করছে।

তাই সে ভাবে এই কারণটাকে এখন দূর করা দরকার। মেয়েকেই বা আর কতকাল প্রতীক্ষার মধ্যে বসিয়ে রাখা যায়? রহীমকেই বা এইভাবে থাকতে হয় কেন? জেলে ছিল বাধ্যবাধকতার মধ্যে, আজ তো সে অবস্থা কেটে গেছে। তার পার্টিকেও এখন আর আগের মতো দম-আটকানো অবস্থায় থাকতে হচ্ছে না। তবে আর বিলম্ব কেন?

পরদিন রহীম এলে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে মরিয়ম নিরালায় বললে, হ্যাঁ বাপ, এখন তো তোমাদের বিপদ কেটে গেছে, অবস্থা স্বাভাবিক বলে শুনছি। মেয়ের লেখাপড়াও খানিকটা এগিয়েছে। এদিকে দেরিও হয়ে গেল অনেক। এখন কি কাজটা সেরে ফেলা উচিত মনে কর না? তোমার মামুও কাল বলছিলেন সে কথা।

রহীম একটু আবেদনের সুরে উত্তর দিলে, মামীমা, আপনারা এখন একথা বলতেই পারেন। আমারও এখন আর কোন ওজর খাটে না। তাছাড়া, জাহানআরার ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে আমিও হয়তো তার ওপর অবিচার করছি। তবে মামীমা, এতদিন তো কেটেছে, আর কিছুদিন একটু সবুর করুন। একটু সময় দিন আমাকে। আমি একবার আবাদ এলাকাটা ঘুরে আসি। তারপর আমার পার্টির মতটা নিয়ে জানাব। তখন আপনারা ঠিক করবেন কী ভাবে ফয়সলাটা প্রকাশ করা হবে। আর একটু সময় দিন আমাকে।

রমেশকে নিয়ে আবাদে গিয়ে পৌছল রহীম। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল আশপাশের গ্রামগুলিতে। অনেক কর্মী তখনি এল দেখা করতে। এতদিন পরে জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে দেখে সকলেই তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করলে। অনেকেই তাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ জানালে তাকে। রোস্তমের মা তার জন্য বিশেষ ভাবে খাবার ব্যবস্থা করলেন।

তারা বেরোল প্রধান কেন্দ্রগুলি দেখতে; বর্ষা এসে পড়েছে, সর্বত্র যাওয়া চলবে না। কর্মিদের এবং বহু কৃষকের নিকটও সর্বত্রই একই রকম অভ্যর্থনা পাওয়া গেল, তার মধ্যে একই রকম শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা। এই সফরের মধ্যে খাবার ডাকও এল বহু কৃষকের বাড়ি থেকে। বংশীর বাড়ি যমুনা তাকে না খাইয়ে ছাড়বে না। শিবুর বাড়ি মেনকাও বেশ ঘটা করে রান্না করে খাওয়ালে। বসন্ত গরিব ক্ষেতমজুর, সেও ছাড়লে না।

সীতা বললে, কমরেড, আমার ঘরে খাবে তো?

সীতাদিদি, তুমি কমরেড, বলছ, আবার তোমার ঘরে খাব কিনা জিগেস করছ। কেন বলতো? হেসে বললে রহীম। কখন খাওয়াবে বল? দুপুরে তো? বেশ, যাব দুপুরে।

সোনাপুরে, মোহনগঞ্জে একই অবস্থা। রহীম দেখলে খাওয়ানোর ডাকের মধ্যে সকলের আন্তরিকতা। কিন্তু কাজের খাতিরে সব ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললে সে কথা।

ইউনিয়ন কৃষক কমিটিগুলির সঙ্গে একে একে বসে অবস্থা শুনলে সে, নিজের বক্তব্য বললে। এখনি কোন কাজের প্রোগ্রাম নেওয়া হ'ল না অবশ্য। পার্টি ইউনিটগুলির সঙ্গেও আলাপ করলে। সুবিধামতো এক সঙ্গে কয়েকটা করে ইউনিটকে নিয়ে বসার ব্যবস্থা হ'ল। পার্টি এখন আর বেআইনী নয়। তাই বলে পার্টিকে যেন কৃষক সমিতিতে পরিণত করা না হয়, সে হুশিয়ারি দিলে। বললে পার্টি ইউনিট এবং কর্মীদের দায়িত্ব আর শৃংখলাবোধ যেন কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা না হয়, আগেকার সিদ্ধান্ত অনুসারেই যেন

ষোলআনা বজায় রাখা হয়। যদি কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তা পার্টির সাংগঠনিক নিয়ম অনুসারেই করতে হবে, ব্যক্তিগত ভাবে মর্জিমাফিক করা চলবে না। এই বিষয়ের প্রতি রহীম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলে এবং সে কথা বোঝবার জন্য কমরেড-দের নিকট শ্রেণী চেতনার প্রশ্ন নিয়ে আবার বিশদভাবে আলোচনা করলে, বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চরিত্র ব্যাখ্যা করে নিজেদের দায়িত্বের কথা তুলে ধরলে।

এই ধরনের আলোচনার সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়েকজন কমরেড রমেশের ব্যবহারের সমালোচনা করে। তারা বলে রমেশ পার্টি ইউনিটগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু কৃষক কমিটির মধ্যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়। কিন্তু তারা পূর্বে আন্দোলনের মুখে যে পদ্ধতিতে আলোচনা করেছে সেই ভাবে করতে চায়। তখন রমেশ তাদের কথা নাকচ করে তার উপদেশ মতো কাজ করতে নির্দেশ দেয়। তাই নিয়ে প্রধান ঘাঁটিগুলিতে মতবিরোধ ঘটে এবং স্থানীয় কর্মীরা নিজেদের মতকেই প্রাধান্য দেয়।

এমনি আরো কিছু কিছু কাজে তার সঙ্গে মতভেদ হতে থাকে বলে শেষে রমেশ বলে তাহলে তার এখানে থেকে কাজ করা কঠিন। তখন থেকে সে এলাকায় কম সময়ই থেকেছে। রমেশ বলে, তার ধারণা ছিল তার মতই সঠিক কিন্তু স্বীকার করে যে স্থানীয় কর্মীদের মত অনুসারে কাজ করে ভালো ফলই পাওয়া গেছে। রহীম তাকে বুঝিয়ে বললে তার একার মত সঠিক ভাবলেও তা না বুঝিয়ে অন্যদের উপর চাপানো ঠিক পদ্ধতি নয়।

আবাদের মরসুমের পরে আবার সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখে কলকাতা ফেরবার কথা ঠিক করেছে রহীম, সেই সময়ে এসে গেল এক তুফান। এই অঞ্চলে ঝড় হ'ল বটে তবে মারাত্মক অনিষ্ট করে যায় নি। তাই রিলিফের প্রয়োজন খুব বেশি হয়নি সেখানে।

কলকাতা গিয়ে সে জানতে পারলে তুফান এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে গেছে উপকূল অঞ্চলে। তখন কলকাতায় পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশে আরো একজন কমরেডের সঙ্গে তাকে ছুটতে হ'ল তার এলাকার আরো দক্ষিণে। সেখানে গিয়ে দেখে আসবে ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে এবং কী ধরনের রিলিফের প্রয়োজন।

তাদের রিপোর্ট পেয়ে কিছু রিলিফের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং সেই সঙ্গে রিলিফ সংগ্রহের চেষ্টাও চলতে লাগল। এ সম্বন্ধে তার কাজ হ'ল প্রধানত কলকাতায়। সুতরাং এখন আর তাকে বেশি বাইরে যেতে হ'ল না।

কয়েকদিন পরে সে মরিয়মকে বললে, এখন আর আমি আপনাদের দেরি করতে বলব না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমার সঙ্গে বিয়ের কোন কথা এ পর্যন্ত হয়নি আপনাদের, এখন আপনারা প্রস্তাব করতে চান, এই ধরে নিয়ে কথা বলতে হবে আপনাদের। সেটা কী ভাবে হবে ঠিক করুন।

কথাটা বলতে হবে লোকমান ও নূরজাহানকে এবং তাদের মত নিয়ে তারপর রহীমের নিকট বাকায়দা প্রস্তাব করতে হবে। দুজনে আলোচনা করে ঠিক করলে প্রথমে মরিয়ম নূরজাহানকে বলবে তারা রহীমের সঙ্গে জাহানআরার বিয়ে দিতে চায় এবং সেজন্য চেষ্টা করবে রহীমকে রাজি করতে। নূরজাহান খুব সম্ভব আপত্তি করবে না, বরং সহজেই মত দিতে পারে। তাহলে লোকমানকে বলা সহজ হবে।

লোকমানকেও একই কথা বলা হবে। সে যদি আপত্তি করে তাহলে বলতে হবে তাকে অন্য পাত্রের সন্ধান দিতে। পছন্দমতো পাত্র না দিতে পারলে রহীমের নিকটই প্রস্তাব দেওয়া হবে। রহীম অবশ্য প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হবে।

নূরজাহানকে বলা হলে তার মত পেতে দেরি হ'ল না, বরং সে উৎসাহের সহিত মায়ের প্রস্তাব সমর্থন করলে। পরে সেইদিনই মরিয়মের উপস্থিতিতে হাতেম বলে লোকমানকে। লোকমান একটু

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপত্তি জানায়। তার সোজা কথা হ'ল রহীম পরিবার প্রতিপালন করবার মতো উপায়-উপার্জন করে না, রাজনীতিক কাজে বেশি জড়িয়ে আছে এবং সে নিজেও হয়তো মত করবে না। তবে সে স্বীকার করলে কোন বিকল্প পাত্র তার সন্ধানে নাই, খোঁজ করবার মতো ফুরসতও নাই।

তার উত্তরে হাতেম কায়দা করে বললে, রুজি-রোজগারের কথা ভাবছি না। খোদা চালানেওয়ালা, দিন তার চলেই যাবে। তবে আমার মেয়ের কিছু সংস্থান করে দিতে পারলে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত খোদা বজায় রাখবে। রাজনীতিক কাজ যেমন করছে করবে সে, তাকে তো ছেড়ে দিতে বলা যাবে না। তবে এখন আর আইনের বাধাটা নেই, তাতে বিপদ কেটে গেছে। শুধু সে এখন রাজি হলে হয়। আমরা কথা বলে দেখব। রাজি করতে হবে তাকে। ছেলেটা খুব ভালো। তোরই দোস্ত, তুইই তো এনেছিস ওকে, নইলে আমরা তো চিনতামই না।

লোকমান নিরস্ত্র হয়ে গেল। সে কেবল বললে, ধর রহীম না হয় রাজি হ'ল। জাহানআরারও মতটা নেয়া দরকার নয় কি? তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

তা নিতে হবে বৈ কি, জবাব দিলে হাতেম। তোর মামী কথা বলবে তার সঙ্গে। আগে নূরজাহানের আর তোর মত নেয়া দরকার ছিল, তা পাওয়া গেল এখন। এবার ওদের দুজনের মত পেলেই তো ঝামেলা চুকে গেল বাপু। তখন দিন ধার্য করে আকদের বন্দোবস্ত করা যাবে।

সুতরাং এখন আর পরিবারের মধ্যে কারো মতের অভাবে বিয়ে ঠেকে থাকল না। আনুষ্ঠানিক ভাবে রহীম ও জাহানআরাকে রাজি করা হ'ল, অর্থাৎ নূরজাহান ও লোকমান কী বলেছে তাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

তারপরই রহীম তার পার্টির মতও সংগ্রহ করলে এবং মরিয়মকে জানিয়ে দিলে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েটা অবশ্য রহীমের ইচ্ছা মতো হ'ল না। হাতেম ও মরিয়ম তার ইচ্ছা মেনে নিতে পারলে না। তবে আপসে ঠিক হ'ল যে সাধারণ সামাজিক রেওয়াজ মূলত বজায় রেখে কিন্তু কিছু কিছু অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। সেই ব্যবস্থাই করা হ'ল এবং কাজি এনে কাবিননামা রেজিস্ট্রি করানোও হ'ল।

জাহানআরার বিয়েতে যে সমস্ত মেহমান এসেছিল তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। রোস্তমের মা বোন আর হাতেমের ভাইপোদের বাড়ির মেয়েরা ছাড়া আর দুচার জন মাত্র। মরিয়ম তার ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়নি বলে সেই রাগে তার ভাইয়ের বাড়ি থেকে মেয়েরা কেউ আসেনি। অন্য আত্মীয় মেয়েরাও অনেকে নানা কারণে আসতে পারেনি। পুরুষরা প্রায় সকলেই বিয়ের পরদিনই চলে গেল। যে মেয়েরা এসেছিল তারাও দুচার দিন পরে বিদায় নিলে। তখন থাকল শুধু রোস্তমরা —সে, তার মা, বোন আর ভাই দায়েম। দিন কয়েক পরে তারাও বিদায় নিলে।

সেদিন বিয়ে বাড়ির ঝঞ্ঝাট মোটামুটি চুকে গেলে মেয়েদের মধ্যে এই বিষয় নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল। রোস্তমের মা বিয়েটা রহীমের সঙ্গে হবে খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। এখনো বললেন, দেখ বৌ, তোমার বেটির কেসমত ভালো বলতে হবে। রহীমের মতন অমন ছেলে কি পাওয়া যায়? আমি দেখছি তো কদ্দিন থেকে। খালামা বলতে অজ্ঞান। দায়েম তো তার কাছে লেগেই আছে। তোমাকে, হাতেমকে বড্ড মানে আর আমাদের আবাদের যেত লোক, হিঁদু মোসলমান, মেয়েমদ্দ সব্বাই তাকে পীরের মতন মানে, ভক্তি করে। খোদা ওদের হেয়াত দারাজ করুক, তোমরাও বেটি-জামাই নিয়ে সুখে থাক।

মরিয়ম বললে, তুমি মুরুব্বি মানুষ, দোয়া কর বুবু, আল্লা যেন ওদের বাঁচিয়ে রাখে, সুখে রাখে।

নূরজাহান শুনে খুশি হ'ল। আরো এমনি প্রশংসা শোনবার জন্য প্রশ্ন করলে, সত্যি ফুফু, রহীম ভাইকে পীরের মতো মানে লোকে?

হ্যাঁ মা, সত্যি বৈ কি, জবাব দিলেন তিনি। তোরা তো

দেখিসনি, আমি দেখি যে হামেশা, আমায় বাড়িতেই তো। এই যিদিন জেল থেকে বেরিয়ে গেল সেখানে, যেয়ে বসতে না বসতেই খবর পৌঁচে গেল চারিদিকে। ওমা, একটু বাদেই দেখি ই গাঁ উ গাঁ থেকে লোক সব ছুটে ছুটে আসছে তাদের কমরেডকে দেখতে। কমরেডই তো বলে সবাই, রহীমের নাম আর কে জানে সেখানে?

ফুফুর এই গল্পটা নূরজাহান বলেছিল লোকমানকে। তারই মা এই ভাবে রহীমের তারিফ করছেন, এটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। এমনিই সে অনেক পূর্বে থেকে মনে মনে রহীমের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে ছোট বলে ধারণা করেছিল এবং তার ফলে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে আরম্ভ করেছিল। রহীম তার চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড়, সে কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করে যা লোকমান করতে পারে না, সে কৃষকদের মধ্যে মর্যাদা পেয়েছে, পার্টির মধ্যে তার মর্যাদা বেশি, এখন আবার জেল খেটেও এল। এই ভেবে তার ধারণা হয়েছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে পারবে না।

হাতেমের জামাই হয়ে লোকমান যথেষ্ট সম্পত্তি পাবে বলে আশা করেছিল। সে সুযোগ ছিল না রহীমের। এইখানে রহীমের পরাজয়ের কথা। তাই জাহানআরার সঙ্গে তার বিয়েতে লোকমান আপত্তি জানিয়েছিল। এখন কিন্তু রহীমও একই সুযোগের হকদার হয়ে তাকে টেক্কা দিয়ে গেল। এই ব্যক্তিগত পরাজয়কে সে মেনে নিতে তো পারলেই না, বরং রহীমের প্রতি বিদ্বেষে এখন তার মন আরো অন্ধ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে রাগ হ'ল মামু-মামীর প্রতিও।

তার উপর কিনা এখন আবার তারই মা এসে বলছেন আবাদের লোকে রহীমকে পীরের মতো ভক্তি করে।

সমস্ত মিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নূরজাহানের নিকট কথাটা শোনবার পর সে কিছু বলতে পারলে না, গুম হয়ে থাকল।

বিয়ের দিন থেকে রহীমকে হাতেমের বাড়িই থাকতে হ'ল। এখন সরে থাকবার জন্য কোন অজুহাত আর থাকল না। মনের

মধ্যে তার অবশ্য একটা আপত্তি ছিল কিন্তু তা প্রকাশ করা চলে না ; তার ভয় ছিল লোকমানকে। তার চিন্তা ও ব্যবহার কিছুকাল থেকে যে খাতে বয়ে চলেছে তাতে তার সঙ্গে সংঘর্ষের আশংকাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারছিল না রহীম। অথচ সংঘর্ষ যদি ঘটে তাহলে এই পরিবারটির স্নেহনীড় বিশৃংখল হয়ে পড়বে, বিপর্যস্ত যদি নাও হয়, এ দুর্ভাবনাও ছিল তার মনে।

রহীমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার পর এবং তাদের সঙ্গে রহীম তাদের বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করবার পর মরিয়মের দীর্ঘ দিনের একটা আকাংক্ষা পূর্ণ হ'ল। এক সময়ে সে লোকমানকে এনে পুত্রের অভাব পূরণ করতে চেয়েছিল, তাকে সেই ভাবে স্নেহ দিয়ে পুষ্টও করেছিল। কিন্তু তাতে তার মাতৃহৃদয় যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হতে পারেনি।

এ সত্য মরিয়ম আবিষ্কার করলে অনেক কাল পরে যখন রহীম এসে পরিচিত হ'ল তাদের পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে এবং ধীরে ধীরে নিজের ব্যবহারের দ্বারা, কিন্তু নিজের অজান্তেই, তার মনে গভীর দাগ কাটলে। পুত্রের প্রতি স্নেহ বর্ষণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা তাকে টেনে নিয়ে গেল রহীমের দিকে। অমনি মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেয়ে শৈশবে মা-মরা ছেলে রহীমের অন্তরে মাতৃস্নেহের সুপ্ত ক্ষুধা জেগে উঠে তাকে ব্যগ্র আবেগে ঠেলে দিলে মরিয়মের কোলে। এইভাবে তাদের মাতা-পুত্রের মিলনের গোপন কাহিনী রচিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল হয়ে গেল।

তাদের এই সম্পর্ক রূপ পেতে শুরু করলে রহীমের বিয়ের পর তাদের এক বাড়িতে বাস করার মধ্যে। তাকে পূর্ণতা দিতে যেটুকু বাকি ছিল তাও প্রকাশ পেলে রোস্তমরা চলে যাবার পর যখন রহীম মরিয়মকে আর মামীমা না বলে প্রকাশ্যে মা বলে ডাকতে আরম্ভ করলে, আপনির বদলে তুমি বলে সম্বোধন করতে লাগল।

এই ঘটনা লোকমানের মনকে প্রায় ভেঙ্গে দিতে চাইলে। সত্যিই এ তার পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ল।

লোকমানের মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাবতে লাগল এর কোন প্রতিকার করা যায় কিনা। কিন্তু প্রতিকারের তো কোন পথ নাই এখন। তার ভুলের জন্যই তো ঘটেছে এই অবস্থা। কেন সে রহীমকে এনেছিল এই পরিবারের মধ্যে? তখন কেন বোঝেনি সে সূচ হয়ে ঢুকে একদিন ফাল হয়ে বেরোবে? নিজের পায়ে কুড়ুল তো সে নিজেই মেরেছে। আজ যে প্রতিকারের সময় বয়ে গেছে। এই পরিবারের মধ্যে তার যে মর্যাদা, রহীমেরও তাই, হয়তো তারো বেশি। সম্পত্তি দুজনেই পাবে, সমান ভাগে। কারবারের জন্য সে যতটুকু গলিয়ে নিতে পেরেছে সেটাই তার লাভ। কিন্তু হাতেম যদি ঐ পরিমাণ টাকা জাহানআরাকেও দেয়? দিতেও পারে। তাকে সে অত্যধিক ভালোবাসে।

পরিবারের মধ্যে রহীমের মর্যাদা শুধু সমান নয়, তার চেয়ে বেশি। এই মামীর বদলে মা ডাকের অর্থ কী? লোকমানের সম্পর্ক বাদ দিয়ে রহীম এখন জাহানআরার সম্পর্ক ধরেছে? না সে মরিয়মের নিকট লোকমানের চেয়ে বেশি প্রিয় হতে চায়, বেশি স্নেহ কামনা করে? স্ত্রীলোকের মনের কথা বলা কঠিন। সত্যিই যদি মরিয়ম রহীমের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, যদি তার স্বার্থকে বড় করে দেখে হাতেমকেও প্রভাবিত করে ফেলে? কী বিপদই যে হ'ল তার!

এ অবস্থা হতে পারত না, কিন্তু এও হয়েছে তারই ভুলের ফলে। এর মূল হ'ল হাতেমের অসুখ। হাতেমের জীবনের চেয়ে সে তখন নিজের কারবারের লোকসানকেই বড় করে দেখেছিল। সেটা ঠিক হয়নি। তার উচিত ছিল হাতেমের চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা রহীমের হাতে না ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতে নেওয়া। তাহলে রহীম কি এই সুযোগ পেতে পারত আজ? কিন্তু তার ভুলের কারণে রহীম মধুপুরও চলে গেল। তাই আজ সেই ভুলের মাশুল এমন সাংঘাতিক রূপ নিয়েছে।

অথচ সে যে আজ তার এই মনের কথা, অন্তরের বেদনা কারো

কাছে প্রকাশ করবে তার উপায় নাই। পরিবারের মধ্যে রহীম সকলেরই প্রিয়। তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলা চুলোয় যাক, শুনতেও রাজি হবে না, নূরজাহানও না। সেও তো রহীম ভাইয়ের নামে গলে যায়। শয়তানটা কা জাদুই করে রেখেছে সকলকে। তার মা বুড়ো মানুষ, তাঁকে পর্যন্ত মুরিদ করে ফেলেছে। তিনিই আজ বলেন কিনা রহীমকে লোকে পীর বলে মানে। কমিউনিস্ট আবার পীর হতে চায় কী মতলবে? নিশ্চয়ই এর মধ্যে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে। কৃষক আন্দোলন করে চাষীদের নেতাও হব, আবার পীরও হব—ব্যাপার মন্দ নয়!

রহীমের আসল দুর্বলতা মনে হয় এইখানে, ভাবলে লোকমান। তাকে হটাবার যখন কোন উপায় নেই আর, তখন খেলো করবার চেষ্টাই ভালো। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরিবারের মধ্যে তার মুখোশটি খুলে দিতে হবে। তাহলে অন্তত সে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা নিতে পারবে না।

কাজের ফুরসতে এবং বিশেষ করে রাত্রে শুয়ে লোকমান মনে মনে এমনি অনেক তোলাপাড়া করবার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁচল।

রহীমের বিয়ের এক হপ্তা পরে রবিবার সকালে তারা নাশতা করতে বসেছে। লোকমান মনে মনে স্থির করে এসেছিল এই সময়েই রহীম সম্বন্ধে কিছু বলবে। কী বলবে তাও ঠিক করেছিল। নানা রকম চুটকি কথার মধ্যে খাওয়া সেরে চা খাবার সময় যখন কিছুক্ষণ সকলেই নীরব থাকল, তখনি লোকমান মুখে একটা শ্লেষের হাসি নিয়ে বললে, মামু, তোমার বাড়িতে একজন পীর এসে ভর করেছে খবর রাখ?

পীর আবার কে এল রে? বললে হাতেম।

ও, জান না তাহলে? তোমার কাছেই তো বসে রয়েছে। চাষীদের মধ্যে নেতাগিরি আর পীরগিরির ঠিকে নিয়েছে, এখন রয়েছে এখানে তোমাদের মুরিদ করবে বলে।

মেয়েরা সকলেই বুঝলে লোকমান তার মায়ের মন্তব্য নিয়ে কথা

বলছে রহীম সম্বন্ধে। রহীম এ মন্তব্য শুনেছিল জাহানআরার কাছে। সে তাকে ঠাট্টা করছে ভেবে সহজ ভাবেই বললে কী ছেলেমানুষের মতো বাজে রসিকতা করছ লোকমান।

নূরজাহান লোকমানের কথার প্রতিবাদ করলে, আমি তোমাকে তো বলিনি রহীমভাই পীর হয়েছেন। ফুফু বলেছিলেন, লোকে তাঁকে পীরের মতো ভক্তি করে। সেই কথাই তো বলেছিলাম তোমাকে।

আরে সে একই কথা, হালকাভাবে বললে লোকমান। রহীমকে বললে গম্ভীরভাবে, আমি রসিকতা করিনি রহীম, সত্যি কথাই বলেছি। আগে বুঝেছিলাম তোমার মাথায় ঢুকেছে নেতাগিরির নেশা, এখন দেখছি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পীরগিরির রাস্তাও ধরেছ। এখানেও যে সকলকে মুরিদ করবার মতলব রয়েছে তোমার তাও বুঝছি।

লোকমানের এই অধঃপতন দেখে রহীমের মনে করুণার চেয়ে ঘৃণার ভাব জাগল বেশি। তার কথার জবাব দিতেও ঘৃণা বোধ হ'ল তার।

মরিয়ম বিরক্ত হয়ে তিরস্কারের সুরে বললে, লোকমান, তোর হঠাৎ এই ছ্যাবলামি করবার খেয়াল হ'ল কেন বলতো? তোর মায়ের মুখেও তো নিজের মিথ্যে কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছিস।

মুখ গম্ভীর করে লোকমান বললে, ছ্যাবলামি কিসে দেখলে মামীমা? আমি ঠিক কথাই বলেছি। এখানে তুমিই রহীমের পয়লা নম্বর মুরিদ। আমি তো দেখতে পাচ্ছি সব। নইলে মামী থেকে হঠাৎ মা হয়ে গেলে কী করে বলতো?

ও, সেটাই বুঝি দোষের হ'ল তোর কাছে? মরিয়ম বিরক্ত-ভাবে জবাব দিলে। জামাই যে, ছেলেও সে। এতদিন ও ডাকত তোর সম্বন্ধ ধরে, এখন ডাকে জাহানআরার সম্বন্ধ ধরে।

জবাব অত সোজা নয় মামীমা, আমিও বুঝি, বললে লোকমান।

হাতেম ধমক দিলে, কী বেহুদার মতন কথা বলছিস।

ইতিমধ্যে রহীম উঠে গিয়ে লোকমানকে একহাতের বেড় দিয়ে ধরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। বললে, ছি লোকমান, এই বাজে কথা নিয়ে মুরুব্বিদের সাথে কথা কাটাকাটি করে!

কিন্তু লোকমান রেগে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতখানাকে এক ঝটকায় ছুড়ে দিলে। বললে, যাও, তোমাকে আর মুড়লী করতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।

রহীমের হাতখানা গিয়ে জোরে লাগল দেয়ালে। আঘাতও পেলে সে, তবে বেশি নয়। হাতেম বলে উঠল বড্ড লেগেছে বাবা?

না মামু, ও কিছু নয়, সে হাসিমুখে আবার বসল।

মিনিট দুই সকলেই চুপচাপ, কেউ কোন কথা বললে না। জাহানআরা দুঃখিত হ'ল কিন্তু নূরজাহান লজ্জায় মরে গেল, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। হাতেম ধীরে ধীরে বললে, ছোকরটা হঠাৎ এমন করলে কেন বলতো? আগে তো দেখিনি এ রকম।

মরিয়মের মন তার ব্যবহারে তিক্ত হয়ে উঠেছিল। তবু শান্ত ভাবে বললে, কী রকম মাথা গরম হয়ে গেছে বোধ হয়।

কোন কারণে একটু রাগ হয়েছে হয়তো। রাগ পড়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, রহীম মন্তব্য করলে।

কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই কাউকে সন্তুষ্ট করলে না। লোকমানের এই ব্যবহারের পিছনে কী আছে, কোন্ মনোভাব কাজ করছে, রহীম তা অনুমান করে নিয়েছে। অনেক পূর্বেই তার ব্যবহার দেখে যে আঁচ পেয়েছিল সে, তাই থেকে এ রকম ঘটনার আশংকা জেগে-ছিল তার মনে। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্রি এবং এমন স্থূল ভাবে একটা নোংরা দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে তা সে আন্দাজ করতে পারেনি। এখন তার ধারণা হ'ল তার প্রতি তার বিদ্বেষ জন্মেছে হীনম্মন্যতা থেকে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সম্পত্তির লোভ। এই সব মিলে তাকে নৈতিক অধঃপতনের পথে ঠেলে নিয়ে গেছে অনেক দূর। তার গতিটাও হয়েছে বড় বেশি দ্রুত।

রহীমের মনের এই চিন্তার কথা জাহানআরার কিছুই জানা ছিল

না। কিন্তু লোকমানকে সে শৈশব থেকেই যথেষ্ট ভালোবাসে। তার এই ব্যবহার তাকে মর্মাহত করেছে। সে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল।

কিন্তু লোকমানের অনুপস্থিতিতে নূরজাহান নিজেকে অপরাধী মনে করছিল। তার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। সে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল রান্না ঘরে। তারপর একে একে অন্যেরাও উঠল। বাড়ির আবহাওয়াটা সকলের নিকট কেমন বিষাক্ত বোধ হতে লাগল।

রহীম উঠে বাইরের ঘরে যাবে ভেবেছিল কিন্তু গেল না পাছে লোকমানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপরই কী একটা নেবার জন্য জাহানআরা সেখানে ঢুকতেই রহীম খুব আস্তে বললে, রান্না ঘরে যাও, দেখো নূরজাহান যেন কাঁদে টাঁদে না। সে কী করবে? জাহানআরা কিছু না বলে চলে গেল।

নূরজাহান গিয়ে দেখলে মামা সেখানে নাই, কেবল ছোকরা চাকরটা আছে। তাকে প্লেট পেয়ালা তুলে ধুতে পাঠিয়ে সে নিজেকে একা পেয়ে সত্যিই আঁচলে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেললে। একটু পরেই জাহানআরা আস্তে আস্তে এসে তাকে এই অবস্থায় দেখে সস্নেহে তার চোখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললে, বুবু, তুই কাঁদিস কেন? এমন কী হয়েছে যে তোর কাঁদবার দরকার হ'ল?

নূরজাহান। ছি, রহীমভাইকে এমন করে অপমান করতে গেল! কী অন্যায় কথা বল তো!

জাহানআরা। এতে আবার অপমানের কী আছে? ওঁরা তো পুরোন দোস্ত। ভাই হয়তো সত্যিই তামাশা করে বলেছিল।

নূরজাহান। তামাশা! ও কি একটা তামাশার ব্যাপার হ'ল? তারপর আবার লাগল মায়ের পেছনে! তুই যাই বলিস জাহানআরা, ওর ব্যবহার খুবই খারাপ লেগেছে আমার। অসহ্য!

তার মা এল। তখন সে প্রসংগ বাদ দিয়ে তারা রান্নার যোগাড়ে হাত দিলে। কী রান্না হবে ঠিক হ'ল।

এই দিনের ঘটনাটা মেয়েরা এবং রহীম নিজেও ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে, তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে চায়নি নিজেদের মধ্যেও, বিশেষত নূরজাহানের প্রতি মমতার বশে। তাদের কথায় তাকে যেন পীড়ন করা না হয়।

হাতেম চেষ্টা করলে অবস্থার উন্নাতর জন্য। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিন দুই মেয়েকে নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে বললে, শোন মায়েরা, আজ আমরা তোদের হাতে কিছু দোব ভাবছি। কী বলতে পারিস?

কী আব্বা? হাসিমুখে দু জনেই এক সঙ্গে প্রশ্ন করলে।

দু খানা বড় খাম দুজনকে দেওয়া হ'ল। তার উপর তাদের নাম লেখা। খুলে দেখলে প্রত্যেকটার মধ্যে একটা রেজিষ্ট্রি দলিল! নূরজাহান বললে, এতে কী আছে আব্বা? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পার্কসার্কাসের বাড়ি দুখানা তোদের নামে লেখাপড়া করে দিয়েছি।

দুজনেই খুব খুশি হয়ে বাপ-মাকে সালাম করলে।

লোকমান পূর্বদিনের ঘটনার পর থেকেই ভাবছিল এ বাড়ি থেকে সরে যাবার কথা। এখন এই দলিল দেখে ভাবলে ওখানেই গিয়ে থাকবে। কিন্তু তখনি সে ইচ্ছা নূরজাহানের কাছেও প্রকাশ করলে না।

বাইশ

যুদ্ধ তখন দেশের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। জাপানী বোমার হামলা হ'ল কলকাতা শহরের উপর। অসংখ্য মানুষ আতংকে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল বোমার আঘাতে মৃত্যু এড়াবার চিন্তায়। বিস্তর ঘর বাড়ি খালি হয়ে গেল। জাহানআরা কটেজের তিনটে তলার মধ্যে নিচের তলার ছাড়া সব ভাড়াটেই ঘর ছেড়ে গেছে কিন্তু নূরজাহান কটেজের কেবল নিচের তলাই খালি হয়েছে। বোমার ভয়ে তেতলায় ভাড়াটে তখন নিচের তলায় আসতে চাইলে। কিন্তু লোকমান বললে সে নিজেই থাকবে সেখানে।

এই সংকল্প যখন বাড়িতে প্রকাশ করলে সে, মরিয়ম ধমক দিয়ে উঠল, তোর কী হয়েছে বল তো লোকমান? হাজার হাজার লোক শহর ছেড়ে পালাচ্ছে বোমার ভয়ে; আর তুই থাকতে চাস এখন শহরে যেয়ে। তাও আবার মেয়েটার এই অবস্থায়।

নূরজাহান তখন সন্তানসম্ভবা।

সে কিন্তু যাবেই। এখানে কিছুতেই আর থাকতে চায় না। যাবার সুযোগও পেলে ভালো। তার এই অজুহাত হ'ল : শীতের ছোট বেলা, তায় ব্ল্যাকআউট, এখন আবার বোমা। প্রেসের কিছু লোক পালিয়েও গেছে। প্রচুর কাজ রয়েছে হাতে, এই অল্প লোক দিয়ে আর অল্প সময়ের মধ্যে সেরে দিতে হবে। সেজন্য তাকে আফিসে বেশি সময় দিতে হয় বলে ধাপার বাড়ি যাতায়াতের সময় বাঁচাতে হবে। এ অজুহাত অসার নয়। তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারলে না, যদিও সকলেই বুঝলে লোকমান এ বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় অন্য কারণে।

সে বললে, বোমার ভয় করছ মামীমা, কিন্তু বোমা তো শহরের

ও ধারটায় পড়েছে, পার্কসার্কাসে পড়বে না। পড়লে ধাপাতেও পড়ত। জাপানীরা অত বোকা নয়। আর নূরজাহান এখন নাই বা গেল, এখানেই থাক না।

এরপর আর বলাই বা যায় কী মরিয়ম শুধু বললে, তাহলে তোর খাবার বন্দোবস্ত কী হবে? এসে খেয়ে যেতে পারবি না?

কথাটা বাস্তবিকই অর্থহীন। লোকমান হেসে উঠল। বললে, আসতেই যদি পারি তো থাকতেই বা বাধা কী?

সত্যিই তো। মরিয়মও হাসলো বললে, কিন্তু পাঠিয়ে যে দোব তারও উপায় নাই। ব্ল্যাকআউটের মধ্যে বোমার ভয়, ছোকরা-টাকে যেতে বলা যায় না। এখনো যে আছে এখানে, সে শুধু পাড়ার ছেলে বলে।

দিনে তো বাইরেই খাচ্ছি, বললে লোকমান, রাতের জন্যে কোন মেসে-টেসে বন্দোবস্ত করা যাবে। সেজন্যে ভেবো না তুমি মামীমা।

সকলেই জানে লোকমান এখন যাবেই। সকলেই বুঝলে এই পরিবারে যে ভাঙন আসব-আসব করছিল এতদিন তা এইবার এসে গেল। হাতেম তাকে রোধ করতে পারলে না, জোরও করলে না। কিন্তু সকলের পক্ষে এই বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হ'ল। বিচ্ছেদ বেদনাদায়ক হলেও তাকে ভালো মনে নেওয়া যায়, যদি তার মধ্যে মমত্ববোধের অভাব না থাকে, যদি তা অশান্তির কারণ না হয়, শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু লোকমানের দিক থেকে এই বিচ্ছেদ এল তার নিষ্করুণ ও হঠকারী মনোভাব থেকে।

লোকমান যখন প্রথম নূরজাহানের কাছে নতুন বাড়িতে যাবার প্রস্তাব করে, সে একেবারে মুশড়ে পড়েছিল। পূর্বে কখনো সে চিন্তা করেনি তাকে লোকমান ছাড়া অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। এখন অন্তত সাময়িকভাবেও যে সে রেহাই পেলে তাতে অনেকটা স্বস্থ বোধ করতে লাগল। বুঝলে তাকে যেতেই

হবে এর পরে, তবে হঠাৎ যে যেতে হ'ল না সেটাই লাভ। কিন্তু লোকমান থাকবে অন্যত্র আর সে এখানে, তাও অবশ্য আনন্দের কারণ নয়।

নতুন বাড়ি যাবার সময় বিছানাপত্র ও কিছু দরকারী জিনিস নিয়ে গেল লোকমান। আনুষ্ঠানিকভাবে গেল না অবশ্য এবং সেটা চায়ওনি কেউ। তাতে অন্তত বিচ্ছেদটাকে প্রকট করে তোলা হ'ল না, যদিও তা মনের মধ্যে থাকল সকলেরই। লোকমান বলে গেল সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে আসবে এবং হপ্তাশেষ এখানেই কাটাবে। তাই শনিবার সন্ধ্যায় এসে সোমবার সকালে যেতে লাগল।

সে চলে যাবার পর কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ির আবহাওয়ার মধ্যে কিছু পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল, যদিও সকলে তা লক্ষ্য করলে না। লোকমান থাকতে শেষ দিকের কয়েক সপ্তাহ বোঝা যেত যেন কেমন একটু থমথমে ভাব রয়েছে, যখন যেমন খুশি হাসবার বা কথা বলবার উপর যেন সামান্য একটা নিষেধের আস্তরণ চেপে রয়েছে, যেটা ঝেড়ে ফেলা যায় অথচ ফেলতে গেলে কী একটা মনে পড়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পারিবারিক আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক ভাবটা ক্রমে কেটে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ যে কাটেনি তার ইংগিত পাওয়া যায় শনি-রবিবারে যখন লোকমান এখানে থাকে। মেয়েরা এবং বিশেষ করে রহীম সতর্ক থাকে যাতে এমন কিছু বলা বা করা না হয় যা তার পক্ষে বিরক্তির কারণ হতে পারে।

ফসল কাটার মরসুম শেষ হয়েছে, এইবার রহীমকে এলাকায় যেতে হবে। সমিতির কাজকর্ম এখন স্বাভাবিকভাবে চলে, নেতা ও কর্মীদের উপর পুলিসের নজর কম। এবার বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনের অনুষ্ঠান যাতে জাঁকজমকের সঙ্গে হয় অথচ তার রাজনীতিক দিকটা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত

করা হয়েছে। রহীমকে গিয়ে এখন স্থানীয় সম্মেলনগুলোর প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে হবে।

যাবার কথা শুনে জাহানআরা বললে, যাচ্ছ যখন, আমাকেও নিয়ে চল না। ক'বছর তো আমি ফুফুর বাড়ি যাইনি। এখন গিয়ে তোমার কাজ কর্মও একটু দেখে আসব, কেমন পীর হয়েছে জানতে পারব। অবশ্য বুবুর এ অবস্থায় বেশি দিন থাকতে পারব না সেখানে।

রহীম যখন মরিয়মকে বললে কয়েকদিনের মধ্যেই যাবে, সে বললে, তাহলে জাহানআরাকেও নিয়ে যাওনা বাবা। ওকে একবার যেতে হবে তো ফুফুর বাড়ি। যাবার আগে বলে গেছে ওকে নিয়ে যাবে শুকনোর দিনে। রোস্তম কবে আসবে নিতে, তার চেয়ে তুমিই নিয়ে যাও বরং, রোস্তম পৌঁচে দিয়ে যাবে।

জাহানআরা সেখানেই ছিল। বললে, কদিন থাকব মা? বুবুর এ অবস্থায় বোধ হয় জলদি চলে আসতে হবে।

সে দেরি আছে। পাঁচ সাত দিন থাকলে কোন অসুবিধে হবে না, বললে মরিয়ম।

রহীম রমেশকে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিলে। বই, কাগজ, ঝাণ্ডা ইত্যাদি দরকারী জিনিসগুলো সেই নিয়ে গেল। তাদের যাওয়া সম্বন্ধে দিন ঠিক করে রোস্তমকে চিঠি লিখে দিলে, ঘাটে থাকতেও বললে। মুখেও বলে দিলে রমেশকে।

জাহানআরা বিয়ের কিছু পরেই রহীমকে বলেছিল, রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা তোমার কাছে পেয়েছি। কৃষক আন্দোলনের কথাও অনেক বলেছ। কিন্তু আমায় দিয়ে এ সব বিষয়ে কি কাজ কিছু হতে পারে না?

কেন পারবে না? আমি মনে করি করাও দরকার, জবাব দিয়েছিল রহীম। কিন্তু আবাদে গিয়ে বেশি দিন কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কলকাতায় থেকে কী করতে পার তাই দেখতে হবে। নূরজাহান এখানে থাকবে না। তোমাকে

কিন্তু থাকতে হবে। মাবাপের কাছে তোমরা কেউ থাকবে না, সেটা অন্তত এখনো ঠিক মনে করছি না। কিন্তু আমাদের সংগঠ-নের অবস্থা আর একটু থিতিয়ে না গেলে কাজের ব্যবস্থা করতে পারছি না। সেই কারণেই আমি তোমাকে কাজের কথা বলিনি কিছু।

জাহানআরা। বাইরে গেলে তোমার টাকা পয়সা লাগে না?

রহীম। কেন, তোমার হাতে অনেক টাকা রয়েছে বুঝি? তোমার বাড়িভাড়ার টাকা?

জাহানআরা। না, সে টাকা আব্বা আমার নামে জমা করে রাখেন। আমার কাছে এমনিই আছে কিছু টাকা। যা দরকার হয় নিয়ে যেয়ো।

রহীম। আবাদে টাকা নিয়ে করব কী? খরচ করব কিসে? তোমাকে তো বলেছি আমি মাসে মাসে ভাতা একটা পাই। তাই দিয়েই এতকাল চলেছে। এখনো পাই, তবে আগের চেয়ে কম নিই। এখন তো খাওয়া থাকার খরচটা লাগছে না। আর তোমার টাকা বেশি হয়ে থাকে তো খরচ করার জন্যে ভেবো না। আমাদের হাবিয়া দোজখে যতই ঢাল ভর্তি করতে পারবে না। যখন দেখবে, বুঝতে পারবে। সাইক্লোন রিলিফের চাঁদার জন্যে মাকে বলেছিলাম, মামু দিয়েছিলেন একশ টাকা। সে তুমি জান। তোমার টাকা রিলিফের জন্যে নয়, অন্য কাজে লাগাতে হবে— পার্টির কাজে।

আমতলী যাবার সময় জাহানআরা দায়েম আর মফিজনের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে গেল। রোস্তম তার চেয়ে বড় কিন্তু মফিজন ছোট, দায়েম আরো ছোট। আর রহীম নিয়েছে কিছু লোজেঞ্জ, বিভিন্ন গ্রামে গেলে ছেলেপিলেদের দেবে বলে। দায়েম-দের জন্যও অল্প দু একটা জিনিস নিয়েছে।

ঘাটে নেমে রহীম দেখলে রোস্তম আর দায়েম ছাড়া নীলু এবং আরো কয়েকজন কর্মী এসেছে তাদের অভ্যর্থনার জন্য।

বাড়ি পৌঁচে সেও প্রথমে ভিতরে গেল। পাছে রোস্তমের মা জাহানআরার সঙ্গে সে গেছে বলে তাকে নিয়ে জামাই বলে একটা ঘটা করে বসেন তাই সে পথ বন্ধ করবার জন্য প্রথমেই তাঁকে হুশিয়ার করে দিলে, খালামা, জাহানআরা এসেছে বলে আপনি কিন্তু আমাকে জামাই বলে ধরবেন না। আমি বরাবর যেমন আপনার ছেলের মতন এসেছি এখানকার কাজ করতে, আজও তেমনি এসেছি। আমি মেহমান নই, মেহমানের মতন ব্যবহার করবেন না আমার সঙ্গে।

সে কথা তো ঠিকই বাবা, তুমি তো ঘরেরই ছেলে, তিনি বললেন। বেশ, তুমি যেমন বলছ তাই হবে।

বাইরে এসে সে দেখলে যে কজন কমরেড ঘাটে গিয়েছিল তারা ছাড়া আরো কয়েকজন ইতিমধ্যেই এসেছে দেখা করতে। আপাতত প্রাথমিক কথাবার্তা হ'ল তাদের সঙ্গে। খারাপ খবর হ'ল এবার ধানের ফলন হয়েছে কম। আরো খারাপ খবর, ধানের দর এবার গত বছরের এই সময়ের দরের অন্তত ডবল। কৃষকরা বিভ্রান্ত হ'ল গত বছরের তুলনায় ফলন যে অনুপাতে কম হয়েছে, দর সে অনুপাতে না বেড়ে অনেক বেশি বাড়ল কেন? রহীমও তাদের কথা শুনে চিন্তিত হ'ল।

স্থানীয় পার্টি ইউনিটের তিন চারজন কমরেড এসেছে। তারা আরো অনেক কথা বললে স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে। ইউনিটের সভা ডাকা হ'ল একদিন পরে, সেখানে বসে বিস্তৃতভাবে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তারপর কৃষক কমিটির সভা হবে। তাতে সম্মেলনের প্রোগ্রাম ইত্যাদি স্থির করা হবে।

তারপর সে যাবে সমগ্র এলাকার সফরে। কবে কোথায় যাবে জানিয়ে আগে থেকে ভলন্টিয়ার মারফত চিঠি পাঠাতে হবে। কেবল ইউনিট আর কমিটির সভা ডাকলেই হবে না, জনসভা ডাকারও ব্যবস্থা করতে হবে কয়েকটা কেন্দ্রে।

ইউনিটের আলোচনায় দেখা গেল সমিতির মেম্বর সংগ্রহের

কাজ ইতিমধ্যেই আবার আরম্ভ করা হয়েছে। ধানের দর বৃদ্ধির প্রশ্ন সকলকেই চিন্তিত করে তুলেছে। এখন সমস্ত ছোট কৃষককে হুশিয়ার করে দিতে হবে যাতে তারা পারতপক্ষে খোরাকীর ধান আর বীজ ধান বিক্রী না করে এবং খাদ্যশস্য কোন রকমে অপচয় হতে না দেয়। সকলেরই ধারণা হ'ল এর পরে দর আরো চড়বে। তখন তাদের পক্ষে কিনে খাওয়া খুব কঠিন হবে। যুদ্ধের দিনে সংকট এলে বিপদ হবে সকলের।

কৃষক কমিটির সভায়ও এই সব প্রশ্নই উঠল এবং একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রচার করা হ'ল। এই প্রচারের মারফতেই জনসভা ডাকা হ'ল, কারণ সেজন্য ইস্তাহার ছাপিয়ে আনার সময় পাওয়া গেল না। এখনো খামারের কাজ সব শেষ হয়নি। তাহলেও দেখা গেল সভায় প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছে।

ধান কম হয়েছে, দর অতিরিক্ত—এ সম্বন্ধে সমিতির বক্তব্য জানতে এসেছে সকলে আগ্রহ করে। খাদ্য সম্বন্ধে সমিতির হুশিয়ারিটা সকলের ভালো লাগল। কিন্তু সমস্যা হ'ল জন-মজুরদের—তারা কী করবে? তারা যে কী করবে তা অনেক আলোচনা করেও ইউনিট মেম্বররা ঠিক করতে পারেনি। তবে বলা হ'ল বেকার থাকা কালে যেন তারা যে যেখানে পারে বাইরে গিয়ে কাজের চেষ্টা করে। তাতে অবশ্য সমাধান বিশেষ এগোল না। হাতের কাজ বা কুটীর শিল্পও বিশেষ নাই এ অঞ্চলে যে মানুষ সে পথে দু পয়সা উপার্জন করবে। কিছুদিন পরে যদি সরকারী রিলিফ চালু হয়, তাতে কিছু লোক কাজ পেতে পারে। কিন্তু এই এলাকায় সে ভরসাও বিশেষ নাই।

সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখা গেল প্রধান সমস্যা সর্বত্রই এক—ফসল কম, দর বেশি, সকলের মনে দুশ্চিন্তা। কাজেই ঘরে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রচার সর্বত্রই চালানো হ'ল।

নির্ধারিত সময়ে উপযুক্ত প্রস্তুতি করে সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠান পর

পর শেষ করা হ'ল। প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। তাদের মধ্যে অনেকে আলোচনায়ও যোগ দিলে। ইতি-মধ্যে এলাকা আরো বিস্তৃত হয়েছে। স্থানীয় নেতারা তালিম দিয়ে কিছু কিছু কর্মীও তোয়ের করেছে সেখানে।

সম্মেলনে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। কিছু সিদ্ধান্ত আশু কাজের জন্য, কিছু প্রচার-আন্দোলনের জন্য। কাজের সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রধান একটা হ'ল খেতমজুরদের জন্য চাষের ও ফসল কাটার মরসুমে মজুরী বৃদ্ধি এবং অন্য সময়ে কাজের ব্যবস্থা দাবি করে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে উপরের সম্মেলনে ইউনিয়নের প্রতিনিধি নির্বাচনও করা হ'ল। তার মধ্যে রহীম এবং রমেশকেও অবশ্য রাখা হ'ল। জনসভায় সিদ্ধান্তগুলো ঘোষণা ও ব্যাখ্যা করা হ'ল।

পরে পার্টি কর্মীদের পর্যালোচনা সভায় দেখা গেল এবারকার সম্মেলনের সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্বেকার সম্মেলনের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। সেই অনুপাতে স্থানীয় নেতাদের কর্মদক্ষতাও যে বেড়েছে তারও পরিচয় পাওয়া গেল এই থেকে।

এর পর রহীমকে একে একে উপরের কৃষক সম্মেলনগুলিতে যোগদানের জন্য যেতে হয়—প্রাদেশিক সম্মেলন পর্যন্ত। তার পূর্বে যতটুকু সময় পাওয়া গেল, সে সমিতির নতুন গ্রামগুলিতে কর্মী শিক্ষায় সাহায্য করলে, নতুন পার্টি ইউনিট গঠনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করলে। কিন্তু এলাকা ছেড়ে যাবার সময় তার মাথার মধ্যে সব-চেয়ে বেশি চেপে বসল এবারকার ধানের উৎপাদন, ধানের দর, খেতমজুরদের মজুরী ও কাজ। পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে সে তার এলাকার অবস্থা ও সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে, কিন্তু দেখা গেল সে সমস্যাগুলি সব জায়গায় প্রধান হয়ে ওঠেনি। অবশ্য ধানের দর সম্বন্ধে সে আলোচনা করবার পর অনেক প্রতিনিধিই বললে এ বিষয়টার গুরুত্ব আছে, তবে কারণটা তারা ঠিক ধরতে পারছে না ; হয়তো যুদ্ধের কারণে ফৌজের প্রয়োজনে বেশি কেনা হচ্ছে, তাই দর এত চড়ে গেছে। ধানের ফলন যে কম হয়েছে এবার

তাও কতকগুলি এলাকার প্রতিনিধিরা স্বীকার করলে, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল না। তবে ধান কর্জ পাওয়া এবং তার সুদ কমানো সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল।

তার এলাকার প্রতিনিধিরা একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল যে ধানের দর কমানো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হ'ল না। তাদের মধ্যে নারী প্রতিনিধি ছিল দুজন—সীতা আর মেনকা। বসন্ত আর সীতা দর এবং মজুরীর প্রশ্ন বিশেষভাবে তুলে ধরলে। বললে এর ফলে তারা জনমজুররা কীভাবে ঘা খাচ্ছে। দেখা গেল অন্যান্য এলাকা থেকে মজুর প্রতিনিধি প্রায় আসেনি।

নিজের এলাকার ইউনিয়ন সম্মেলন ছাড়া অন্যান্য কৃষক সম্মেলন সম্বন্ধে রহীমের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বিভিন্ন এলাকার ও জেলার বহু প্রতিনিধির সঙ্গে সে আলাপ করবার সুযোগ পেলে। আলাপের মধ্যে এসব প্রতিনিধিদের ভিতর খুব অল্পই দেখা গেল যারা খেতমজুর সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে, কিন্তু ভাগচাষীদের শোষণ এবং মহাজনী জুলুমের কথা অনেকেই বললে। অনেকে পাটের দরের প্রশ্ন তুললে।

প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে রহীম বাংলাদেশের চেহারা খানিকটা দেখতে পেলে, নানা জায়গার বাঙ্গালী দেখলে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বাংলা বুলি শুনলে। বাংলাদেশের এই বৈচিত্র্য তার পক্ষে যেমন নতুন অভিজ্ঞতা তেমনি নতুন আকর্ষণও বটে।

এই অভিজ্ঞতার পর দুটো জেলায় কিছুদিন ঘুরে সেখানকার অবস্থা দেখে কলকাতা ফেরবার পথে রহীম মনে মনে পর্যালোচনা করছিল তার সম্প্রতি দেখা সম্মেলনগুলিকে। বার বার তার মনে হ'ল সে তার নিজের এলাকায় খেতমজুর ও কৃষকের জীবন এবং সমস্যাকে যেভাবে দেখেছে আর চিনেছে, তার যথেষ্ট প্রতিফলন উপরের সম্মেলনগুলিতে হয়নি, হয়েছে আংশিক প্রতিফলন এবং

তাও যেন ভাসাভাসাভাবে। বিষয়টাকে আরো গভীরভাবে, আরো সামগ্রিকভাবে দেখা, বোঝা ও বিচার করা প্রয়োজন। নচেৎ প্রয়োজনীয় সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। এবং সেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগ্রাম করতে হলে তার উপযুক্ত সংগঠনও তৈরি করা দরকার, নইলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হবে না।

বেশ কিছুদিন বাইরে থাকার পর কলকাতা ফিরে এল রহীম। বাড়ি ঢুকে দেখলে একটি সুস্থ সুন্দর শিশুকন্যা কোলে নিয়ে বসে আছে নূরজাহান। তাকে মোবারকবাদ জানালে। মরিয়মকে বললে, মা, এবার তুমি তাহলে নানী হলে।

হ্যাঁ বাবা, নানী হয়েছি, উৎফুল্ল হয়ে বললে মরিয়ম। আল্লা বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখুক, ছেলে-পোয়াতি ভালো থাকুক।

রহীম। লোকমান মেয়েকে দেখে কী বলে? মেয়ে হয়েছে বলে দুঃখ করেনি তো?

নূরজাহান সলজ্জ হাসির সহিত বললে, তা একটু করেছিল বৈ কি ভাই। তবে এখন সে ভাবটা নেই।

জাহানআরা ঘরের ভিতর ছিল। বেরিয়ে এসে বললে, মেয়ের জন্মের কাহিনী তো শোননি এখনো। বলব বুবু?

নূরজাহান। তুই বললে কি আমি মানা করব?

জাহানআরা। লোকমানভাই তো বুবুকে হাসপাতালেই যেতে দিতে চায়নি, বলে ডেলিভারি ঘরেই হবে, দাই ডাকবে। মা বললেন তা হবে না। আব্বাও একরকম জোর করেই বুবুকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। তাতেও নাকি মিয়ার রাগ।

তার কথা শুনে সকলে হেসে ফেললে।

নাতনীকে পেয়ে মরিয়মের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। তার আহার-নিদ্রার চিন্তায় নিজের আহার নিদ্রা কিছু কিছু ভুলতে আরম্ভ করেছে। শিশুর ও তার মায়ের সুখসুবিধার প্রয়োজনে জাহানআরাকেও দেখা গেল বেশ ব্যস্ত।

তেইশ

সেদিন দুপুরে খাবার সময় মরিয়ম প্রসংগক্রমে বললে, জানিস বাবা, কলকাতায় চালের দর হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। বাজারে মোটা চালের দর গেছে পঁচিশ টাকা।

রহীম স্তম্ভিত হয়ে খাওয়া বন্ধ করে চোখ দুটো কপালে তুলে তার মুখের পানে চেয়ে থাকল। পরক্ষণে বললে, পঁচিশ টাকা? মোটা চাল? কী বলছ মা তুমি?

মরিয়ম। সত্যি বাবা। আমাদের মামা বলেছিল। ও নিজে কাল কিনতে যেয়ে দর শুনে ফিরে এসেছে। তাকে আবার কিছু চাল দিই, তবে তার ঘরে হাঁড়ি চড়ে।

রহীম। তাহলে তা অসম্ভব অবস্থা হয়ে পড়েছে মা! আচ্ছা, আমাদের এ চালের দর কী?

মরিয়ম। এ চাল তো হালে কেনা হয়নি। অনেক আগেকার কেনা।

রহীম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার এলাকার কথা চিন্তা করে উদ্বেগ বোধ করলে। তাড়াতাড়ি কোন রকমে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। মরিয়ম দেখে ভাবলে খাওয়ায় যেন রুচি নাই, কিন্তু বললে না কিছু।

নিজের ঘরে গিয়ে একখানা চেয়ারে দরজার দিকে পিঠ করে বসে রহীম ভাবতে লাগল। ভাবলে আবাদ এলাকার কৃষকদের এবং বিশেষ করে জনমজুরদের অবস্থার কথা। এরকম দর হলে তাদের পক্ষে তো চাল কিনে খাওয়া অসম্ভব। আবাদের মতো অবস্থা সর্বত্র না হলেও বাংলাদেশের আরো হাজার হাজার গ্রামের গরিবদের মধ্যে খাদ্য সংকট নিশ্চয়ই দেখা দিয়েছে। এর প্রতিকার কী হতে পারে? তাদের পার্টি, কৃষক সমিতি কী ব্যবস্থা করতে

পারে? গবরমেণ্টের কী করা উচিত? তাদের এখনি একটা সিদ্ধান্ত করা দরকার।

সে যখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন সেই সময়ে মরিয়ম ও জাহানআরা এল। সে ঢুকতে দেখেনি তাদের। মরিয়ম কথা বলতেই সে চমকে উঠল। মরিয়ম বললে, কী ভাবছ বাপ?

ভাবছি মা, গাঁয়ের মানুষগুলো এই দরে তো কিনতে পারবে না, না খেয়ে মরতে থাকবে, করুণ কণ্ঠে বললে রহীম। শহরের গরিব-দের অবস্থা, বস্তীর লোকের অবস্থাও তো তাই হবে। এই মানুষ-গুলোকে বাঁচাবার কী ব্যবস্থা করা যাবে?

মরিয়ম। গবরমেণ্ট কিছু করবে না?

রহীম। করবে বলে ভরসা পাচ্ছি না, তাও আবার এই যুদ্ধের অবস্থায়। দেখতে হবে চাপ দিয়ে কতটা করানো যায়।

মরিয়ম। চাপ কী ভাবে দেবে?

রহীম। এখনো বলতে পারি না। সভা মিছিল টিছিল করতে হবে। একটু পরেই যাব আলোচনা করতে।

মরিয়ম। আমার ভুল হয়ে গেল বাবা। তোর খাবার সময়ে কথাটা না বললেই ভালো হ'ত।

রহীম। ও, তাই বলতে এলে বুঝি মা! তোমার বাপের কি মাথা-টাথা খারাপ ছিল?

জাহানআরা হেসে উঠল। বললে, আমিও ঐ কথাই বললাম মাকে।

মরিয়ম। না বাবা, আমি দেখলাম তো, তুমি ভালো করে না খেয়েই উঠে এলে। তাই ভাবলাম, কথাটা পরে বললেই চলত।

রহীমের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তখন না বলে যদি এখন বলতে তাহলেও যা দেখছ তাই দেখতে, তবে ভাতটা হয়তো আর দু এক লোকমা বেশি খেয়ে উঠতাম। দেখ মা, এবার যে ধানচালের দর খুব বেশি তা আমি আবাদে থাকতেই দেখেছি, জাহানআরাও শুনে এসেছে। তাই নিয়ে কৃষকদের মধ্যে কত আলোচনাও হয়েছে।

কিন্তু এখন যে দর হয়েছে এ তো আগে ভাবতেও পারিনি হবে বলে। এ দরে কিনে খাবার ক্ষমতা যে ঐ গরিবগুলোর নাই। তারা বাঁচবে কী খেয়ে? তাদের না-খাওয়া মুখ যে আমার চোখের সামনে ভাসছে। তাদের যে আমি চিনি। তারা যে আমার আপন লোক। তাদের মধ্যে অসংখ্য লোকের বাড়ি যে আমি থেকেছি, খেয়েছি। তারা যে নিতান্ত আত্মীয়ের মতো আমাকে ভালোবাসে, আদর যত্ন করে। তারা যদি আজ অসহায়ের মতো না খেয়ে মরে তো আমি বরদাস্ত করব কেমন করে বলতো মা!

সে তাদের আফিসে গিয়ে শুনলে দরবৃদ্ধি সম্বন্ধে তারা ওয়াকেফহাল। এ বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আজ তাদের আলোচনাও হবে। রহীম কলকাতায় ছিল না বলে তাকে ডাকা হয়নি।

তাদের আলোচনার সময় জানা গেল সরকারী কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে নির্বিকার না হলেও সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করতে পারেনি এখনো, সম্ভবত জেলাগুলোর খবরের প্রতীক্ষায় আছে। তাদের পার্টি কিছু কিছু খবর কোন কোন জেলা থেকে পেয়েছে, সত্বর আরো পাবার আশা করছে। রহীম আবাদে যাবার আগে আপাতত সিদ্ধান্ত হ'ল-ভুখ মিছিল ইত্যাদি সংগঠন করতে হবে।

এলাকায় গিয়ে সংকটের চেহারা দেখে গভীর বেদনা বোধ করলে রহীম। রমেশ আগেই এসেছিল, তাকে ডাকিয়ে নিলে। স্থানীয় নেতাদের সংগে আলোচনায় জানা গেল একবেলা খাওয়া, আধপেটা খাওয়া অনেকেরই চলছে, জনমজুরদের মধ্যে মাঝে মাঝে উপবাসও করছে কিছু লোক। যারা কোন রকম খাদ্যশস্য যোগাড় করতে পারে না তারা জলাজমি থেকে চেচকোর গেঁড়ো তুলে এনে খেতে আরম্ভ করছে। কলাগাছের কচি মাঝ, গরুর খাবার জন্য সঞ্চয় করে রাখা বাবলার বিচি পর্যন্ত সিদ্ধ করে বা ভেজে খাচ্ছে লোকে।

তারা স্থির করলে যারা একেবারে উপবাস করতে বাধ্য হচ্ছে, প্রথমে তাদের বাঁচাবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে কিছু কিছু চাল সংগ্রহ করতে হবে তাদের, সেজন্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বেরোতে হবে ঝাণ্ডা নিয়ে। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে ভুখ মিছিল নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে এবং বিশেষ করে বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে গিয়ে রিলিফের এবং টেস্ট রিলিফের কাজের দাবি করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত লিখে তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে জানিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে কোন্ গ্রামে কোন্ কোন্ ব্যক্তি উপবাস করছে বা অর্ধাশন করছে তার তালিকা তোয়ের হতে লাগল। রহীম নিজে রমেশকে নিয়ে কাছাকাছি খানকয়েক গ্রামের অবস্থা দেখে নিলে। যারা অনশনে-অর্ধাশনে আছে তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দিলে তারা এখন কী করতে যাচ্ছে। নিঃস্ব জমিহীন সর্দার খেতমজুরদের একটা পাড়ার মধ্যে ঢুকে দেখলে তিন চারটি মেয়ে উপবাসে কাতর হয়ে উঠনে ছেঁড়া চাটাই পেতে পড়ে আছে। তাদের ঘরে কোন পুরুষ মানুষ নাই, নিজেরা জন খাটে, এখন একেবারে নিঃসম্বল।

একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এখন আর ওঠবার ক্ষ্যামতা নেই বাবা। সমিতির কর্মীরা কদিন দুটি দুটি চাল দিয়েছেল, দুদিন আর তাও পাইনি। তুই এসিছিস বাবা, ছ্যাখ কিছু করতে পারিস তো।

শুনে রহীম ও রমেশ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। তাদের চোখের পাতা ভিজে গেল।

এলাকার অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দিয়ে রহীম রিপোর্ট লিখে রমেশকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে মরিয়মের নামেও একখানা চিঠি পাঠালে। তাদের সিদ্ধান্ত এবং তারা কী করছে এখানে, রিপোর্টে তা স্পষ্ট করে লিখে জানালে তাদের প্রাদেশিক কেন্দ্রে।

রিলিফ সংগ্রহের জন্য তাদের স্কোয়াড কৃষকদের নিকট তো

গেলই, জোতদার-মহাজনদের কাছেও গেল। একেবারে খালি হাতে কেউ বিদায় করতে পারলে না, তবে ধনীরা যা দিলে তা তাদের অবস্থার তুলনায় নগণ্য। ধানের অস্বাভাবিক দর দেখে তাদের লোভ বেড়ে গেছে।

ছোট চাষীরা অধিকাংশই এখনো তাদের ঘরে যেটুকু সঞ্চয় আছে তাই থেকে সাধ্যমতো সাহায্য করলে। আর কিছুদিন পরেই তাদের নিজেদেরই ধারকর্জ করে খেতে হবে।

সম্পন্ন চাষীদের মধ্যে যারা হাট আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তাদের কয়েকজনের কাছে বিশেষভাবে রহীমকে যেতে হ'ল। তারা যা দিত তার চেয়ে বেশিই দিলে তার খাতিরে।

জাহানআরা যখন রোস্তমদের বাড়ি গিয়েছিল, দেলখোশ মোল্লার বাড়ি খবর দেওয়া হয়েছিল। মোল্লার স্ত্রী নিজে এসে তাকে দেখে যান এবং নিজেদের বাড়ি নিয়েও যান তাকে। রোস্তমদের সম্পর্ক ছাড়া রহীমের বৌ বলে মোল্লাবাড়ির মেয়েরা তার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তার আদর যত্ন করে, তার কথাবার্তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। তারপর রহীম এই প্রথম গেল মোল্লার সঙ্গে দেখা করতে।

মোল্লা রহীমকে দেখে প্রথমেই তুললেন জাহানআরার প্রসংগ। বললেন, বৌমাকে দেখলাম বাবা। অমন মেয়ে হয় না। রোস্তমের বুন হয়, তাই আমাদেরও মেয়ে। তবু তোমার সম্পর্ক ধরে বৌমা বলছি। আমার সাথেও কত কথা বললে। বড্ড ভালো মেয়ে। আমাদের বাড়ির বৌঝিরাও সব্বাই তার তারিফ করে। খোদা তোমাদিকে সুখে রাখুক বাবা।

এই উচ্ছ্বাসের সুযোগ নিলে রহীম। তার প্রস্তাব শুনেই মোল্লা বললেন, হ্যাঁ বাবা, তা দোব। দিতে হবে বৈ কি। না খেয়ে লোক মরে যাবে, সি কী কথা! রহীম যতটা সাহায্য চেয়েছিল তিনি তখনি তাই দিয়ে দিলেন।

সাহায্য যেমন যেমন আদায় হচ্ছিল অমনি সমিতির কেন্দ্রগুলিতে

নিয়ে জমা করে হিসাব মতো বিলিবণ্টন করা হতে লাগল। তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকল স্থানীয় নেতৃত্বের উপর।

এর মধ্যে একটা নতুন সমস্যা দেখা গেল। কিছু দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েরা অনশনে বা অর্ধাশনে থেকেছে। ফলে শিশুরা দুধ পায় না। তাদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে, সেজন্য দুধ চাই। তখন দুধ সংগ্রহেরও চেষ্টা করলে। তার অসুবিধাও আছে, কেননা দুধ সঞ্চয় করা যাবে না, প্রতিদিন সংগ্রহ ও বণ্টন করতে হবে। সে ব্যবস্থাও করা হ'ল ভলন্টিয়ারদের সাহায্যে।

রহীমের স্কোয়াড যখন কুমীরখালি গেল, মেনকা তাকে বাড়িতে ডাকিয়ে নিয়ে বললে, কমরেড আমি কিছু দুধ দিতে পারি। আমার দুটো গাই এখন দুধ দিচ্ছে, একটার সব দুধ দোব। ঘরে ছেলে-দুটো খায় তো, অন্যটার দুধ দিতে পারব না কমরেড। এরি মধ্যে আর একটা গাই বিয়োবার কথা। তখন আরো কিছু দিতে পারব।

রহীম তার সাহায্যের জন্য তাকে সানন্দে অভিনন্দন জানালে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নতুন চিন্তা এল। বললে, আচ্ছা দিদিমনি, দুধ তো তুমি দিচ্ছ। আর একটা কাজের ভার নিতে পারবে কি? তুমি তোমার গাঁয়ের কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে একটা স্কোয়াড করে আরো লোকের বাড়ি গিয়ে দুধ আদায় করতে পার? শুধু আদায় করলেই হবে না, দুধ সংগ্রহ করে হিসাব মতো যাকে যতটা দেয়া দরকার তা বিলিবণ্টন করার ভারও মেয়েদের স্কোয়াডকেই নিতে হবে। তুমি হবে স্কোয়াডের নেতা।

দায়িত্বের কথা শুনে মেনকা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল, মনে মনে উৎফুল্ল বোধ করতে লাগল। সেই সঙ্গে একটু ভয়ও হ'ল তার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সম্বন্ধে। বললে, এ রকম কাজের ভার দিচ্ছেন কমরেড, আমি পারব তো করতে?

তুমি না পারলে পারবে কে দিদিমনি? রহীম উৎসাহ দিয়ে বললে। তুমি নিজে অতটা দুধ দিচ্ছ, লোকের কাছে বলবার জোর খাটবে তোমারই তো বেশি। আর তুমি তো লোকের কাছে দুধের

দাবি নিয়ে যাবে মেনকা বলে নয়, কমরেড মেনকা বলে যাবে, সমিতির কর্মী হিসেবে যাবে। তাহলে তোমার কথা মানবে না কে বলতো? আর অন্য মেয়েদের নিয়ে সবাই মিলে বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করবে। সে কাজ তোমরা খুব পারবে। কাজে নেমেই দেখ না একবার।

মেনকা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, আচ্ছা কমরেড, আমি তাহলে আজই বেরোব। তবে দাদাকে বলে দেবেন আমাদের কাজ একটু দেখাশোনা করবার জন্যে।

পরে যমুনাকে নেতা করে মেয়েদের আর একটা দুধের স্কোয়াড করা হ'ল। এই ভাবে মেয়েদের সক্রিয়ভাবে রিলিফের কাজে নামানো হ'ল।

এদিকে কয়েকদিন থাকার পর এখানকার কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে রহীম চলে গেল অন্যান্য এলাকায়। সেখানকার অবস্থাও প্রায় একই। সে গিয়ে দেখলে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবার পর স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই রিলিফের কাজ সেখানেও শুরু হয়ে গেছে।

তাহলেও তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। রিলিফ সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য সংগঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হ'ল। দুধের ব্যবস্থার জন্য এখানেও মেয়েদের স্কোয়াড তৈরী হ'ল এবং উমাকে দেওয়া হ'ল তার প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু রহীম প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলে সমিতি ও পার্টি সংগঠনের কাজে কর্মীদের মধ্যে যেমন আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, রিলিফ সংগঠনে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। তখন সে কোন কোন কেন্দ্রে গিয়ে রিলিফের গুরুত্ব ও রাজনীতি ব্যাখ্যা করলে কর্মীদের বৈঠকে। এরপর অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

ইতিমধ্যে রমেশ ফিরে এল প্রাদেশিক কেন্দ্রের খবর ও চিঠি এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে। সংকটের সংবাদ কাগজে এখনো যথেষ্ট বেরোয়নি। আবাদের অবস্থা সম্বন্ধে রহীমের রিপোর্টের ভিত্তিতে

যে সংবাদ কাগজে দেওয়া হয়েছিল তাও সব প্রকাশ করা হয়নি। গবরমেণ্ট এখনো যথেষ্ট নড়াচড়া করছে না, রিলিফের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে না। যুদ্ধের আবহাওয়ায় এ সমস্ত কাজই যেন চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। তবে এখানকার সিদ্ধান্তকে তাদের কেন্দ্র সঠিক মনে করে বলে জানিয়েছে তাদের।

রিলিফের কাজের সাথে সাথে ভুখমিছিলের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'ল। এই কাজের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হ'ল এখন রমেশের উপর। মিছিল সংগঠনের জন্য সে এক একটা ইউনিয়ন ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল, মিছিলের উদ্দেশ্য ও স্লোগান ব্যাখ্যা করতে লাগল এবং সেই সঙ্গে রিলিফের জন্যও প্রচার শুরু করলে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা রহীম অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে সারা এলাকাটা চষে বেড়ালে রিলিফের কাজে। সে প্রথমেই বলেছিল, কমরেড, আমাদের এই সংগঠিত এলাকার কোন কৃষককে বা মজুরকে অনশনে মরতে দেওয়া চলবে না, যেমন করে হ'ক সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নইলে সমিতির ওপর তাদের আস্থা কমে যাবে। কিন্তু সমিতিকে আমরা লোকের চোখে খেলো করতে পারি কি? সকলকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব সকলে মিলে আমাদের নিতেই হবে, পেছিয়ে গেলে চলবে না।

এই দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এলাকার কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে রহীম অমানুষিক পরিশ্রম করলে অথচ এই সংকটের সময়ে সব দিন যথেষ্ট পরিমাণে খেতেও পেলে না, পুষ্টিকর খাদ্য জুটল আরো কম। অনেক সময় ঘুমেরও ব্যাঘাত হ'ল। এই দীর্ঘ একটানা কাজের চাপে তার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ল, ক্রমে যেন অশক্ত হয়ে আসতে লাগল। ইতিমধ্যে বর্ষার সূচনাও দেখা গেল। এখন সকলেই তাকে বিশ্রাম নিতে বললে। সেও বুঝলে তাছাড়া উপায় নাই।

এখন অবশ্য এত খাটুনির আর প্রয়োজনও নাই। নিছক খাদ্যের অভাবে উপোস করতে বাধ্য হয়ে মরেনি একজনও, একটি দুগ্ধপোষ্য

শিশুও না। ভুখ মিছিলের ফলে সরকারি রিলিফের ব্যবস্থা কিছু হয় নি, প্রচারের কাজটাই হ'ল। কিন্তু রিলিফ সংগঠনের কাজের মধ্যে দিয়ে কর্মীরা গভীর আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'ল, দীর্ঘ সময় এক-যোগে কাজ করতে অভ্যস্ত হ'ল, মেয়ে কর্মীদের মধ্যে নতুন চেতনা ও যোগ্যতা দেখা গেল। বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্ব সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট অনুভূতি জাগল সকলের মনে। দুঃস্থদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য যোগাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি কিন্তু মৃত্যু এড়িয়ে খাড়া হয়ে চলাফেরা করতে দেবার মতো ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন তাদের কাজ পাবার সুযোগ আসছে।

ছোট চাষীরা সমিতির পূর্বেকার নির্দেশ মেনে চলার ফলে যে সংকটের কবল থেকে অনেক পরিমাণে বেঁচে গেল, তাতে তারা এখন নিজেদের প্রয়োজন ও মজুত খাদ্যের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আগের চেয়ে মিতব্যয়ী হতে অভ্যস্ত হ'ল।

তবে এই সংকটের সময় কর্মীদের মধ্যে অল্প কিছু লোক নিজেদের দুর্বলতাও প্রকাশ করে ফেললে। কারো কারো মধ্যে দেখা গেল লোভ, কিছু লোকের মধ্যে কর্মবিমুখতা, আবার কারো কারো মধ্যে নেতৃত্বের মোহ। রমেশ কিন্তু এবার পূর্বের দুর্বলতা দূর করে যথেষ্ট কাজ করলে।

রহীম যখন কলকাতা ফেরবার আগে রোস্তমের বাড়ি এসে ঢুকল, তার রোগা শরীর দেখে রোস্তমের মা বারবার আফসোস করতে লাগলেন। বললেন, হায় হায়, কী চেহারা ছেল আর কী হয়েছে বলতো বাবা! এত খাটুনি কি সহ্য হয়!

রমেশ তার অবস্থা দেখে তাকে একা কলকাতা আসতে দিলে না। অন্য কমরেডরাও তাকে বললে রহীমের সঙ্গে আসতে। সে এসে তাকে বাড়ি পৌঁচে দিয়েই চলে গেল। রহীম তাকে চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করলে রমেশ জবাব দিলে, অন্য সময়ে খাব কমরেড। এখন খবর দিইগে আফিসে।

যখন শ্রান্ত ক্লান্ত রোগা শরীরটাকে টেনে নিয়ে রহীম আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল, তখন মরিয়ম দেখে ছুটে এসে কেঁদেই ফেললে। তার পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথাটা দুহাতে ধরে বুকে টেনে নিয়ে বললে, কী রোগ নিয়ে এলি বাবা! এমন অবস্থা হয়েছে, চিকিৎসাও তো হয়নি বোধ হয়। সে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

নূরজাহান ও জাহানআরাও এসে দাঁড়াল। তাদেরও মুখে বেদনার চিহ্ন স্পষ্ট। নূরজাহান আস্তে আস্তে বললে ইস্! কী হয়ে গেছে ভাই, আপনার চেহারাটা!

তোমার বাচ্চা কেমন আছে বুবু? রহীম প্রশ্ন করলে।

ভালো আছে ভাই। ঘুমোচ্ছে এখন।

মরিয়মের দিকে চেয়ে হাসি মুখে রহীম বললে, মা, তুমি ভাবনা কোরো না। তোমার কোলে আবার ফিরে এসেছি তো। আমার কোন রোগ হয়নি, চিকিৎসারও দরকার নেই। তবে এই কটা হপ্তা বড় বেশি মেহনত হয়েছে, তার সঙ্গে খাবার কষ্ট গেছে। তাই শরীরটা খুব ক্লান্ত। রোগাও হয়েছে। তা হ'ক, সারতে দেরি হবে না। যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম, তোমরা ধারণা করতে পারবে না। তবে আমার আনন্দ কী জান মা? আবাদের অনেক লোক মরতে যাচ্ছিল। তাই তাদের বাঁচাবার জন্যে পরিশ্রম বড় বেশি হয়েছে। তা হ'ক মা, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছিলাম বলে তাদের একজনকেও মরতে দিইনি, একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও না। তাই আমার এই দেহের কথা ভেবে দুঃখ করি না আমি। এ সারতে আর কদিন লাগবে?

সকলেই কিন্তু ধারণা করে নিলে ভিতরে রোগ কিছু আছে। নইলে শরীর এত রোগা হবে কেন?

রহীম আস্তে আস্তে উঠে গোসল করে অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে থাকল। জাহানআরা থাকল তার কাছে। তার মা বলে দিয়েছে, তোকে এখন আর কোন কাজ দেখতে হবে না, ওর কাছে থাকগে।

কখন কী দরকার হয় দেখবি। আর বেশি উঠতে দিবি না। নিজেও মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে লাগল।

রমেশ তাদের পার্টির আফিসে গিয়ে একজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে এল রহীমকে। তিনি দেখেশুনে বললেন, দুদিন একটু হালকা খাবার খাওয়া দরকার, মানে বেশি গুরুপাক জিনিস না হয় আর কি। আমি গিয়ে একজন ডাক্তার পাঠাবারও ব্যবস্থা করছি। অসুখ তেমন কিছু না থাকলেও একবার দেখানো দরকার।

জাহানআরা গিয়ে তাড়াতাড়ি চা করে নিয়ে এল তাঁদের জন্য।

হাতেম বাড়ি ফিরে এসে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হ'ল। বিষণ্ণভাবে বললে, তাই তো বাবা, শরীর যে তোমার বড্ড কাহিল হয়ে গেছে। দেখি আমি একজন ডাক্তারকে খবর দিইগে দেখে যাবার জন্যে।

জাহানআরা বললে, না আব্বা, তোমাকে যেতে হবে না। ডাক্তারের জন্যে খবর দেয়া হয়েছে।

আপনি বসুন মামু, হাসিমুখে বললে রহীম। আমার অসুখ কিছু নাই, শুধু খাটুনি খুব বেশি হয়েছিল বলে একটু রোগা হয়ে গেছি। তাহলেও আমাদের এক কমরেড এসেছিলেন, বলেছেন ডাক্তার পাঠিয়ে দেবেন।

আরো কিছুক্ষণ আলাপ করবার পর তাদের একজন ডাক্তার কমরেড এবং আরো কয়েকজন কমরেড এল। সকলেই তার পরিচিত। জাহানআরার ও হাতেমের সঙ্গে রহীম পরিচয় করে দিলে তাদের। আবার চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল জাহানআরা।

ডাক্তার তার অবস্থার কথা শুনে অনেকক্ষণ ধরে খুব যত্নের সহিত পরীক্ষা করে দেখে বললে, না রহীম সাহেব, শরীর আপনার ঠিক আছে, কোন রোগ ব্যাধি নেই। তবে বিশ্রাম নিয়ে আর খেয়ে শরীরের ক্ষয়টা পূরণ করতে হবে। এখন বাইরে কোথাও যাবেন না। পুষ্টির দিক থেকে খাওয়া যতটা ভালো হয় সেটা দেখবেন, তবে প্রথম কয়েকটা দিন গুরুপাক খাবার খাবেন না। অনেকদিন তো পেটকে শুকিয়ে রেখেছেন, তাই হঠাৎ যেন বেশি চাপ না পড়ে।

হাতেম প্রশ্ন করলে, 'অসুখ তাহলে কিছু নেই তো ডাক্তারবাবু?

আজ্ঞে না, কিছু না, বললে ডাক্তার।

হেসে আবার বললে, তাহলে আপনার এলাকায় যে সব লোক না খেয়ে মরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তাদের অনশন ভঙ্গের জন্যে আপনি নিজেই অনশন করেছেন, এই তো ব্যাপার? সদাশয় গবরমেণ্ট কিন্তু তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করতে চায়নি।

জাহানআরা বললে, এ রকম ব্যক্তি স্বাধীনতায় দাবি যদি তোলেন আপনারা, তাহলে দেখবেন গবরমেণ্ট সব সময়েই আপনাদের দাবি পূরণ করবার জন্যে প্রস্তুত। গবরমেণ্টকে গালাগালি দেবারও সুযোগ পাবেন না আপনারা।

সকলে হেসে উঠল। রহীম বললে, তা ঠিক। ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললে, তবে আমার পক্ষে খুশী হবার বিশেষ কারণ কী জানেন কমরেড? কেউ যে মরেনি সে কথা বাদ দিয়ে বলছি, সরকারের এই মনোভাব সত্ত্বেও ঐ এলাকার মানুষগুলো কেবল নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। বাইরে থেকে আমরা গিয়ে তাদের কেবল রাজনীতিটাই দিয়েছি, করবার যা কিছু তারা নিজেরাই করেছে। কোন রিলিফ কমিটি থেকেও সাহায্য পায়নি তারা। কেউ একবার উঁকি মেরে দেখেওনি সেখানে মানুষ বাস করে কিনা।

যাবার সময় ডাক্তার বললে, কোন রকম প্রয়োজন বোধ করলেই আমাকে খবর দেবেন। আর সেরে উঠে আপনি কাজকর্ম আরম্ভ করবার আগে আর একবার দেখব আপনাকে। শরীর আপনার কাজকর্ম করার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত হয়েছে কিনা সেটা জানতে হবে।

ডাক্তার চলে গেল রহীম প্রসন্ন মুখে বললে, জাহানআরা, এও আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আগে কখনো ভাবিনি এরও প্রয়োজন হবে। আজকের এই অবস্থায় পড়ে ভাবছি তোমার সেবা, নূরজাহানের যত্ন, মায়ের স্নেহ আমার পক্ষে কত মূল্যবান। এ সুযোগ সকলে পায় না, তুমিই দিয়েছ আমাকে। মায়ের কথা আর তুললাম না।

চব্বিশ

দিন দশেকের মধ্যেই রহীমের শরীরের স্পষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গেল, চেহারা ফিরতে লাগল। এই সময়টা সে প্রায় শুয়েই কাটিয়েছে। দৈনিক কাগজখানা ছাড়া পড়েনি কিছু। পথ্য পেয়েছে ভালো ; মরিয়মের নিজের হাতের ব্যবস্থা কোন ক্রটি হতে দেয়নি। জাহানআরা অধিকাংশ সময় তার নিকট বসে থেকেছে। অবসর সময়ে মরিয়ম ও নূরজাহান এসে বসেছে তার কাছে। ফুরসত পেলে হাতেমও এসেছে, বসে গল্প করেছে। রহীমের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে পরিবারটির মধ্যে যেন আরো ঘনিষ্ঠ মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

হপ্তাশেষে এখানে থাকা কালে লোকমানও অল্প সময়ের জন্য বসেছে তার কাছে, দু চারটে কথাও বলেছে। কিন্তু এ বাড়িতে তার উপস্থিতিটা এই মিলন ক্ষেত্রের আবহাওয়ার পক্ষে খুব অনুকূল হয়নি।

জাহানআরা যে দীর্ঘ সময় বসে থাকে রহীমের কাছে, সে সময়ে তারা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করে, পরস্পরের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়, আরো গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয় পরস্পরের প্রতি। বিশেষ করে রহীম জাহানআরাকে দেখতে থাকে নতুন দৃষ্টিতে, পূর্বেকার গুরু-শিষ্যা সম্পর্কের বাইরে, তাকে নিজের সঙ্গে সমান ও অন্তরঙ্গের পর্যায়ে নিয়ে। তার এই নতুন দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে জাহানআরার মনেও আত্মমর্যাদা বোধ বেড়ে যায়, তার সঙ্গে সে নিজেকে আরো ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বলে অনুভব করতে থাকে।

রহীম যখন প্রথম দুর্বল শরীর নিয়ে বাড়ি ঢুকেছিল, তার চেহারা

দেখে জাহানআরা কেবল ব্যথিত হয়নি, ভয়ও পেয়েছিল। সে তার মায়ের মতো কেঁদেই ফেলত, যদি মা-বোনের উপস্থিতিতে সংকোচ এসে বাধা না দিত। ডাক্তার এসে যখন আশ্বাস দিলে রোগের আক্রমণ হয়নি তখন অনেকটা ভরসা পেলে কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। এখন রহীমের শরীরের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে দেখে তারা দুজনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তাদের পারস্পরিক নতুন পরিচয় তাদের অন্তরের সংযোগকে নিবিড়তর করেছে, দুজনের মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ককে গভীরতর করেছে।

তারপর আর রহীম বেশি শুয়ে থাকে না, বসে ওঠে। বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করে কিন্তু বাইরে যায় না। পড়েও কিছু কিছু। জাহানআরাও আগের চেয়ে কম সময় থাকে তার কাছে। তাহলেও রহীমের এখনো চলছে পূর্ণ বিশ্রাম।

মাসখানেকের মধ্যেই সে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পেলে। ডাক্তার আবার পরীক্ষা করে তাকে কাজের উপযুক্ত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করলে।

ডাক্তার দেখাবার জন্যই সে আজ প্রথম বাইরে গিয়েছিল। দুপুরে খাবার সময় হয়েছে। হাতেম তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে এসে যখন ডাক্তারের মত ঘোষণা করলে, মরিয়ম দু হাত তুলে দোয়া করলে, আল্লার কাছে হাজার শোকর। আল্লা তোমায় ভালো রাখুক, সুখে রাখুক।

হাতেম। খুব খুশীর কথা বাবা। পয়লা তোমার চেহারা দেখে আমার বড্ড ভাবনা হয়েছিল।

রহীম। তুমি বোধ হয় সেদিন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলে, না মা?

মরিয়ম। আমার বুকের ভেতরটায় যে তখন কী হচ্ছিল তুমি বুঝতে পারবে না বাবা। ছেলের ঐ অবস্থা দেখলে কোন মায়ের মনে চয়েন থাকে বল? যাই হ'ক, খোদা রক্ষে করেছে।

রহীম। খোদা হয়তো রক্ষে করেছে, কিন্তু মা, তুমি যে খাবার

ব্যবস্থা করেছ আর তার সঙ্গে তোমার যে স্নেহযত্ন পেয়েছি, তার অভাব হলে এত শীঘ্রি এমন চাঙ্গা হতে পারতাম না। এখন আবার আগের মতো কাজ করতে পারব।

জাহানআরা। মা, বুঝলে একথার মানেটা কী? তোমাকে নোটিস দিয়ে রাখা হ'ল আবার এই অবস্থা ঘটতে পারে বলে।

রহীম। না মা, ওর কথা বিশ্বাস ক'রো না। ও শুধু শুধু আমার দুর্নাম দিচ্ছে তোমাদের কাছে। মামু, আপনি বলুন তো আমার কথার মধ্যে কোন বদ মতলব দেখতে পেয়েছেন?

হাতেম। মতলব যদি কিছু থাকেও তাকে বদ বলতে পারব না।

জাহানআরা ও নূরজাহান দুজনে খিলখিল করে হেসে উঠল। মরিয়ম বললে, ওকে তো দোষ দিতে পারিনে মা। ওর যা কাজ আর এখন যা অবস্থা তাতে কী ঘটবে কেউ জানে না। রহীমকে বললে, তবে দেখিস বাবা, নিজের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখিস। শরীর কমজোর হলে তোর কাজেরও তো ক্ষতি হবে।

চারিদিক থেকে কলকাতায় খবর আসতে লাগল বাংলাদেশে ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। কয়েকটা জেলায় রীতিমতো দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে দেখা গেল গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু লোক কলকাতায় আসছে খাদ্যের সন্ধানে। গ্রামের দিকে চাল কিনতে পাওয়া যায় না, অথবা পেলেও দর অসম্ভব চড়া।

আরো পরে' যখন অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল, কিছুতেই দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি যখন গোপন বা অস্বীকার করবার কোন উপায় থাকল না, তখন গবরমেণ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করলে। রহীম তার আবাদ এলাকার অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে দেখলে সংকট সেখানেও আছে কিন্তু তখনো মারাত্মক হয়ে ওঠেনি।

আবাদের মরসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত এলাকায় ধান কিনতে বা ধার করতে পাওয়া গেল। অবশ্য দর চড়া ছিল। কিন্তু মরসুম

শেষ হবার পর আস্তে আস্তে কিনে খাবার সুযোগও প্রায় খতম হয়ে গেল। বহু ছোট চাষী এবং মজুররা অধিকাংশই বিপদে পড়ে গেল; দুর্ভিক্ষের সংকট তাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

সেই অবস্থা আসতে বিলম্ব নাই বুঝে রহীম তার পার্টির ও সমিতির মারফত সরকারী রিলিফের জন্য ব্যবস্থা করলে। জেলা ও মহকুমার সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের এলাকার অবস্থা আলোচনা করে নিয়মিতভাবে রিলিফ পাবার একটা কাজ চলা বন্দোবস্ত করানো গেল। তারপর এলাকায় গিয়ে নিজে একবার বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থা দেখে রিলিফের জন্য সংগঠন ঠিক করে নিলে।

ইতিমধ্যে অল্প কিছু লোক খাদ্যের সন্ধানে এলাকার বাইরে চলে গেছে। রিলিফ দেওয়া আরম্ভ হ'ল যখন তখন আর লোক এলাকা ছেড়ে গেল না, বরং যারা গিয়েছিল তারাও খবর পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু খয়রাতী সাহায্য যা আসে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই ভাগ করে যাদের সাহায্যের একান্ত দরকার তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। শৃংখলার সহিত বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয় সমিতির ও পার্টির কর্মী ও ভলন্টিয়ারদের মারফত।

প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও যে পরিমাণ রিলিফ এই সমগ্র এলাকাটায় বণ্টন করা হয় তা নিতান্ত অল্প নয়। তার মধ্যে থেকে কর্মীদের দরদী হৃদয় ও সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে একটি দানাও অপচয় হতে পায় না। অথচ হাজার হাজার দুঃস্থ মানুষের ক্ষুধার অন্ন অন্তত আংশিক ভাবে চুরি করে জনকয়েক শয়তানের পেট ভরাবার এমন একটা মওকা যে মাঝ মাঠে মারা যাচ্ছে, তাই দেখে ইউনিয়ন বোর্ড চক্রগুলি রিলিফ কর্মীদের পিছনে লাগল। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা চালাবার চেষ্টা করে সে কথা তারা কর্তৃপক্ষের কানে তোলার ব্যবস্থা করলে।

তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তদন্ত করা হ'ল। তদন্তে প্রকাশ পেলে যে দুঃস্থদের স্বার্থ রিলিফ বণ্টনের এত উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এ অঞ্চলে আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার যারা করেছে তারা বিদ্বেষের বশেই করেছে, হয়তো কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তখন আরো বেশি সাহায্য চাওয়া হ'ল এবং পাওয়াও গেল। রিলিফির পরিমাণ কিছু বাড়ানো গেল।

ক্রমে কাঁচা রিলিফের পরিবর্তে সরকারী নির্দেশে খিচুড়ি রান্না করে দুঃস্থদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে হ'ল। বিভিন্ন কেন্দ্রে সেজন্য রান্নার বন্দোবস্ত করা হ'ল। তাতে পেট অবশ্য ভরে না কিন্তু কোন প্রকারে জীবন ধারণ করা চলে।

রহীম, রমেশ, নেয়াজ, নিতাই, শিবু, বসন্ত, কাসেম, অর্জুন এবং এমনি আরো কিছু কমরেডকে তদারকী কাজে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় রিলিফ ব্যবস্থায় কোথায় কী ত্রুটি আছে, কী উপায়ে তার উন্নতি হতে পারে। বিভিন্ন কেন্দ্রের বন্দোবস্তের মধ্যে সাংগঠনিক যোগাযোগ রাখারও সুবিধা হয় তাতে। রহীমকে এবং কখন কখন রমেশকেও সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কলকাতা ও বসিরহাট যেতে হয়।

কম সময়ে কলকাতা যেতে হলে আট ন মাইল পথ পায়ে হেঁটে খেয়া পার হয়ে রেল ধরতে হয়। সেজন্য এ সময়ে রহীম ও রমেশ এই পথেই যায়। রেলে যেতে রহীম দেখে অসম্ভব ভিড়; দলে দলে দুঃস্থরা বিনা টিকিটে চলেছে কলকাতায় খাদ্যের আশায়। তাদের অধিকাংশই রাত্রে এইভাবে ফিরে আসবে এবং পরদিন আবার যাবে।

রেল লাইনের পাশের অনেক গ্রামেও রিলিফ কিচেন খোলা হয়েছে। অসংখ্য দুঃস্থের ভিড় লেগেছে সেখানে; সকলে স্থানীয় লোক নয়, অনেকেই এসেছে বাইরে থেকে। তার সঙ্গে দেখা যায় দীর্ঘদিনের অনশনের ফলে উপবাসীদের মৃত্যুর মিছিল। এই সব এলাকায় কোথাও কোথাও রহীম তার স্থানীয় কমরেডদের রিলিফ ব্যবস্থা দেখতে গিয়ে দেখেছে তাদের এলাকার বাইরে দুঃস্থ অবস্থায়

ডজন ডজন মানুষ পথে ঘাটে হেথাসেথা মরে পড়ে আছে। সৎকারের ব্যবস্থা করা কঠিন। শকুন আর শিয়াল কুকুরের মহোৎসব। লোকে দেখেও দেখছে না, যেন এ এক মামুলী দৃশ্য, তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তার পক্ষে এই দৃশ্য দেখা অত্যন্ত কঠিন হ'ল, তবু দাঁতে দাঁত চেপে দেখে গেল সে।

এই করুণ ও বীভৎস অবস্থার কাহিনী শুনে একদিন জাহান-আরা জোর করে ধরলে রহীমকে যে তাকে রিলিফ ব্যবস্থা এবং এই দৃশ্যও দেখতে হবে। তার মা দেখতে নিষেধ করলে। বললে, দেখে সইতে পারবি না, আমার শুনেই কেমন হচ্ছে। কিন্তু রহীম এড়াতে পারলে না, সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে মৃত্যুর দৃশ্য দেখালে। চোখের উপর দেখলে তারা শুধু মরা মানুষ যে পড়ে আছে তাই তাই নয়, কোন লাশের গায়ে কতটুকু কাপড় আছে বা নাই তাই নয়, দেখলে দুঃস্থ, অস্থিচর্মসার মানুষের কাঠামোগুলো উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনের মতো নিরুদ্দেশের পথে চলেছে। কথা বলতে বলতে এক এক সময় এক এক জন হঠাৎ ধড়াস করে পড়ে যায় আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার শীতল নিষ্প্রাণ দেহ প্রেতলোকের অন্যান্য অসংখ্য যাত্রীর সঙ্গে মিলে যেন মুমূর্ষু জীবন্তদের প্রতি বিদ্রূপের অট্টহাসি হেসে ওঠে। জাহানআরার সারা গা এই অসহ্য করুণ দৃশ্যের সামনে শিউরে উঠল, কিন্তু তবু সে শক্ত হয়ে চলতে লাগল রহীমের সঙ্গে।

খেয়া পার হয়ে এতখানি পথ একটানা হেঁটে যাওয়া যে অনভ্যস্ত জাহানআরার পক্ষে সম্ভব হবে না তা রহীম ধরেই নিয়েছিল। তারা মধ্যপথে এক কমরেডের বাড়ি সেদিনটা থেকে পরদিন পৌঁচল আমতলী। পথের পাশের এক গ্রাম সমিতির কর্মীদের পরিচালিত রিলিফ কিচেন দেখে গেল।

রহীমের পরামর্শে রোস্তম জাহানআরাকে বিশেষভাবে দেখালে আমতলী আর মোল্লাপাড়ার রিলিফ ব্যবস্থা। সে তাকে দুঃস্থদের

বাড়ি নিয়ে গেল, দুঃস্থ নয় এমন কৃষকদের বাড়িও গেল। জাহান-আরা সকলের সঙ্গে এবং বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে শুনতে লাগল তাদের দুঃখের কাহিনী। রিলিফ কেন্দ্রে গিয়ে জাহানআরা বললে তাকে কোন কাজ দেওয়া যায় কিনা।

কিন্তু কাজ তাকে দেবে কে? রহীমের বৌ সে, শহরের মেয়ে, কাজ দেবার কথা কেউ ভাবতেই পারলে না। তাও আবার রহীম এখন উপস্থিত নাই। জলধর বললে, আপনি আর এখানে কী কাজ করবেন? আপনার করবার মতন কাজ ধর গিয়ে এখানে আছেই বা কী? যাই হ'ক, কমরেড এলে বলব আপনার কথা।

জলধর ঠিকই বলেছিল। তার করবার মতো কাজ এখানে তেমন কিছু নাই। রহীম এলে সেও তাই বললে।

ইতিমধ্যে মেনকা খবর পেয়েছে জাহানআরা এখানে আছে এবং রিলিফের ব্যবস্থা দেখেছে। সে তার গ্রামের এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে গেল যমুনার বাড়ি। যমুনাকে নিয়ে রোস্তমের বাড়ি হাজির হ'ল জাহানআরার সঙ্গে দেখা করতে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মেনকা বললে সে জাহানআরাকে তাদের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়। জাহানআরার আপত্তি নাই।

কিন্তু রোস্তমের মা ভাবলেন জাহানআরা ছেলেমানুষ, হুজুগ পেলে যেতে চাইবেই। তিনি যখন মুরুব্বি তখন তাঁর দায়িত্ব আছে একটা। রহীমকে না বলে তিনি তাঁর ভাইঝিকে খুশীমতো যেখানে সেখানে যেতে দিতে পারেন না। তিনি তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে বললেন, রহীম এখানে নাই, তুই না বলে যাবি কী করে? আমাকেও তো সেকথা বুঝতে হবে।

জাহানআরা হেসে বললে, না ফুফু তুমি ভেবো না। আমি যাই করি, যেখানেই যাই, তিনি কিছু বলবেন না।

ছাখ বাছা, যা ভালো বুঝিস কর। তাহলে রোস্তমকে সাথে লিয়ে যা, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার কথা মেনে নিয়ে বললেন।

রোস্তমভাই যেতে পারে চলুক। তবে ওরা আমাকে রেখে যাবে বলেছে। রোস্তম তখন ছিল না। তিনি তাদের বলে দিলেন, দেখো বাছা, বেলাবেলি রেখে যেয়ো ওকে।

জাহানআরাকে যমুনার ও মেনকার বাড়ি দুই গ্রামেই যেতে হ'ল। অবশ্য পাশাপাশি গ্রাম, দূর নয় বেশি। তবে মেনকার বাড়ি গিয়েই বেশি সময় কাটালে। পাড়ার অনেক মেয়ে এল। নানা ধরনের কথাবার্তা হ'ল, বিশেষ করে এই সংকট ও রিলিফের কথা। গ্রামের হিন্দু বাড়ির অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। তাকে কিছু খেতেও হ'ল, মেনকা না খাইয়ে ছাড়বে না।

ঘরে দুধ আর গুড় ছিল, তার সঙ্গে কিছু চাল দিয়ে তাড়াতাড়ি একটু পায়স করে দিলে। এখানকার অবস্থায় পায়স দেখে জাহানআরা একটু প্রতিবাদ করলে কিন্তু খেতে হ'ল। গরম পায়স হাত দিয়ে খেতে হবে, সে অনভ্যস্ত। কিছু না ভেবে বলে ফেললে, একটা চামচ দিতে পারেন দিদি? কিন্তু চামচ সেখানে কোথায় পাবে? দুই পক্ষই অপ্রস্তুত হ'ল।

রিলিফের এই সামান্য সরকারী সাহায্যও মাঝে মাঝে বাধা পেতে লাগল। সরবরাহ নিয়মিত এসে পৌঁচয় না, মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায় আসতে। তখন খিচুড়ি রান্না দু একদিন করে বন্ধ থাকে, লোককে উপবাস করতে হয়। এই কারণে জীবনীশক্তি ক্ষয় হতে লাগল। কিছু কিছু রোগের আক্রমণও হতে দেখা গেল। কার্ত্তিক-অগ্রাণের অল্প হিমও অনেকে সহ্য করতে পারে না, বিশেষত শিশুরা। যথেষ্ট কাপড় চাদরেরও অভাব। নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, পেটের রোগ ধরলে অনেক লোককে। জনকতক লোক মারাও পড়ল, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কিছু বেশি লোক মরল। এই রিলিফ দিয়ে সকলকে বাঁচানো সম্ভব হ'ল না এবার, তবে মৃত্যুর মিছিল দেখতে হ'ল না।

ফসলটা এবার ভালো হয়েছে। সামনে ধানকাটার মরসুম। মাঠ হলদে হয়ে গেছে। সারা মাঠে সমস্ত ধানগাছ শুয়ে গেছে। দিগন্তব্যাপী বিশাল পীতাম্বর আস্তরণে ধরণী বক্ষ আবৃত হয়ে আছে। এ দৃশ্য কৃষক হৃদয়ের আনন্দ। কিন্তু এবারকার দুর্ভিক্ষের অশুভ আবহাওয়ায় সংকুচিত আনন্দ যেন মনে সাড়া জাগাতে চায় না।

রহীম রমেশ এবং আরো কয়েকজন নেতাকে নিয়ে আলোচনা করলে ধানকাটার মরসুম সম্বন্ধে কী করণীয়। সারা এলাকার মধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থা ও প্রয়োজন যেভাবে দেখে এসেছে তারা তার ভিত্তিতে স্থির করা হ'ল বর্তমানে ধানচালের দরের অনুপাতে মজুরী বৃদ্ধি করতে হবে, সমগ্র অঞ্চলের খোরাকীর ও চাষের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ধান এলাকার মধ্যে মজুত রাখতে হবে যাতে বাইরে চালান যাবার কারণে স্থানীয় লোকদের অভাবে পড়তে না হয়, ধান সরকার নির্দিষ্ট দরের চেয়ে অনেক বেশি দরে বিক্রী করা চলবে না এবং স্থানীয় খরিদদার থাকতে এলাকার বাইরে চালানের জন্য বিক্রী হবে না।

এই সমস্ত দাবি মেনে না নিলে সমস্ত মজুর একযোগে কাজ বন্ধ রাখবে। শুধু রোজ-মজুর নয়, মাহিন্দাররাও যেন কাজে না যায়।

আরো সিদ্ধান্ত হ'ল ধান কাটার কাজ ভালোভাবে শুরু হয়ে গেলে যারা কাজ পাবে তারা রিলিফ পাবে না, কিন্তু যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে শুকনো রিলিফ বা চাল দিয়ে যেতে হবে, আর অসুখের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এ দাবি অবশ্য সরকারের কাছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোস্তম বললে, কিন্তু যদি জোতদার-মহাজনরা আমাদের এই দাবি না মানতে চায় তো কী করব? জনমজুররা কাজ না হয় বন্ধ রাখবে। সরকার রিলিফও বন্ধ করে দেবে। তখন লোকে খাবে কী?

রহীম জবাব দিলে, কেন, মাঠের ধানগুলো যাবে কোথা? সব

ধান তো কাটা হয়ে যাবে না একদিনে।

কিন্তু কমরেড, সেটা কি আমাদের নীতি? প্রতিবাদ জানালে রমেশ।

বড় বড় জোতদার-মহাজনদের পৈশাচিক লোভের পরিচয় রহীম সারা বছর ধরে পেয়ে এসেছে। অত্যন্ত চড়া দরে অজস্র ধান তারা বাইরে চালান করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে, আর স্থানীয় লোকে ন্যায্য দরে ধান কিনতে না পেয়ে উপবাস করেছে। সরকারের নীতিহীন অব্যবস্থার খবরও সে জানে। পরে সরকারী রিলিফ যেটুকু এসেছে তা না এলে, আর বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে হাজারে হাজারে মানুষ খুন করার চক্রান্ত তারা করে রেখেছিল। এই অবস্থা রহীম সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। তাই ভেবে তার মন খিঁচড়ে ছিল।

সে চটে গিয়ে গলা একটু চড়িয়ে বললে, হ্যাঁ কমরেড, নীতির কথা তুললে বলব সেটাই আমাদের নীতি। এটা কী আমাদের নীতি নয় যে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষকে খাদ্য দিয়ে বাঁচাতে হবে? এটা কী আমাদের নীতি নয় যে বাঁধা দরের চেয়ে চড়া দরে ধান চাল কেউ বিক্রী করতে পারবে না, মুনাফাখোরী করবে না? এই নীতি যদি আমরা মানি তাহলে যারা নিজেদের মুনাফাখোরীর স্বার্থে মানুষকে না খাইয়ে মারবার ব্যবস্থা করে, মজুরী বৃদ্ধি না করে তাদের বেকার আর উপবাসী রাখতে চায়, তাদের এই চক্রান্ত বন্ধ করার জন্যে আমাদের নীতি কী হবে? কী ব্যবস্থা আমরা করব এই সমস্ত মানুষকে খাওয়াবার জন্যে, চড়া দর নামাবার জন্যে? এ জন্যে দায়িত্ব সরকারের। সরকার সে দায়িত্ব পালন করবে না। তাহলে আমাদেরই করতে হবে। তার জন্যে যদি কোন নীতি ঠিক না হয়ে থাকে তবে আমি যা বলছি তাই হবে আমাদের নীতি। এই নীতি ছাড়া এ পরিস্থিতিতে কাজ চলবে না।

কমরেডদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। রমেশ রহীমের যুক্তি

অস্বীকার করতে বা খণ্ডন করতে পারলে না, অন্তরের সহিত মেনে নিতেও পারলে না। তাই অসহায়ের মতো শুধু বললে, কিন্তু কমরেড—

বসন্ত বললে, যাই বলুন, কমরেড যা বললেন তাই ঠিক। নইলে আমরা খালি বড়লোকদের পেট মোটা হতে দোব আর গরিবদের পেটকে শুকিয়ে মারব। তা কি আমরা করতে পারি? অন্যেরা সমর্থন করলে।

সিদ্ধান্তগুলো অবশ্য তখনো পাকা নয়। সেগুলো লিখিতভাবে রহীমের যুক্তির ভূমিকা সহ সমস্ত কেন্দ্রে পাঠানো হ'ল পার্টি ইউনিট ও কৃষক কমিটিগুলির মতামতের জন্য। এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত কেন্দ্রে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। তার প্রচার চলতে লাগল। কয়েকটা জনসভা মারফত সরকারী দায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ্য-ভাবে প্রচার করে সেই সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের কথা জোতদার মহা-জনদের জানাবার ব্যবস্থাও করা হ'ল।

যে সব জনসভায় রহীম বক্তৃতা করলে তাতে সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য বলবার পর সে অত্যন্ত কড়া ভাষায় বড় বড় জোতদার মহাজনদের মানুষ মারা চক্রান্তকে আক্রমণ করলে এবং বার বার এ কথার উপর জোর দিলে যে গরিবরা, কৃষক ও খেতমজুররা যাতে এক জোট হয়ে এই চক্রান্তকে ভাঙতে পারে সেজন্য তাদের সমিতির মধ্যে সংগঠিত করতে হবে। এ হ'ল সারা এলাকার এবং সারা দেশের কৃষকদের জরুরী দায়িত্ব। এটা দয়াধর্মের ব্যাপার নয়, অন্যায় জুলুমকে সহ্য করে যাওয়ার কথা নয়, এ হচ্ছে মানবতার বিচারে মানুষকে বাঁচাবার জন্য গ্রামবাসী সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যারা এই কর্তব্য পালনে বাধা দিতে চায়, প্রকাশ্যে বা গোপনে তার বিরোধিতা করে, দেশের লক্ষ লক্ষ চাষী আর মজুর তাদের চিনে রাখবে, তাদের অন্যায়কে তারা কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

এই সমস্ত সভার প্রথমটিতে তার বক্তৃতার মধ্যে যেমন ছিল মুষ্টি-মেয় মুনাফাখোরদের প্রতি তীব্র কশাঘাত ও ঘৃণা, যেমন ছিল

অগণিত অভাবী অসহায় মানুষের জন্য গভীর মর্মবেদনা, তেমনি তার বলার ভঙ্গী ও ভাষার মধ্যে ছিল জ্বলন্ত বিদ্যুতের ছটা। তার বক্তব্যের পিছনে যেন ছিল কিসের এক অব্যক্ত প্রেরণা। এক এক সময় যেন সম্মোহিতের মতো তার মুখ দিয়ে কথা বেরোতে লাগল আর বারবার জনতার হাততালি যেন তার চটকা ভেঙ্গে দিতে লাগল। যখন সে তার স্বচক্ষে দেখা মৃত্যু মিছিলের ঘটনা বর্ণনা করলে, অনেকেই, বিশেষত মেয়েরা এবং অনেক কর্মীও না কেঁদে থাকতে পারলে না। একবার গভীর আবেগে তার নিজেরই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মিনিটখানেক নীরব থেকে চোখ মুছে আবার ধীরে ধীরে ধরা গলায় বলতে লাগল সে।

এই জনসভাগুলির মধ্যে প্রথমটি হ'ল মোল্লাপাড়ায়। তাতে মেনকা, যমুনা ইত্যাদি অনেক মেয়ে উপস্থিত ছিল। তাদের সঙ্গে জাহানআরাও ছিল। অনেক জোতদার, মহাজন এবং ধনী চাষীও ছিল। রহীমের বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতার মধ্যে জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়ল। তারা অবস্থা দেখে তখনি সরে পড়ল।

তারপরই সমিতির নিকট তাদের দিক থেকে লোক এসে প্রশ্ন করে কী হারে মজুরী তারা চায়। তখন দু পক্ষের আলোচনায় মজুরীর হার সমিতির দাবি অনুসারে ধার্য হ'ল। ধান বিক্রীর জন্য দর ও পদ্ধতি সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা রফা হয়ে গেল। তাসত্ত্বেও সর্বত্র জোতদার মহাজনদের আচরণ সম্বন্ধে কড়া নজর রাখবার জন্য কৃষকদের হুশিয়ার করে দেওয়া হ'ল।

এই মীমাংসার কথা অবিলম্বে সারা এলাকায় প্রচারিত হয়ে গেল। অন্যান্য সভাতেও ঘোষণা করা হ'ল। ধনীরা অন্তত সাময়িকভাবে সমিতির দাবি সর্বত্রই মেনে নিলে, তার বিরোধিতা করতে সাহস পেলে না। গরিবদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা

গেল। কর্মীরা রিলিফের কাজের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে বৈঠক করে আবার রাজনীতিক প্রচার চালাতে লাগল ধানকাটা শুরু হবার সময় পর্যন্ত।

ফসল কাটার সময় রিলিফ পাওয়া কঠিন হ'ল। সরকার আর দিতে চায় না। যে অল্প লোকের জন্য প্রয়োজন ছিল রিলিফের তাদের ব্যবস্থা গ্রামের লোককেই করতে হ'ল কিছু কিছু দিয়ে।

পঁচিশ

এবারে অবস্থাটা আগের বারের মতো হয়নি, তবু দুর্ভিক্ষের ছাপ যে রহীমের দেহেও লেগেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এবার পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাতও বিশেষ হয়নি, কিন্তু পুষ্টির অভাব ঘটেছে হামেশা। এমনও হয়েছে যে একবেলা খাওয়াই জুটল না, কিন্তু সেটা বেশি নয়। সব মিলিয়ে শরীর বেশ খানিকটা কাহিল হয়ে গেছে।

সমস্ত এলাকার মধ্যে জনসভার জন্য তার যে কাজ ছিল তা সেরে ফিরে এসে সে একটু বিশ্রাম নিলে। গত মরসুমে ধান কম পেলেও রোস্তমের বাড়ি খোরাকীর অভাব হয়নি। অন্যান্য খরচের জন্য বিক্রী কম করা হয়েছিল। পুকুরে মাছও ছিল। রিলিফের জন্য নিজের ক্ষমতামতো সাহায্য সে দিয়েছে এবং মেহনতও করেছে যথেষ্ট। সমিতির ও পার্টির প্রতি তার গভীর আস্থা, যেমন গভীর শ্রদ্ধা তার রহীমের প্রতি। তার সঙ্গে যে তার মামু-মামী মেয়ের বিয়ে দিয়েছে সেজন্য সে খুব সন্তুষ্ট এবং রহীমের সঙ্গে আত্মীয়তার জন্য নিজে একটু গর্বও বোধ করে। কেবল সেই নয়, তাদের এই ছোট পরিবারটিই মনে করে রহীমের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে তাদের মধ্যে।

সুতরাং এখানে তার যত্নের ত্রুটি হ'ল না। রোস্তমের মা বললেন, আবার তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ বাবা। এখন আর বেশি খাটাখাটনির কাজ ক'রো না, এখানে থেকে আরাম কর আর ঘরে বসে যা পার কাজ কর। গেল বারে যা দেখিছি, আমার বড্ড ডর লাগে।

না খালামা, আপনি ভয় করবেন না, এখানে আমার কাজ এখন প্রায় শেষ হয়েছে, রহীম হেসে জবাব দিলে। জলদি ধান কাটা শুরু হবে, তখন আর আমি করব কী ?

পুরোন কমরেডদের ডাকিয়ে নিয়ে রহীম বসল একবার। দাউদ বললে, কমরেড আবার রোগা হয়ে গেছেন আপনি। আর এখানে থাকবেন না এখন। আমরা এত লোক আছি, কাজ চালিয়ে নিতে পারব। তার কথা অন্যেরাও সমর্থন করলে।

রহীম বললে, হ্যাঁ, রোগা একটু হয়েছি বটে, তবে গেলবারের চেয়ে অনেক ভালো আছি। কিন্তু দাউদভাই, আমার কথা তো বললে, বসন্তকে তো দেখলে না। ও কি আমার চেয়ে কম রোগা হয়েছে ? রিলিফের কাজে খাটতেও হয়েছে। রিলিফের খিচুড়ি খেয়ে ও বেঁচে থেকেছে বটে, কিন্তু শরীর ঠিক রাখতে পারবে কেন ?

কর্মীরা যা বললে তাতে বোঝা গেল যে বসন্ত বা তার মতো অন্য গরিব কমরেডরা কেবল রিলিফের উপর বেঁচে থাকতে হলে এ অবস্থাও থাকত না তাদের। তাদের গ্রামের কমরেডদের থেকে তারা মাঝে মাঝে কিছু চাল ও তরিতরকারি পেয়েছে, তবে নিয়মিত-ভাবে নয়। আরো কিছু খেতমজুর কর্মী এভাবে রিলিফ ছাড়াও সামান্য অনিয়মিত সাহায্য গ্রামবাসীদের থেকে পেয়েছে কিন্তু তা অবশ্যই যথেষ্ট হতে পারেনি। আর কটা দিন তাদের দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হ'ল।

আনুষ্ঠানিক বৈঠক না হলেও রহীম তাদের কাছে বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থা, রিলিফের ব্যবস্থা, সংগঠনের কথা ইত্যাদি সংক্ষেপে রিপোর্ট করে বললে, কমরেড, এরকম সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এত বড় রিলিফের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কর্মীরা যেভাবে কাজটা চালাতে পেরেছে, সে খুবই তারিফ করার যোগ্য। এত বেশি কর্মী না থাকলে চালানো কঠিন হ'ত, অল্প লোককে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে অকেজো হয় পড়তে হ'ত। অবশ্য কর্মী বেশি থাকলেই যে কাজ ভালো হ'ত তা বলা যায় না। তাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা

আর মানুষের প্রতি দরদ না থাকলে, আর সেই চেতনা আর দরদকে কাজে লাগাবার মতো আমাদের সংগঠন না থাকলে এই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকভাবে করা যেত না।

বংশী বললে, ঠিক কথা কমরেড। লোকেও তাই বলছে। বলে সমিতির লোকজন এমন করে কাজ না করলে কত লোক না খেতে পেয়ে মরেই যেত।

হ্যাঁ, সমিতির কথা এখন লোকের মুখে মুখে, শিবু সায় দিলে। সেই ভয়েই তো জোতদার-মহাজনরা তাড়াতাড়ি মজুরীর দাবি মেনে নিলে।

রহীম বলতে লাগল, তা ঠিক কমরেড। এখন আমাদের এই সংগঠনকে আরো মজবুত করতে হবে, আরো কর্মী বাড়াতে হবে, নতুন কর্মীদের তালিম দিতে হবে। তাহলে আমাদের সংগঠনের এলাকার বাইরেও সমিতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আবাদের মধ্যে সমিতির এলাকার বাইরে যেন কোন অসংগঠিত খালি এলাকা পড়ে না থাকে। আর মজুরী বৃদ্ধি, ধানের দর আর ধান বিক্রীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়েছে জোতদার মহাজনদের সঙ্গে, তার বিরুদ্ধে যেই যাবে তাকেই কোণঠাসা করে রাখতে হবে। তার কাজ বন্ধ করা হবে, সভা ডেকে দেশের লোকের সামনে তার মুখোশ খুলে দিতে হবে। খুব হুশিয়ার কমরেড, ওরা ভয়ংকর শোষক শ্রেণী, ওদের কথায় বিশ্বাস করে আমরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকি, সব সময়েই যেন নজর রাখি ওদের ওপর।

রমেশের আসতে দেরি হ'ল। তার সঙ্গে পরে বিশেষ ভাবে আলাপ করলে রহীম।

কলকাতা ফিরে গিয়ে সে দেখলে নতুন পরিস্থিতি। যে পারিবারিক ভাঙ্গনটা লোকমান শুরু করেছিল বছরখানেক পূর্বে, এখন সেটা ষোলকলায় পূর্ণ হবার মুখে।

জাহানআরা অনেক পূর্বেই-রোস্তমকে নিয়ে ফিরে এসেছিল। সে যা কিছু দেখেছিল সমস্তই সবিস্তরে বর্ণনা করেছে মা ও বোনের কাছে। তার বাপকেও বলেছে। রহীম এলাকায় যাবার সময় যেমন শরীর নিয়ে গিয়েছিল তা যে খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছে, তাও জানিয়েছে।

রহীম বাড়ি ঢুকে হাত পা ধুয়ে এসে যখন বসল, মরিয়ম বললে, এবারও তো বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিস বাবা। ও এসে যতটা বলেছিল তার চেয়েও রোগা দেখছি।

মায়ের চোখে ছেলেরা অল্প রোগা হলেও বেশি মনে হয়, রহীম হেসে বললে। তবে এটা তো সত্যি মা, গত বারের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আর এখন তো আমি তোমার হাতে, এখন আবার স্বাভাবিক হতে আর কদিন লাগবে?

জাহানআরা এসে বললে, আমি যে রকম দেখেছিলাম তার চেয়ে এখন আরো খারাপ হয়েছে তোমার শরীর।

তার কোলে নূরজাহানের শিশুকন্যা। সুন্দর গোলগাল বাচ্চা। রহীম তাকে কোলে নিলে, সে সহজেই গেল। তাকে আদর করে চুমো খেয়ে কাতুকুতু দিয়ে খুব হাসাতে লাগল, উপর দিকে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিয়ে আরো হাসালে।

নূরজাহান এল খাবার আর চা নিয়ে। রহীম বললে, দেখছ নূরজাহান, তোমার মেয়ে তোমারই মতন মিশুক হবে। কোল বাছে না বোধ হয়। দেখ না, আমাকে কতদিন পরে দেখছে, তবু ঠিক এল কোলে।

আপনাকে তবু তো চেনে। অচেনা লোকের কাছেও যায়, গর্বের সঙ্গে বললে নূরজাহান।

মিশুক তো বটে বাবা, এখন আমাকেই মেরে রেখে যাবে, বিষন্নভাবে বললে মরিয়ম। নাতনিকে কোলে নিয়ে বললে, লোকমান এবার ওদের নিয়ে যাবে বলছে। তাকে বলছি এখানে

ফিরে আয়, তা কিছুতেই শুনছে না। একে না দেখতে পেলে কী করে থাকব বল তো বাবা!

চোখ মুছে ধরা গলায় বলতে লাগল, বাচ্চাটাও তো কাঁদবে আমাদের কাউকে না পেয়ে। আর ওর মা-ই বা থাকবে কী করে একলা?

সকলেই বসে ছিল একটা বিষাদের ছায়ায়। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলতে পারলে না। রহীমও ব্যথিত হ'ল। নূরজাহানকে সে স্নেহ করে, শিশুটিকে ভালো লাগে তার। নূরজাহান ও অন্যান্য-দের সঙ্গে একত্র থাকতে সে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের ছেড়ে কাজের জন্য দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে তার কষ্ট হয় না, কিন্তু নূরজাহান তাদের নাগালের বাইরে দূরে না গেলেও তার এই বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার মধ্যে যে বিচ্ছেদ বোধ আছে তার চিন্তা তাকে কষ্ট দিচ্ছে।

মরিয়ম আবার বললে, মেয়ের বিয়ে দিলে পরের বাড়ি যায় তা জানি বাবা। মা-বাপের মনে দুঃখও হয়, তা কেটেও যায়। কিন্তু লোকমানের সাথে বিয়ে তো সে ব্যাপার নয়। সে যে রাগ রাগ করে, জোর করে সরে গেল, তাতেই তো আমার দুঃখ। তবে উপায় তো নেই, সইতে হবে সবই।

কয়েকদিন পরেই রবিবারে লোকমান নিয়ে গেল নূরজাহান ও তার মেয়েকে। বেদনাবোধ সকলেরই মনে। কান্নাকাটিও হ'ল। তার মা ও জাহানআরাও সঙ্গে গেল। রহীম গিয়ে পরে নিয়ে এল তাদের।

দুটো দিন মরিয়ম খুব মনমরা হয়ে থাকল। অনেক সময় শুয়েই কাটালে। খাদ্যেও যেন রুচি নাই। ক্রমে অবশ্য অবস্থা স্বাভাবিক হতে লাগল। মাঝে মাঝে নূরজাহানদের বাড়ি গিয়ে দেখে আসতে লাগল।

কিছুদিন পরে হাতেম প্রস্তাব করলে এ বাড়ি ছেড়ে শহরের মধ্যে গিয়ে জাহানআরার বাড়িতে থাকার জন্য। তার মাছের

ব্যবসা যেভাবে চলছে তাতে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বেশি নজর দিতে হয় না। জমির ব্যবসাই তার সময় নেয় বেশি। কাজ তত নয় যত হয় কথা। এই সম্পর্কে অনেকে আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। এতদূরে আসার অসুবিধা, নতুন বাড়িতে গেলে সেটা দূর হবে।

যুক্তিটা ঠিকই। কিন্তু এই সব কথা বিবেচনা করলে এ প্রস্তাব অনেক আগেও আসতে পারত। আসেনি তার কারণ এই পুরোন বাড়ি ছেড়ে যেতে মন চায়নি তার। মরিয়মকেও রাজি করা তখন কঠিন হ'ত। কিন্তু নূরজাহান ও তার শিশুকন্যা চলে যাবার পর দুজনেই অনুভব করছে বাড়ি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। এই প্রচ্ছন্ন অনুভূতিই এখন হাতেমের প্রস্তাবকে জরুরী করে তুলেছে, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু দুজনেই পড়েছে দোটানায়। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। বাড়ির মধ্যে জায়গা অনেক, পুকুরে স্নান করা চলে, খোলা হাওয়া প্রচুর, ফলের গাছ আছে—আম, লিচু, নারকেল, পেয়ারা। কিন্তু এই আরামের চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন হ'ল তাদের সমগ্র বিবাহিত জীবন কেটেছে এই বাড়িতেই, তাদের সন্তানরা মানুষ হয়েছে এখানেই। ভালো-মন্দের, সুখ-দুঃখের সমস্ত স্মৃতি জড়িত এই বাড়ির সঙ্গে। এর থেকে বিদায় নেওয়া দুজনের পক্ষেই বেদনাদায়ক।

তাহলেও বিদায় নেওয়ার পক্ষের যুক্তি আরো জোরালো। জাহানআরার বাড়িতে থাকলে নূরজাহানদের সঙ্গে যাতায়াতের অসুবিধা থাকবে না, দিনে রাতে যে কোন সময়ে ইচ্ছা করলে একাও যাওয়া আসা চলবে। লোকমান রাজি নয়, নইলে একই বাড়িতে থাকতে পারত তারা। তা না হলেও ক্ষতি নাই, দুই বাড়ি কাছাকাছি আছে। তাই যাওয়াই সিদ্ধান্ত করলে তারা।

সরে যেতে জাহানআরার মনেও যে কষ্ট নাই তা নয়, তবে তা স্বভাবতই তার মা বাপের মতো নয়। বোন ও তার মেয়ের টান

ছাড়া যাওয়া হলে তার অন্য সুবিধাও আছে। সে রহীমকে বললে, এখানে থাকলে আমার পক্ষে বাইরে গিয়ে কোন কাজ করা কঠিন, সম্ভবই হয় না। শহরে থাকলে আমি অন্তত সেই সুযোগ পেতে পারব। তুমি কাপের ব্যবস্থা করে দেবে তো?

রহীম অবশ্য এই প্রস্তাব শুনে খুবই খুশী হ'ল। জাহানআরা কিছু কাজকর্ম করতে চায় সে জানত, এখন তার সুযোগ পাবে। অবশ্য কাজের দিক থেকে সুবিধা তারই সবচেয়ে বেশি হবে, এত দূর থেকে যেতে হবে না শহরে। জাহানআরাকে বললে, শহরের মধ্যে থাকলে তোমাকে দোব নারী সমিতির কমরেডদের সঙ্গে ভিড়িয়ে। অন্তত কিছু সামাজিক কাজ তো করতে পারবে। রাজনীতির দিক থেকেও আলোচনার সুযোগ অনেক বেশি পাবে।

বোমা পড়ার সময় জাহানআরার বাড়ি প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে নতুন ভাড়াটে এসে গেল। হালে নিচের তলা খালি হবার পর হাতেম আর ভাড়া দেয়নি, নিজের আসার চিন্তা করে খালি রেখেছিল। এখন তারা এসেই গেল।

ধাপার বাড়ি ছেড়ে আসতে সব চেয়ে বেদনাবোধ করেছিল মরিয়ম। কিন্তু এখানে এসে খুব অসুখী হয়নি। নতুন পরিবেশে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে লাগল তারা। নূরজাহান হামেশা আসে তার মেয়েকে নিয়ে, এরাও যায় তার বাড়ি। বিচ্ছেদের কষ্ট তাদের অনেক পরিমাণে লাঘব হ'ল। কিন্তু লোকমান যে মানসিক ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তা কমল না, তবে তাকে বাড়াবার জন্য নতুন কোন পন্থাও সে এর মধ্যে আবিষ্কার করলে না। তার সঙ্গে দূরত্বটা সকলের এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে।

লোকমানের ব্যবসা ভালো চলছে, আয় বেড়েছে। তবে সে এখন টাকা চিনেছে। কারবারের আয়ে সে হাত দেয় না, জমা রাখে অথবা প্রয়োজন হলে ব্যবসায় লগ্নী করে। সংসার খরচ চালায় নূরজাহানের বাড়িভাড়ার টাকায়। মোটামুটি চলে যায়

তাতে। নূরজাহান চায় আরো কিছু বেশি টাকা খরচ করতে কিন্তু লোকমান রাজি নয়।

রহীম যেদিন কলকাতা ফিরে আসে সেইদিন রাত্রে জাহানআরা তাকে ভয়ে ভয়ে বললে, তুমি কী ভাববে জানি না, কিন্তু একটা লেখা দেখাতে চাই। লেখাটা দিলে তার হাতে।

সে দুর্ভিক্ষ, রিলিফের কাজ এবং মৃত্যুর যে সব ঘটনা দেখেছিল তার কাহিনী আবাদ থেকে ফিরে এসে লিখে রেখেছিল রহীমকে দেখাবে বলে। লিখেছিল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, মনের স্বাভাবিক প্রেরণায়। লেখাটা বড় নয়, স্বচ্ছ সরল দরদভরা ভাষায় রচনা। তাতে আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস নাই। রহীম পড়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল, সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে।

তারপর বললে, লেখাটা কাল কাগজে দিয়ে দোব।

কাগজে দেবে কি ছাপবার জন্যে ? ছাপা চলবে ঐ লেখা ?

এ লেখা যদি ছাপা না চলে তো কী চলবে মনে কর ? ছেপে বেরোলে দেখো কী চমৎকার হয়েছে তোমার এ লেখা।

লেখাটা সত্যিই বেরোল একখানা সাময়িক পত্রে, জাহান-আরার নামে। যেদিন তারা বাসা বদল করেছে সেই দিনই। রহীম কাগজখানার দুটো কপি নিয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরে একখানা কপির লেখার পাতাটা খুলে দিলে জাহানআরাকে। সে তখন তার ঘরেই ছিল। সে ছাপার অক্ষরে তার লেখা ও নাম দেখে চকিত, বিস্মিত ও উফুল্ল হয়ে পড়তে লাগল।

অন্য কপিটা নিয়ে রহীম গেল মরিয়মের কাছে। বললে, মা তোমার মেয়ের কীর্তি দেখেছ ?

সে উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলে, কী করেছে বাবা ? কোন অন্যায় কাজ করেনি তো ?

অন্যায় হয়তো নয়, এই দেখ না, বলে সে হাসিমুখে লেখাটা

বার করে তার সামনে ধরলে। দেখেই মরিয়মের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে, তাই বলছিলি মেয়ের কীর্তি! সত্যি জাহানআরা লিখছে বাবা? কোথা সে, তোদের ঘরে?

বলেই অপেক্ষা না করে চলে গেল লেখাটা নিয়ে জাহান-আরার কাছে। সে তখন পড়ছে। তার মা তার মুখে চুমো খেয়ে বললে, সত্যিই তুই লিখেছিস মা? ছাপাবার মতন লেখা লিখতে পেরেছিস তাহলে!

জাহানআরা মায়ের পায়ে সালাম করে সলজ্জভাবে বললে, মা, তুমি তো এখনো পড়নি নিশ্চয়, পড়ে দেখ কী আছে।

পড়ব তো বটেই, এখুনি পড়ব। আমি পড়ব, তোর আব্বা এলে পড়তে দোব। কাল নূরজাহানকেও দোব।

রহীম এক পাশে বসে লক্ষ্য করছিল মেয়ের সাফল্য দেখে মায়ের এই উচ্ছ্বাস, আর জাহানআরার প্রতি গভীর প্রীতিতে তার মন ভরে উঠছিল।

বাড়ি বদলের কারণে রহীমের মনে দুঃখ হয়নি, কিন্তু সমিতির আফিসে গিয়ে তার সম্বন্ধে একটা নতুন সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে একটু বেদনা বোধ করলে। তাকে বলা হ'ল এর পর তোমার কেবল আবাদ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, জেলার অন্যান্য এলাকায় গিয়েও সংগঠনের কাজে সাহায্য করতে হবে, বাংলাদেশের কোন কোন জেলাতেও মাঝে মাঝে যেতে হবে।

আবাদের সংগঠন সে যেভাবে গড়েছে এবং গড়তে সাহায্য করেছে, যেভাবে তাকে সংযত ও প্রসারিত করেছে, সেখানকার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তা এখন বিশেষভাবে নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই অন্যান্য এলাকায় ও জেলায় এভাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তার অভিজ্ঞতা ও সাহায্য বেকার হবে। বলে মনে হয়েছে। তারই ফলে এই সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তটা শুনে রহীম প্রথমে বেদনা বোধ করলে—যেন তাকে

তার এলাকা থেকে সরিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। আরো আলোচনা করে জানতে পারলে উদ্দেশ্য মোটেই তা নয়। তার এলাকায় সে যাবে মাঝে মাঝে, তবে সমস্ত সময় কেবল সেখানেই কাটাবে না, অন্যান্য জেলাতেও সময় দিতে হবে। তার নিজের শিক্ষার দিক থেকেও তার প্রয়োজন আছে ; কৃষক জীবনের ও কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ ও সমস্যা এবং বিভিন্ন ধরন তাকে দেখতে ও বুঝতে হবে বিভিন্ন এলাকায় ও জেলায় গিয়ে। তাহলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের কৃষক সমস্যা আর কৃষকদের আন্দোলন ও সংগঠনের সমস্যা সম্বন্ধে তার ধারণা ও চিন্তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তখন সে বুঝতে পারলে এ সিদ্ধান্ত তার পক্ষে ভালোই হবে, কল্যাণকর হবে। কিন্তু আবাদের চিন্তা তার মনকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারলে না, চাইলেও না। ভাবতে লাগল এই সব মানুষের কথা কি ভোলা যায়? লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে এই আবাদে, কিন্তু কত অসহায়, কত অচেতন ছিল তারা। অথচ কত সহজে, কত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল সাড়া জেগে উঠল। এই সাড়া জাগাতে সে তাদের সাহায্য করেছে। আজ সে তাদের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তারাও তাকে কত আপন মনে করছে। কাজের তাগিদে যেখানেই যেতে হ'ক, এদের সঙ্গে একটা স্থায়ী সংযোগ তার থাকবেই। সে সংযোগ রেখেই তার মন শান্তি পাবে।

ছাব্বিশ

প্রায় আড়াই বছর পরে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত বাংলার কৃষক সমাজ ধীরে ধীরে সামলে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য রুখে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত হটে গেছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ফসলটা সেবার ভালো হয়েছিল বলে তবু অনেকে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ শেষ হতে না হতেই যখন দেখা দিলে মহামারী—ম্যালেরিয়া, পেটের অসুখ, কলেরা ইত্যাদি, দুর্ভিক্ষের পীড়ন সহ্য করে ক্ষীণ জীবনী শক্তি নিয়ে তখনো যারা বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে থেকে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ পারলে না টিকে থাকতে, দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে বিদায় নিলে চির-কালের জন্য।

আবাদ এলাকায় এই আঘাত সবচেয়ে বেশি জোরে এল খেত-মজুর আর গরিব চাষীদের উপর। তারাই ভুগল বেশি, মরলও বেশি তারাই। জোর আঘাত সুন্দরবনের সারা আবাদ অঞ্চলেই এসেছিল, কিন্তু মধুখালি, সোনাপুর, মোহনগঞ্জ ইত্যাদি মিলিয়ে কৃষক সমিতির যে সংগঠিত আবাদ এলাকা, তাকে বেশি ঘায়েল করতে পারেনি। মানুষ এখানেও মরেছে; কিছু অনাহারে, কিছু মহামারীর কবলে পড়ে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, সমিতির চেষ্টায় রিলিফের অনেকটা সুব্যবস্থা হয়েছিল বলে বহু দুঃস্থ মানুষ প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

এই আড়াই বছরের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলের পটভূমিকায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাংলাদেশের সমাজকে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে; তার অর্থনীতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে বিকলাংগ ও তার ঐতিহ্য থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্যুত করেছে, লোভ আর প্রতারণার

স্বার্থপর মনোভাব তীব্রতর হয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতাকে গভীরতর করে তুলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে হিটলারী ফাসিষ্টদের ফাশিবাদী বর্বরতার পরাজয়ে এবং সোবিয়েত সমাজবাদী নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ে। এই বিজয় সারা দুনিয়ার মানুষের মনে এনে দিয়েছে নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা, নতুন আগ্রহ ও উৎসাহ; গভীরতর করেছে তাদের শোষণমুক্তির কামনাকে, তীব্রতর করেছে জাতীয় স্বাধীনতার আকাংক্ষাকে।

এই চিন্তা, চেতনা ও আকাংক্ষা ভারতের মানুষের, বাংলার মানুষের মনেও সাড়া জাগিয়েছে। তার প্রভাব বাংলার কৃষকের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জোতদার-মহাজনদের শোষণ-পীড়ন ও লোভের জঘন্য প্রবৃত্তি গত কয়েক বছরে কত তীব্র হয়েছে, যুদ্ধের সময়ে এবং বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময়ে তার উৎকট পরিচয় কৃষকরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ তাই দানা বেঁধে সক্রিয় হয়ে উঠতে বিলম্ব হয়নি বেশি।

ভূমি রাজস্ব কমিশন সুপারিশ করেছিল ভাগচাষ প্রথা তুলে দিতে এবং যতদিন তোলা না হয় ততদিন মালিককে ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে তিনভাগের একভাগ দিতে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবির সঙ্গে এই তেভাগার দাবির প্রচারও বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে হয়েছে ব্যাপকভাবে। এখন ভাগচাষীদের মধ্যে তেভাগা দাবির শুধু চেতনাই নয়, এই দাবি আদায়ের আগ্রহে চাঞ্চল্যও জাগতে লাগল ধীরে ধীরে।

রহীম এতদিন তার আবাদ এলাকায় পূর্বের মতো বেশি সময় দিতে পারেনি। তার অধিকাংশ সময় কেটেছে অন্যান্য জেলার কাজে। আবাদেও এসেছে কিন্তু সময় দিতে পেরেছে কম।

জাহানআরা কাজ করে কলকাতায়। প্রধানত তাকে করতে

হয় মেয়েদের বৈঠকে রাজনীতিক আলোচনা—বস্তী এলাকায় বেশি, মধ্যবিত্ত এলাকাতেও নিতান্ত কম নয়। সে নারী সমিতির কাজ করে, এবং রহীমের পার্টি এখন তারও পার্টি। কলকাতার বাইরেও সে গেছে তার সমিতির কাজে, আবাদে গিয়েও মেয়েদের বৈঠক করেছে, কিন্তু বেশি নয়।

তাদের পারিবারিক জীবন চলছে আগের মতোই—তার পার্টি-দরদী রাজনীতির টানে ততটা নয় যতটা তার ও রহীমের ব্যক্তিগত টানে। তাহলেও এই রাজনীতিকে পরিবারের সকলে মোটামুটি সমর্থন করে। মরিয়মের মধ্যে এই রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা ও চেতনা আছে, তবে সক্রিয়ভাবে কোন কাজে সে যোগ দেয় না। আর হাতেম এ বিষয়ে উদাসীন, জানবার আগ্রহ তার বিশেষ নাই। তার মেয়ে যে কাজ করে সেজন্য তাব দুঃখ নাই বরং মনে মনে একটু গর্বই অনুভব করে। কাগজেপত্রে তার বা রহীমের লেখা বেরিয়েছে দেখলে খুব আনন্দ পায়, আগ্রহ করে পড়েও।

তাদের কাজের সমর্থন ছাড়া তার মা-বাপের দরদ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে যখন তারা তাদের পার্টির বা সমিতির কাজে অথবা রিলিফের প্রয়োজনে তাদের কাছে হাত পেতেছে। চাঁদা তারা ভালোই দিয়েছে, দিতে কুণ্ঠিত হয়নি কখনো।

মরিয়মের জীবনে এখন প্রধান আকর্ষণ নান্নু, জাহানআরার মাস ছয়েকের শিশুপুত্র! সুস্থ সুন্দর সজীব শিশু। মুখে তার হাসি, চোখে চঞ্চলতা। সে এখন মরিয়মের চোখের মনি, কলিজার টুকরা। তাকে পেয়ে সে এখন নিজের জীবনকে কেবল সার্থকই মনে করে না, ধন্যও মনে করে। নূরজাহানের মেয়ে টুনিকে সে আগের মতোই ভালোবাসে, স্নেহ করে। কিন্তু নান্নু যেভাবে তার হৃদয় জুড়ে বসে আছে, টুনি তা পারে না। নান্নু থাকে তার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা, রাত্রেও শোয়। কিন্তু টুনি থাকে দূরে, যদিও দিনের বেলায় অনেকটা সময় সেও থাকে এই বাড়িতে নান্নুর সঙ্গে।

ছেলের কারণে জাহানআরার কাজের কোন অসুবিধা হয় না। একটানা দুদিন মাকে ছেড়ে নানীর কাছে সে থেকেছে যখন জাহান-আরা একটা সম্মেলনে যোগ দিতে বাইরে গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে মায়ের অভাব বেশি বোধ করেনি। রহীমকে পেয়ে মরিয়মের পুত্র কামনা পূরণ হয়েছিল! নান্নু এখন সে কামনাকে আর এক রূপ দিয়ে কানায় কানায় ভরে তুলেছে। সে ভাবে নান্নুকে সে পেয়েছে একান্ত আপন করে। জাহানআরা ও রহীমের ছেলের সঙ্গে তার কখনো বিচ্ছেদ হতে পারে এমন চিন্তা তার মনের কোণেও কখনো জাগেনি।

রহীম ছেলেকে ফুরসত মাফিক মাঝে মাঝে বাইরে নিয়ে যায়। ছেলেরও তার প্রতি যথেষ্ট টান। কিন্তু সে নানার ভক্ত বেশি। হাতেম সময় পেলেই নাতিকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়।

শিশুর নামটা মরিয়মের দেওয়া। সবাই সেটা মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে রহীমও, নামটার তাৎপর্য না বুঝেই। এর মধ্যে কয়েকদিন বাইরে থাকার পর কলকাতায় ফিরে একদিন রহীম বললে, মা, বলতো নান্নু যখন কথা বলতে শিখবে, তোমাকে নানী বলবে, না দাদী বলবে?

রহীম এ প্রশ্ন সরল মনেই করেছে ভেবে মরিয়ম পড়ে গেল মুশকিলে। কী জবাব দেবে? সে তো কেবল জাহানআরারই মা নয়, রহীমেরও যে মা। তাদের এই সম্পর্ক নিয়ে রহীমের মনে যেমন তেমনি তারও মনে কোন খিচ নেই, ভেজাল নেই। এ তার অন্তরের কথা। জাহানআরাও জানে, জানে হাতেমও। তা ছাড়া নূরজাহানের মেয়ে তাকে নানী ব'লে কিন্তু দাদী বলবার তার নাই কেউ। রহীমের ছেলে দাদী বললে খুশীই হ'ত কিন্তু জাহান-আরার ছেলে নানী না বললে মন হয়তো তার তৃপ্তি পেত না।

তবু হয়তো মরিয়ম চেষ্টা করত জাহানআরার সঙ্গে একটা রফা করতে যদি না ভাবত নূরজাহান এবং বিশেষ করে লোকমান এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করবে। রোস্তমদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের চোখেও এটা অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হবে।

সে প্রথমে জবাব না দিয়ে শুধু হাসতে লাগল। জাহানআরা আগেই বুঝেছিল তার ছেলের নামের পিছনে তার মায়ের চিন্তা কী ছিল। সে রহীমকে বললে, তুমি যতই যা বল, তোমার দাবির ফয়সালা মায়ের মনে অনেক আগেই হয়ে গেছে। মা যে ওর নাম দিয়েছেন নানু, সে তো ওর নানী হবার ইচ্ছেতেই, দাদী হবার ইচ্ছে থেকে নয় নিশ্চয়। এ নাম তুমিও মেনে নিয়েছ।

রহীম বুঝলে তার ছেলের নামের ব্যাখ্যাটা ঠিকই দিয়েছে জাহানআরা। বললে, বুঝলাম মা, তুমি ওর যেমন মা তেমন ভাবে আমার মা হতে চাও না। তার মানে আমাকে ওর মতো ভালোবাস না। কৃত্রিমভাবে মুখ গম্ভীর করে রইল সে।

না ব্যাটা, তুই খামকা ছেলেমানুষের মতন কথা বলছিস, বললে মরিয়ম। তোকে আমি একটুও কম ভালোবাসি না। আমার চোখে তোরা দুজনেই সমান। তবু আমাকে নানুর নানীই হতে হবে। সে তার সপক্ষে যুক্তি দেখালে লোকমান ও আত্মীয়ের প্রশ্ন তুলে।

রহীম হাসলে। বললে, হ্যাঁ মা, কবে তোমাকে বলছি আমি বুড়োমানুষ? তা যাই হ'ক, খোকা তোমায় নানী বলবে কি দাদী বলবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নাই। আমি শুধু একটু মজা দেখতে চেয়েছিলাম তোমাকে বেকায়দায় ফেলে। তোমরা কেউ তা বোঝনি।

জাহানআরা হেসে বললে, দেখছ মা, তুমি খামকাই বিব্রত বোধ করছিলে। এখন বুঝতে পারছ তো সবাইয়ের সব কথা বিশ্বাস করতে নাই।

নূরজাহানের আর একটি মেয়ে হয়েছে। সে জাহানআরার ছেলের চেয়ে মাস দুয়েকের বড়। এবারেও মেয়ে হয়েছে বলে নূরজাহানের মনে অবশ্য একটু দুঃখ ছিল। লোকমানের কিন্তু দুঃখ নয়, রাগই হয়েছিল—কার উপর সে নিজেও জানত না। পরে যখন নানুর জন্ম হ'ল তখন সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

অকারণে নূরজাহানের সঙ্গে খিটিমিটি করতে লাগল, যেন সে ইচ্ছে করেই দুটো মেয়ের মা হয়েছে। তার রাগটা ক্রমশঃ রহীমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে পরিণত হ'ল। জাহানআরাকে ও তার ছেলেকে দেখতে হাসপাতালে তো গেলই না, তখন থেকে এ বাড়ি আসাও প্রায় বন্ধ করে দিলে। নান্নু এখানে আছে বলে যেন এই বাড়ির সঙ্গে তাকে অসহযোগ করতে হবে।

জাহানআরা প্রথমে সে কথা বোঝেনি। লোকমানের এই মনোভাব সম্বন্ধে তার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। সম্প্রতি নূর-জাহানই তাকে জানিয়েছে, কথা প্রসঙ্গে বলে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, কেঁদেও ফেলেছে। জাহানআরা লোকমানের এই নীচতার পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হয়েছে, নূরজাহানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তার জন্যে তুই কাঁদছিস কেন বুবু? লোকমানভাই যাই মনে করুক, তুই ভেবে কী করবি? তোর বাচ্চারা বেঁচে থাকুক। পরের বারে মেয়ে না হয়ে তোর ছেলেই হবে।

লোকমান এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। এর পর যাতে নূরজাহান আর মেয়ের মা না হয়ে ছেলের মা হতে পারে সেজন্য এক পীরের দরগায় গিয়ে মানত করেছে, একজন খোন্দকারকে বাসায় এনে তাবিজ ও পানি পড়ার ব্যবস্থা করেছে। নূরজাহান তার হাতে বাঁধা মাদুলী দেখিয়ে জাহানআরাকে বললে, মাকে আব্বাকে বলিসনে একথা, তোকেই বলছি। তাবিজের জোরে মেয়ের বদলে ছেলে হবে আমি বিশ্বাস করি না, যদি হয় তো এমনিই হবে। কিন্তু আপত্তি করতেও পারলাম না।

বড় দুঃখেই কথাগুলো নূরজাহান বলেছে তার বোনকে। জাহানআরাও তেমনি ব্যথিতভাবে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। তার নিজের সান্ত্বনা হ'ল এই যে নূরজাহান লোকমানের কুসংস্কারকে মেনে নিতে পারেনি, এই ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রহীমের শিক্ষা ও শ্লেষ সে ভুলে যায়নি।

জাহানআরা রহীমকে সবই বললে। সে লোকমানের এই নীচ নোংরা মনের পরিচয় পেয়ে দুঃখিত হ'ল কিন্তু তার বেশি বেদনা বোধ করলে নূরজাহানের জন্যে। সে বুঝলো লোকমান তার নৈতিক জীবন থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছে, নূরজাহানকেও টানছে। জাহান-আরাকে হুশিয়ার করে দিলে সে, তোমার ছেলে সম্বন্ধে লোক-মানের এই মনোভাব যেন তোমার মনে কোন রকম দুর্বলতা এনে না দেয়। নূরজাহানের মেয়েরা লোকমানেরও মেয়ে। লোকমানের মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় যেন তাদের প্রতি তোমার মনে কোন সময়ে একটুও বিরূপ ভাব না জাগে। বরং নূরজাহানের এই মানসিক সংকটের সময় তার আর তার বাচ্চাদের প্রতি ব্যবহারে তোমার এবং আমার আগের মতোই অথবা আরো বেশি হৃদ্যতা থাকা দরকার।

হুশিয়ারি দিয়ে ভালোই করেছ, বললে জাহানআরা। এ রকম অবস্থায় দুর্বলতা আসা অস্বাভাবিক নয়, তবে আমিও বুঝেছি তোমার মতোই। বুবুর জন্যে সত্যি আমার কষ্ট হয়। আর শিশুরা শিশুই। আমার বাচ্চা আর বুবুর বাচ্চাদের মধ্যে তফাত মনে করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের অবস্থা এবং ভাগচাষীদের মনোভাব বিবেচনা করে প্রাদেশিক কেন্দ্রে স্থির হয়েছে তেভাগার দাবিতে আন্দোলন করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি শুরু হ'ল।

আবাদ এলাকায় অনেকদিন যেতে পারেনি রহীম। তাকে এই এলাকা থেকে সরিয়ে নেবার পর রমেশ ছাড়া জেলা কেন্দ্র থেকে বিমলকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে স্থায়ীভাবে কাজ করবার জন্য। রহীম তাদের দুজনের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে জানতে পারলে কৃষকরা তেভাগা আন্দোলন চায়।

দুজনকে এক সঙ্গে না পেয়ে সে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল একে একে। তাতে এটা প্রকাশ পায় যে এলাকায় পার্টি ও সমিতির

কাজের ধারা সম্বন্ধে রমেশ ও বিমলের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে। রমেশ বলে বিমল কেবল জনসভা ডেকে প্রচার আন্দোলনই করতে চায়, সংগঠনের কথা নিয়ে বিশেষ চিন্তাই করে না। যে সমস্ত নতুন জায়গায় সে সমিতির প্রচার চালিয়েছে সেখানে সংগঠন প্রায় কিছুই গড়েনি, নতুন কর্মী বা পার্টি ইউনিট তোয়ের করেনি, সমিতির মেম্বর সংগ্রহের কাজও খুব সামান্যই করেছে। কেবল যেখানে সেখানে জনসভা ডাকিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে, সভাগুলোর জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুতিরও প্রয়োজন বোধ করেনি।

সে আরো বলে যে যখনি কোন স্থানীয় লোক এসে বিমলকে তাদের এলাকায় গিয়ে জনসভা করতে ডেকেছে, সে সানন্দে চলে গেছে, সেখানকার অবস্থা বা লোকের মনোভাব বোঝবার চেষ্টা করেনি। পরে সেখানে সংগঠনও করেনি, সংগঠিত এলাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থাও করেনি। এই ত্রুটির কথা বলা হলে সে জবাব দিয়েছে, দরকার পড়লে ও সব ঠিক হয়ে যাবে কমরেড, এখন অত ভাবছেন কেন? ও ব্যাপারে ইউনিটগুলোর সঙ্গে সে আলোচনা করারও প্রয়োজন দেখে না।

বিমলের সঙ্গে পরে আলাপ করে রহীম তার বক্তব্য শুনলে। সে স্বীকার করলে সংগঠনের উপর জোর সে কম দিয়েছে। রহীম তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে তার কাজের মধ্যে গলদ কোথায় এবং বড় রকম আন্দোলন করতে হলে এই গলদের ফলে ক্ষতি কী হতে পারে।

রহীম তাকে বললে যে জোতদার-মহাজনরা শোষক শ্রেণী হিসাবে খুব শক্তিশালী। তাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন তাদের স্বার্থে যে আঘাত দেবে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সরকারের শ্রেণী স্বার্থ হবে সেই আঘাত থেকে তাদের রক্ষা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে আন্দোলনকে বরবাদ করবার জন্য কৃষকদের উপর দমন ব্যবস্থা চালানো। এই দমন ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করে আন্দোলনকে সফল করতে হলে কৃষকদের মধ্যে যেমন রাজনীতিক

চেতনা জাগানো দরকার, তেমনি দরকার আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য সংগঠন তৈরি করা। এই বিষয় নিয়ে অনেক বিতর্ক ও আলোচনার পর শেষে বিমল স্বীকার করলে যে তার কাজের ধারা ভুল পথে গেছে।

রহীম তাকে নিয়ে আবাদে চলে গেল। রমেশ আগেই এসেছিল। বিমলকে কয়েকদিন সঙ্গে রেখে রহীম এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে স্থানীয় ইউনিট ও কমিটিগুলির সঙ্গে আন্দোলনের বিষয় আলোচনা করলে, তার রাজনীতি ব্যাখ্যা করে সেজন্য কী ধরনের সংগঠন প্রয়োজন তাও আলোচনা করলে। এই ধারায় কাজ করবার জন্য তখন বিমল চলে গেল।

সমগ্র এলাকা সফর করে এইভাবে রহীম কর্মীদের সঙ্গে যথেষ্ট সময় দিয়ে আলাপ আলোচনা করলে এবং কর্মীরা নিজ নিজ ইউনিট ও কমিটির নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় রাজনীতিক তালিম দেবার ও সংগঠনকে মজবুত করবার কাজ চালাতে লাগল। অবশ্য অনেক জায়গায় কাজটা মোটামুটি এইভাবে শুরুও হয়েছিল।

এবার বিশেষভাবে একটা নতুন ব্যবস্থার উপর সে জোর দিলে। পূর্বে সে মেয়েদের বৈঠক অল্প কয়েকটা করেছিল। এবার তেমনি বৈঠক করে দেখলে তেভাগাদাবির আন্দোলন সম্বন্ধে গরিব চাষীদের মতো তাদের মেয়েদেরও আগ্রহ প্রবল। তখন কমরেডদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে স্থির করা হ'ল মেয়েদেরও সংগঠিত করতে হবে। সাধারণভাবে সমিতিতে যোগ অবশ্য দেবে তারা, কিন্তু পৃথকভাবে মেয়েদের কিছু কিছু তালিম দিয়ে কী ধরনের কাজ তারা করতে পারে, তা স্থির করে তাদের দংগল তোয়ের করতে হবে সর্বত্র।

এই সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও খেতমজুর মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। সামাজিক বাধার প্রশ্ন তাদের সামনে এখন আর বড় হয়ে দেখা দিলে না। আরো অদ্ভুত বোধ হ'ল এই যে পুরুষরা তাদের মেয়েদের আন্দোলনে নামার বিরোধী নয়, বরং সমর্থক। তারাও চায় মেয়ে পুরুষ সমস্ত কৃষকই

আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাকে জোরদার করুক। তারাও বোঝে এই উপায়েই শোষক শ্রেণীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ সম্ভব।

মেয়েদের বৈঠক এবং তালিম দেওয়ার কাজ যখন সমস্ত কেন্দ্রে আরম্ভ করা হ'ল তখন দেখা গেল এক নতুন জোয়ার এসে গেছে তাদের মধ্যে। তারা যে ঘর-সংসারের কাজ ছাড়া কৃষকদের দাবির আন্দোলনে সাহায্য করবার যোগ্য, এই চেতনা তাদের মধ্যে নতুন মর্যাদা বোধ এনে দিলে। মেয়েদের থেকে বৈঠকের তাগিদ আসতে লাগল। যারা আন্দোলন সম্বন্ধে এখনো প্রায় কিছুই জানে না, কেবল শুনেছে তেভাগা দাবির আন্দোলন হবে, তারা বিষয়টা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল।

তাদের তালিম ও বৈঠকের সময় অবশ্য সংক্ষিপ্তই হ'ল। কিন্তু তাতেই তারা সন্তুষ্ট। যেটুকু শুনেছে আর বুঝেছে তারা, তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাদের স্বার্থে একটা বড় রকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং তাতে তাদেরও দায়িত্ব আছে, এই চেতনাই মেয়েদের ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুললে।

মেনকা, সীতা, উমা ও যমুনার মতো কতকগুলি মেয়েকে রহীম বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে, সেজন্য যথেষ্ট সময় দিলে সে। বড় বড় জমির মালিক ও লাটদারদের গুণ্ডাবাহিনীর হামলা সম্বন্ধে হুশিয়ারি দিলে। সরকারী দমন ব্যবস্থার ফলে কী ঘটতে পারে এবং সেজন্য প্রতিরোধের উপায় কী হতে পারে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে তাদের সচেতন করবার চেষ্টা করলে। আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের কত রকম বিপদ ঘটতে পারে এবং সেজন্য কতখানি ঝুঁকি নিতে পারে তারা, সে আলোচনাও করলে। তাদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগাতে চেষ্টা করলে।

সংগঠিত এলাকার বাইরেও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করা হ'ল কিন্তু সংগঠিত এলাকাকে আরো মজবুত বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাবার জন্য বেশি জোর দেওয়া হ'ল।

ক্রমে বৈঠকী প্রচারের পর কর্মীদের সাহায্যে জনসভা ডাকা হতে লাগল। মুখে মুখে এ পর্যন্ত যতটুকু প্রচার হয়েছিল তারই ফলে দেখা গেল সভাগুলি আশাতীতভাবে বড় বড় জমায়েতে পরিণত হয়েছে। তেভাগার দাবি সর্বত্র গরিবদের মনে অপূর্ব সাড়া ও চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে লাগল। অমনি জোতদার-মহাজনরা আতংকিত হয়ে উঠল। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল আবাদ এলাকায় পুলিসের গুপ্তচরদের আমদানী হয়েছে, তারা এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের সাবধান করে দেওয়ার ফলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও বিশেষ আমল দিচ্ছে না।

সাতাশ

চাষের মরসুম শেষ হয়ে গেছে। বর্ষাও শেষ হয়েছে। মাঠের কাজের মধ্যে নিড়ানি চলছে।

গ্রামের গরিবদের মধ্যে অনেকেরই ঘরে খাদ্যের অভাব। রাত্রে মাছ ধরার কাজ চলে, দিনেও চলে।

মাঠের মধ্যে জলকাদা এখনো প্রচুর। জলের মধ্যে জোঁক অজস্র। সাপের ভয়ও আছে। খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। লাঠির সাহায্য ছাড়া এঁটেল কাদায় বেশি দূর হাঁটতে গেলে পদে পদে পিছলে পড়ার আশংকা। তবে বৃষ্টি প্রায় বন্ধ হয়েছে, ছাতা না নিলেও চলে। রোদ পেয়ে মাটিও আস্তে আস্তে শুঁকোচ্ছে।

রহীম এলাকায় ফিরে এসেছে। নীলু প্রায়ই থাকে তার সঙ্গে। আর এক চক্র মেয়েদের বৈঠক করতে হবে এখন। তার আগে বা পরে পুরুষ কমরেডদের নিয়েও বৈঠক করা হবে। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে আরম্ভ করলে। সঙ্গে জিনিস রাখে না বেশি। সর্বনিম্ন প্রয়োজন হ'ল লাঠি, একটা চূণেরডিবে জোঁক ধরলে ছাড়াবার জন্য, টর্চ বাতি, আর কাপড় গামছা। তাছাড়া কিছু কাগজ আর কালি-ভরা কলম এবং চাকুছুরি। এগুলো না নিয়ে বেরোয় না। কুইনিনের বড়ি সমেত সামান্য কিছু ওষুধও-সে রাখে।

শীঘ্রি প্রচার অভিযান শুরু করতে হবে। আসবার পূর্বে কলকাতায় ইস্তাহার লিখে দিয়ে এসেছিল রহীম, ছাপিয়ে বিমল নিয়ে এল। সারা এলাকায় এবং তার বাইরেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল এই ইস্তাহার। তাতে আন্দোলন সম্বন্ধে মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে এবং কৃষক ও খেতমজুরদের কর্তব্য নির্ধারণ করে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদানের জন্য জোরালো আবেদন আছে। বিভিন্ন দাবির মধ্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যেগুলির উপর তা হ'ল গরিব চাষী ও খেত-মজুরদের জন্য বিনামূল্যে জমি চাই, ভাগচাষ

প্রথা বন্ধ করা চাই, এবং যতদিন তা বন্ধ করা না হয় ততদিন তেভাগা চাই।

এই দাবিগুলির প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হ'ল খেতমজুর, গরিব রাইয়ত-চাষী এবং ভাগচাষী। জমিদারী-লাটদারী-মহাজনী প্রথার উচ্ছেদের দাবিও আছে। সেই সঙ্গে জমির খাজনার হার কমাবার দাবিও রাখা হয়েছে। তাতে মাঝারিও বড় চাষীদেরও আন্দোলনকে সমর্থন করবার কথা। এই সমস্ত দাবির মধ্যে দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সকলের চেতনার মধ্যে আশু কার্যকর দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে তেভাগার দাবি। ইস্তাহার বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সকলের মুখে এক দাবি—তেভাগা চাই।

অভিযান আরম্ভ হ'ল। হাটে হাটে জনসভা, গ্রামে গ্রামে পুরুষদের মিছিল, পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের স্কোয়াড চলতে লাগল। সকলেরই ঐ এক দাবি—তেভাগা চাই। সমিতির লাল পতাকায় এলাকা ছেয়ে গেল। ছোট ছেলেপিলেরাও ঝাণ্ডা নিয়ে স্লোগান দিয়ে গ্রামে গ্রামে মিছিল চালাতে লাগল। মিছিল দেখে, স্লোগান শুনে অসংখ্য মেহনতকারী মানুষের মনে বিদ্যুতের চমক লাগল।

বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজের আস্তরণ ঢেকে রেখেছে ধরণীর বুক। ধানগাছগুলি এখনো ফুলোয়নি, থোড় দেখা দিচ্ছে মাত্র। ফুলোবে, দানা বাঁধবে, পাকবে, হলদে হয়ে গাছ ফলভারে শুয়ে পড়বে, ধান কেটে খামারে তোলা হবে, ঝাড়ামাড়া করে ফসল ভাগ করা হবে—তখন আদায় করা হবে তেভাগার দাবি। তার পূর্বে চলতে থাকবে প্রচার অভিযান, আন্দোলন, সংগঠন।

ধান কাটার পর ভাগ জমির ধান তোলা হবে জোতদারের খামারে নয়, গ্রামের মধ্যে কোন সাধারণ জায়গায় অথবা তার অভাবে ভাগ চাষের জমিতেই, এই হ'ল সমিতির নির্দেশ। ধান কাটার সময় থেকে বিশেষভাবে এই নির্দেশ প্রচার করতে লাগল মেয়েদের স্কোয়াড এবং ছেলেদের মিছিল। পুরুষরা এবং মেয়েরাও অনেকে তখন খেতখামারের কাজে ব্যস্ত।

দেখা গেল জোতদারের খামারে ধান উঠছে খুব কম। মকবুল গোলদারের খামারের অবস্থাও তাই। গায়েনদের মতো বড় জোত-দারের খামার প্রায় খালি। বিস্তর খামার হয়ে গেছে ধানকাটা জমিতে। সমিতির ডাকে যে ভাগচাষীরা এমনভাবে সাড়া দেবে তা জোতদাররা ধারণা করতে পারেনি। এখন অবস্থা দেখে তারা বিষম দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। ছোট জোতদাররা দেখলে এখন আর চাষীদের দাবি না মেনে উপায় নাই। তারা অনেকে তেভাগার হিসাবে ভাগ নিতেও লাগল, পাছে পরে কিছুই না পায়। তারা শুনেছে ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশের জোর তাদের পক্ষে নয়, ভাগচাষীদেরই পক্ষে।

কিন্তু বড় বড় জোতদাররা যতই ঘাবড়ে যাক, কৃষকদের আন্দো-লনের সামনে সহজে মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়। তারা ভাবলে এতে যে শুধু তাদের আর্থিক লোকসান হবে তাই নয়, শ্রেণী হিসাবে ইজ্জতহানিও হবে, ভবিষ্যতের জন্যও কৃষকরা আস্কারা পেয়ে যাবে। অথচ কৃষকদের প্রবল সংগঠিত শক্তির মোকাবিলা করবার মতো লোকবল তাদের নাই। ছোটখাটো দাঙ্গার ব্যাপার নয় যে টাকা দিয়ে কিছু গুণ্ডা-লাঠিয়াল লাগিয়ে প্রতিপক্ষকে হঠিয়ে দেবে। অনেক বড় বড় জোতদার সলাপরামর্শ করে স্থির করলে এই আন্দো-লন দমন করবার জন্য সরকারী সাহায্য বিনা তাদের আর গতি নাই। তারা সরকারের দ্বারস্থ হ'ল।

ইতিমধ্যে পুলিসের গুপ্তচর মারফত জেলা ও মহকুমার শাসন-কর্তাদের নিকট খবর পৌঁছে গেছে যে আবাদ অঞ্চল আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে এবং জোতদারদের স্বার্থ জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এখন সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে।

ইংরেজ-রাজের শাসন ব্যবস্থাই নিজের সামাজিক সমর্থনের জন্য বাংলাদেশে জমিদারী প্রথার জন্ম দিয়েছিল। লাটদারী প্রথাও তারই সৃষ্টি। তারই পক্ষপুটে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে গড়ে উঠেছে এবং

বজায় থেকেছে বর্তমান সামন্তবাদী জোতদারী শোষণ। সুতরাং সামন্তবাদের দোসর ও রক্ষক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা যদি এখন গরিব ভাগচাষী ও অন্যান্য কৃষকদের শোষণ-বিরোধী শক্তিকে ভাঙবার ও জোতদারী শোষণের হেপাজত করবার জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে তার পক্ষে অধর্ম করা হবে।

জোতদাররা ধর্না দেবার পূর্বেই সরকারী কর্তৃপক্ষ ও পুলিস আন্দোলন দমনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এখন আর কাল বিলম্ব না করে দলে দলে পুলিস আসতে লাগল, বড় বড় জোতদার-লাটদার-দের বাড়িতে আর কাছারিতে আড্ডা গাড়তে লাগল। তাদের ভুরি ভোজনের আয়োজনে সে সব বাড়ি তৎপর হয়ে উঠল। পুলিসের শুভাগমনে এলাকা সরগরম হ'ল। সরকার ভেবেছিল এলাকায় পুলিসের উপস্থিতিতেই কাজ হবে। তা কিন্তু হচ্ছে না। কৃষকরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে—ধান ঝাড়ামাড়ার কাজ, ধান ভাগ করে তেভাগার দাবি আদায় করার কাজ। তারা কোন আইন ভঙ্গ করে না, আইন সংগত চুক্তি ভঙ্গও করে না, কোথাও কোন রকম শান্তি-ভঙ্গ বা অশান্তি সৃষ্টিও করেনা, শুধু ভাগ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রথার আংশিক বিরোধিতা করে। মেয়েদের স্কোয়াড বা ছেলেদের দংগল যে প্রচারের কাজ করছে সেও কোন বেআইনী কাজ নয়।

পুলিস এসেই কোন রকম তাণ্ডব আরম্ভ করলে না। কেবল দিনের বেলা গ্রামের মধ্যে দু একবার করে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। মনে হ'ল এই বুঝি সরকারী নির্দেশ।

জোতদাররা ভাবত এতকাল যে গ্রামের চাষীগুলো সব ভেড়ার পাল; তাদের মধ্যে থেকে মেড়া দেখে একটাকে কান ধরে তুলে চালিয়ে দিলেই সমস্ত ভেড়া তার পিছন পিছন আপনা থেকেই চলতে থাকবে। কিন্তু ভেড়ার ল্যাজেও যে হুল আছে তা যখন টের পেলে তারা তখন তার মোকাবিলার জন্য নিয়ে এল পুলিস।

তারা ভেবেছিল পুলিসের দাপট দেখেই 'ভেড়ার পাল' ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। তাও যদি না হয় তো পুলিসের মার খেয়ে ঘায়েল হয়ে

যাবে। কিন্তু এমন খাবার আয়োজন, এত তোয়াজ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে পুলিস তাদের দাপটও দেখায় না, চাষীগুলোকে মারও দেয় না। বোড়া সাপ ভেবে যাদের এত খাতির করছে তারা যে ঢোঁড়া সাপ হয়ে নিজের গর্তেই বসে থাকবে, তা দেখে জোতদাররা মনমরা হতে লাগল। ওদিকে শয়তান ভাগচাষীরা যে সর্বনাশা তেভাগা দাবি আদায়ের কাজ হাসিল করে যাচ্ছে!

সাধারণ পুলিস দিনের বেলা মাঝে মাঝে সবুট পদে দল বেঁধে টহল দিয়ে গ্রামের ধুলোভরা রাস্তায় প্রচুর পদরজ উড়িয়ে মেঘ সৃষ্টি করে দেয় বটে, কিন্তু রাত্রে বেরোয় না। তবে তাদের অনেকেই অন্য মতলবে একা একা সন্ধ্যার দিকে বেরোনোই পছন্দ করে। এই সময়ে যখন আধো-অন্ধকারে গ্রামের বৌ-ঝিরা মাঠে ঘাটে যায় তখন সেই সুযোগে তারা তাদের দিকে নজর দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, লোকালয়ের কাছে মাঠের বা পুকুরের পাশে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারে।

পুলিসের ক্ষুদে কর্তাদের এই নেপথ্যচারী আকাংক্ষা সম্বন্ধে জোতদাররা যে নিতান্ত অচেতন হয়ে বসে থাকে বা নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করে তা নয়। জোতদারদের তরফে ক্যাম্পের কর্তাদের আনন্দ বিধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু 'ছোটলোক চাষাদের' মতো তাদের মেয়েছেলেগুলোও বড় নচ্ছার, বেয়াড়া, কথা শুনতে চায় না, টাকার লোভ দেখালেও সাড়া দেয় না। সাড়া দেওয়া চুলোয় যাক, উলটো বিপত্তিও ঘটায়।

পুলিস ক্যাম্পের গ্রাম বোয়ালখালিতে জোতদার বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে মাঠের ধারে যে পাড়াটা তার এক পাশে মল্লিকার ঘর। ঘরের এক দিকের দেওয়ালের বাইরে ছোট চালার মধ্যে তার গোটা দুই বাছুর আর কয়েকটা ছাগল থাকে। ঘরখানার দু দিকে দাওয়া তার একটা দিক ঘেরা রান্নার জন্য। মেয়েটি বিধবা, বয়স চল্লিশের নিচেই, কিন্তু দেহের মজবুত কাঠামো ও বাঁধন দেখে ত্রিশের

বেশি মনে হয় না। তার একমাত্র পুত্র পাশের গ্রামে এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি মাহিন্দার। সেখানেই থাকে, মাঝে মাঝে মাকে দেখে যায়, কদাচিৎ মর্জি হলে ছুচার টাকা দেয়ও।

মল্লিকা মুখরা মেয়ে। কেউ এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দেয়। তাই সহজে কেউ ঘাঁটাতে চায় না তাকে। আবার পাড়াপড়শির বিপদে-আপদে সে গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে। কেউ অভাবে পড়েছে জানলে তাকে নিজে না খেয়েও সাহায্য করে। তার ঘরে সন্ধ্যায় বা রাত্রে প্রায়ই ছু চার জন পুরুষ মানুষ এসে বসে, গল্প করে, আড্ডা দেয়। কেউ বা অনেক রাত পর্যন্তও থেকে যায়। পাড়ার বা গ্রামেরই লোক তারা, সকলেই চেনে। তাই নিয়ে পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কিন্তু সামনাসামনি কিছু বলতে সাহস করে না তাকে। সামাজিক দিক থেকেও ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটছে বলে মনে করে না কেউ।

তার এই সমস্ত গুণের পরিচয় এ গ্রামের জোতদারের অজানা নাই। পূর্বে এখনকার মতো কোন হিতৈষী রাজপুরুষের তুষ্টি বিধান করে নিজের কাজ হাসিল করবার উদ্দেশ্যে তার বিশ্বস্ত চাকরকে পাঠিয়ে অনেকবার মল্লিকাকে তার বাড়ি নিয়েও গেছে। এখন যে সেই মেয়ে তার প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

সেদিন জোতদারের বিশ্বস্ত চাকর এসে পূর্বের মতো রাত্রে তাকে তার সঙ্গে যাবার কথা বললে। মল্লিকা তখন খেয়ে উঠে পান চিবোচ্ছিল। লোকটির প্রস্তাব শুনে সে অপ্রত্যাশিতভাবে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে অভিধান-বহির্ভূত কিন্তু সুস্পষ্ট চোখা গ্রাম্য শব্দে লোকটিকে সম্ভাষণ করবার পর অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় একটি সছুপদেশ দিয়ে বিদায় করলে। উপদেশটা জোতদারকে পৌঁচে দেবার জন্য। তার মর্মকথা হ'ল এই যে জোতদারের নিজের বাড়িতেই যখন তার যুবতী বৌ-ঝিরা মাননীয় সরকারী অতিথিদের মর্যাদা রক্ষা ও সন্তোষ বিধানের জন্য যথেষ্ট দৈহিক যোগ্যতা রাখে,

তখন এই হিমের রাতে গরিব চাকরকে এতদূর পাঠানো তার উচিত হয়নি।

লোকটি যখন এই উপদেশবাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্য অভিশপ্তের আনন্দ নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল, মল্লিকা তার সেই আনন্দকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য এবং উপলক্ষটাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য তার পিছু পিছু বেরিয়ে এক মুখ পানের পিক ছুড়ে তার গায়ের কাপড়খানা অনেকটা রাঙ্গিয়ে দিলে। লোকটি অবশ্য ফিরে গিয়ে তার বক্তব্য মনিবকে সবটা বলতে পারলে না, কেবল ইঙ্গিতে যতটা সম্ভব অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলে এবং তার সাক্ষী হিসাবে গায়ের কাপড়খানা মেলে ধরলে। জোতদারের মুশকিল হ'ল সে তার এই ব্যর্থতার কথাটাও অতিথির নিকট প্রকাশ করতে পারলে না নিজে খেলো হয়ে যাবার ভয়ে।

মল্লিকার এই পরিবর্তন অবশ্য হঠাৎ হয়নি, আপনা থেকেও হয়নি। কিছুদিন আগে মেনকার স্কোয়াড গিয়ে তাদের পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কৃষকদের দাবির কথা প্রচার করেছিল। পরে আবার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েও আলোচনা করতে গিয়েছিল। তাদের বলেছিল সমিতির মেম্বর হতে, আন্দোলনের কাজে যোগ দিতে। মেয়েরা সকলেই উৎসাহিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আবার যারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, মল্লিকা তাদের অগ্রণী। এখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জোতদার ও পুলিস একই গোত্রের লোক, তার ও তার ছেলের শত্রু, তার খেটে-খাওয়া গ্রামবাসীদের ও সমস্ত কৃষকদেরও শত্রু

জোতদারের এই ব্যর্থতার ফলে পুলিস ক্যাম্পের ক্ষুদে কর্তা হতাশ হলেও নিজেই এখন বেরোয় শিকারের সন্ধানে, সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃষকদের বাড়ির আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘোরে, মাঠেঘাটে বা ঝোপের আড়ে শিকারী কুকুরের মতো শুঁকে শুঁকে বেড়ায়।

কথাটা গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে যায়। পুরুষরা শুনে অনেকে

উদ্বেগ প্রকাশ করে, অনেকে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জোতদার শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং ইঙ্গিতে তার অতিথিকে হুশিয়ার করে দেয় যেন বিপদ না ঘটে যায়। তার শিকার সন্ধান আপাতত বন্ধ থাকে।

পুলিসের এই উৎপাত দেখে গ্রামের কর্মীরা রহীমকে জিগেস করলে কী করা যায়। সে বললে পুলিস যখন এখনো আন্দোলনের উপর সরাসরি হামলা করেনি, এবং যখন গ্রামবাসীদের বেইজ্জত করবার মতো সুবিধাও পাচ্ছে না, তখন একটু সংযত থাকাই ভালো, যাতে তাদের কোন রকম প্ররোচনা দেওয়া না হয়। প্ররোচনা দেবার ফলে তাদের লাভ বা লোকসান কতটা হতে পারে সে কথাটা মেয়েদের বুঝিয়ে বলতে হবে। সেজন্য যেতে হ'ল তাকে।

গ্রামে পুলিস ক্যাম্প বসেছে। গুপ্তচরদের আনাগোনাও চলছে, লোকে তাদের বলে আই-বি তারা শুনেছে এরা আই-বির লোক। সেই কারণে রহীম এবং রমেশ ও বিমলও তাদের এড়িয়ে চলে, পাছে হঠাৎ কোন সময়ে ধরা পড়ে যায়। তাই সে দিনে এল না, এল রাত্রে। মেয়েদের বৈঠক বসল মল্লিকার ঘরে। তাকে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন রাত্রে 'কমরেড' আসবেন এবং তারই ঘরে বৈঠক বসবে।

রহীম একা আসেনি, দুজন ভলন্টিয়ার সঙ্গে আছে আর আছে মেনকা। মেনকাকে এনেছে সেই এখানে আলোচনা করে গেছে বলে। পুলিসের নোংরা আচরণ সম্বন্ধে রহীম মেয়েদের বুঝিয়ে বললে তার বক্তব্য। মল্লিকা বললে, আপনি হুকুম দাও কমরেড, আমি লোকটাকে একদিনেই ঠাণ্ডা করে দোব।

ঠাণ্ডা করে দেওয়া বলতে মল্লিকা কী বোঝাতে চায় রহীম জানে না। জানতে চাইলেও না এখন। কেবল হেসে বললে, মল্লিকাদিদি, এখন আমাদের একটু সামলে চলতে হবে। সমস্ত মেয়েদের হুশিয়ার থাকতে হবে, সন্ধের পর অন্ধকারে অথবা একলা কেউ বাইরে বেরোবে না, দু একজন মেয়েকে সঙ্গে রাখবে যদি

বেরোতেই হয়। কিছুদিন অবস্থাটা আমরা দেখি, তারপর যা করতে হয় করা যাবে।

মেয়েরা বুঝলে কথাটা। রহীম তখন আরো কিছু আলাপ করলে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিলে। বললে, আন্দোলন আরো জোর ধরতে থাকলে জোতদাররা এবং পুলিস অনেক বেশি জুলুম করবে। মারপিট করা, ঘরে আগুন দেওয়া, লুটপাট করা—এমনি সব কুকাজই করতে পারে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তখন মেয়েদেরও অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হবে।

অনেকক্ষণ আলাপের পর যখন তারা উঠবে, মল্লিকা বললে, না কমরেড, আপনি না খেয়ে কোথা যাবে? আমি যে রেঁধে রেখিছি। তবে সবায়ের তো হবে না, আপনি আর মেনকাদিদি এখানে খাবে এখুনি। আমি ভাত বাড়ছি, বলে সে উঠল।

রহীম আপত্তি করলে। বললে, আমি এখুনি আমার আড্ডায় যেয়ে খাব।

মল্লিকা কিছুতেই শুনবে না। অগত্যা রহীম রাজি হ'ল। মেনকা কিন্তু রাজি হ'ল না। বললে সে বাড়ি গিয়ে খাবে, আর সঙ্গী দুজন কমরেড আছে, তারাও সেখানে খাবে। অবশ্য তাদের ব্যবস্থা অন্য বাড়িতে হ'ত, সেজন্য অন্য মেয়েরা প্রস্তাবও করলে, কিন্তু মেনকা খেলে না বলে তারাও খেলে না এখানে। মেনকা আপত্তির যে কারণ দেখালে তা অবশ্য ঠিকই। তবে সেই সঙ্গে তার মনের মধ্যে আর একটু প্রতিরোধও ছিল—সে মল্লিকার পূর্ব পরিচয় জানে। রহীম সে পরিচয়ের কথা তখনো জানত না, শুনেছে পরে। তখন জানলেও তার নিকট সেটা অবশ্য আপত্তির কারণ হ'ত না, মল্লিকার আমন্ত্রণ সে বাতিল করতে পারত না।

পুলিসের এ ধরনের আচরণের অভিযোগ রহীম অন্যান্য ক্যাম্প সম্পর্কেও শুনেছে। সেখানেও একই জবাব দিয়েছে। বলেছে পুলিস যখন কৃষকদের আন্দোলনে খোলাখুলি বাধা দেয়নি, তারা নিজেদের কাজ করে যেতে পারছে, আর কারো গায়েও যখন তারা হাত

দেয়নি, তখন কোন রকম অশান্তি যাতে না হয় তা দেখা দরকার। অকারণে অশান্তি ঘটালে আন্দোলনেরই অনিষ্ট হতে পারে। পুলিসের এই আচরণ মামুলী ব্যাপার। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় পুলিস কি ভালো হতে পারে? কাজেই যথাসম্ভব তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। তবে যদি তাদের আচরণ একেবারে অসহ্য ওঠে তাহলে অবশ্য সমস্ত গ্রামবাসীকে একযোগে প্রতিরোধ করতে হবে। এ কথার ব্যাখ্যা শুনে সকলে তার সঙ্গে একমত হয়েছে।

পুলিসের ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও তেভাগা দাবির আন্দোলনে ভাগচাষীদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ দিয়েছে ছোট রাইয়তরা আর খেতমজুররা, যদিও বিনামূল্যে জমি বণ্টনের দাবি এখন আর আন্দোলনের সামনে নাই। ছোট জোতদারদের, এমন কি সাধারণ-ভাবে মাঝারি জোতদারদেরও এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করে নিজেদের পুরোন হিসাবে অর্ধেক ভাগের অধিকার সাব্যস্ত রাখার মতো ক্ষমতা নাই। তাদের বরং আশংকা তারা বাধা দিতে গেলে এখন যতটা ভাগ পাচ্ছে তাও হয়তো পাবে না। তাই ভবিষ্যতে প্রতিকারের আশা নিয়ে আপাতত তারা তাদের ভাগচাষীদের এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কৃষক ও জনমজুরদের মিলিত শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করাই সমীচীন মনে করলে। তবে নীতিগতভাবে তেভাগার দাবি বজায় রেখেও অনেক ছোট জোতদারের সঙ্গে সমিতির নেতৃত্বে ভাগচাষীরা আপস করে ভাগ কিছু কম নিলে। এইভাবে অসংখ্য ছোট এবং মাঝারি জোতদারদের জমিতে তেভাগা কায়েম হয়ে গেল।

মাঝারি রাইয়ত-কৃষকরা তেভাগা দাবির বিরোধী নয়, বরং সমর্থক। যে সমস্ত বড় চাষী নিজেরা চাষ করে এবং জমি ভাগে দেয় না তারাও এই দাবির বিরোধী নয়, কিন্তু খোলাখুলি সমর্থনও করতে চায় না। তারা দেখে ভাগচাষীদের আন্দোলনের মধ্যে খেতমজুররা আছে প্রধান ও সক্রিয় সমর্থক হিসাবে। তাই ভাবে এর পর যদি তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবি তোলে তাহলে ভাগচাষীরা তাদের সমর্থন

করবে, তাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেবে। কাজেই তারা তেভাগা আন্দোলনকে সুস্পষ্ট সমর্থন জানাতে ভয় পায়।

ভাগচাষীরা খেতমজুর ও রাইয়ত চাষীদের সঙ্গে মিলে ছোট ও মাঝারি জোতদারদের ক্ষেত্রে তেভাগার দাবি ক্রমেই ব্যাপকভাবে কায়েম করছে দেখে আতংকিত বড় জোতদাররা এবং তাদের দোসর লাটদার ও মহাজনরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা বিশ্বাস করে এর প্রতিকার করে তাদের স্বার্থ বজায় রাখবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারের হাতেই আছে, তারা নিজেরা কিছুই করতে পারে না। তাই তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে গবরমেণ্টের উপর ভীষণভাবে চাপ দিতে আরম্ভ করলে। তাদের বক্তব্য হ'ল আর বিলম্ব করলে তাদের ক্ষেত্রেও তেভাগা দাবি কায়েম হয়ে যাবে এবং একবার কায়েম হলে সে দাবিকে আর বাতিল বা উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তখন মুখে মুখে একটা কথা প্রচারিত হচ্ছে শোনা গেল—ভাগচাষীদের দাবি সরকার ন্যায্য বলে স্বীকার করে এবং পরের বছর যাতে আন্দোলন না করে আইনের জোরেই তেভাগা আদায় হয় সেজন্য সরকার উপযুক্ত সময়ে আইন পাশ করবে। সুতরাং গবরমেণ্ট চায় যে কৃষকরা এখন আর আন্দোলন না করে এবারকার মতো জমির মালিকদের সঙ্গে ভাগ সম্বন্ধে একটা সমঝোতার দিকে এগিয়ে যাক। তাহলে শান্তি ভঙ্গের আশংকা থাকবে না, পুলিস ক্যাম্পও আস্তে আস্তে তুলে নেওয়া হবে।

প্রচারটা শুরু হয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকেই। জোতদার-মহাজন এবং সম্পন্ন কৃষকদের নিকট আই-বির লোক গিয়ে এ সব কথা বলতে থাকে এমনভাবে যাতে লোকের ধারণা হতে পারে যে আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে গবরমেণ্টের একটা আপস রফা এই মর্মে হয়ে গেছে।

এই প্রচারের প্রভাব ক্রমে কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে আরম্ভ করলে, আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের মধ্যে ঢিলেমি প্রকাশ পেতে লাগল, আন্দোলনের দুর্বার গতির মধ্যে কিঞ্চিৎ মন্থরভাব দেখা গেল।

এই অবস্থা যখন রহীমের নজরে পড়ল, অন্যান্য দিক থেকেও কথাটা কানে উঠল, তখন সে সমিতির সংগঠিত এলাকার এক প্রান্তে আন্দোলনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত। শুনেই সে ধরে নিলে এ প্রচার নিছক মিথ্যা এবং শত্রু পক্ষ—জোতদার শ্রেণী এবং সরকারই—এর জন্য দায়ী। সে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্মীদের ডেকে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে প্রতিপ্রচারের ব্যবস্থা করলে। সর্বত্র যাতে প্রতিপ্রচার হয় তার জন্য নিজে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে লাগল এবং সেই সঙ্গে চিঠি মারফত সংক্ষেপে সে বক্তব্য লিখে সমস্ত কেন্দ্রে জানিয়ে দিলে।

আন্দোলনকে আবার চাঙ্গা করার চেষ্টা হ'ল বটে কিন্তু ইতিমধ্যেই সরকারী প্রচার অনেকখানি অনিষ্ট করে দিয়েছে। আন্দোলনের তরফ থেকে প্রতিপ্রচার শুরু হয়েছে জেনে পুলিস ধরে নিলে এবার তাদের খোলাখুলি আন্দোলনের উপর আঘাত হানতে হবে। বিমল ও রমেশের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোল। বিমল যথেষ্ট সতর্ক ছিল না, ধরা পড়ে গেল।

আবাদে যেসব আই-বির লোক ঘুরছিল তারা সম্প্রতি রহীমকে দেখতে পায়নি, পুলিস ও আই-বির আমদানী দেখে সে বিপদের আশংকা করে আগে থেকেই হুশিয়ার হয়েছিল। তারা তার নামও জানে না, কারো কাছে শোনেনি। কেবল শুনেছে কমরেড বলে পরিচিত এক ব্যক্তি এ অঞ্চলের প্রধান সংগঠক। সে কমরেড এখনো এখানে আছে কি না সে সম্বন্ধেও তারা নিশ্চিত নয়। তাই রহীমের নামে ওয়ারেণ্ট বেরোল না। সে অবশ্য তা জানে না বরং ধরেই নিয়েছে যে রমেশ ও বিমলের মতো তারও নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

এই চিন্তা নিয়েই সে ঘোরাফেরা করতে লাগল এবং নিজেকে যথাসম্ভব পুলিস এড়িয়ে চলমান করে রাখলে।

আটাশ

সরকারী প্রচার সত্ত্বেও রহীম নিশ্চিতভাবে ধারণা করেছিল যে গবরমেণ্ট ভাগচাষীদের দাবি পূরণ করতে পারে না। সে জানত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তৎকালীন স্থানীয় গবরমেণ্ট নিজের প্রধান সামাজিক ভিত্তি জোতদার শ্রেণীকে ধ্বংস করতে যাবে না। তথাপি সরকারী তরফ থেকে প্রচার এত বেশি হ'ল যে তার মূলে কোন সত্য আছে কিনা জানা প্রয়োজন বোধ করলে।

কিছুদিন থেকে কলকাতার সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যায়নি। তাই নিজেই সে দু একদিনের জন্য চ'লে গেল অবস্থাটা সঠিকভাবে জেনে আসতে। সেজন্য ঝুঁকিও নিতে হ'ল।

সেখানে গিয়ে সমিতির কেন্দ্র থেকে সে জানতে পারলে যে গবরমেণ্ট সত্যিই কৃষকদের দাবি অনেকটা মেনে নিয়ে আইন পাস করবে বলে আইনের খসড়া তোয়ের করেছিল এবং সরকারীভাবে প্রকাশও করেছিল।

অতিরিক্ত জোতদারী শোষণের কারণে বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন এবং বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বণ্টনের ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে বলে এবং সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের পর এ বিষয়ে ভূমিরাজস্ব কমিশনের এবং কতকটা দুর্ভিক্ষ কমিশনেরও অভিমতকে অন্তত কিছু পরিমাণে কার্যকর করা উচিত মনে হয় বলে মন্ত্রিসভার মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট মন্ত্রীর আগ্রহের ফলে এই আইনের খসড়া রচনার জন্য প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই আইন পাস হলে জোতদারী স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই অজুহাতে জোতদারদের তরফ থেকে অন্যান্য মন্ত্রীদের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে যে জোরালো চাপ আসে তার নিকট মন্ত্রীসভাকে নতি স্বীকার করতে হয়।

ফলে গবরমেণ্টের এই আইন পাস করবার সদিচ্ছা এইখানেই খতম হয়, প্রচারিত বিল শিকেয় ওঠে, এবং আন্দোলন দমনের জন্য পুলিসী ব্যবস্থার উপর জোর পড়ে। এই আইন তৈরির প্রচেষ্টা ও তার প্রচারের পর দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিসের একটু সময় লেগে যায়।

এবার কলকাতা গিয়ে রহীম বাড়িতে ওঠেনি পাছে পুলিসের নজরে পড়ে যায়। তার পার্টি ও সমিতির কেন্দ্রের সংগে আলাপ আলোচনা যা করবার গোপন অবস্থাতেই করে নিলে।

পরে ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে গেল একবার বাড়িতে সকলের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখে তার শিশুপুত্র নান্নুর অসুখ। জন্মের পর তার অসুখ-বিসুখ বিশেষ হয়নি। তাই এখন তার অসুখ তেমন গুরুতর না হলেও বাড়ির সকলের তাকে নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা। নান্নু তখন আধ-আধ কথা বলে। বাপকে পেয়ে খুশী হয়ে বললেও কথা, তার কোলেও এল নিজে থেকে।

কিন্তু ছেলেকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে তাকে চলে যেতে হবে। বাড়িতে না থাকলেও কলকাতায় থেকে মাঝে মাঝে দেখে যাবার সুযোগও পাবে না সে। এলাকার এখন যা অবস্থা তাতে সেখানকার দায়িত্ব ত্যাগ করে অন্যত্র থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। এ রকম সময়ে মনের মধ্যে চট করে অহেতুক অকল্যাণের চিন্তাও জেগে ওঠে। রহীমের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কিন্তু সে শক্ত হয়ে থাকল।

অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে সকলকে। সে ছেলেকে আদর করে বিদায় নেবার সময় শিশু বলে উঠল, আমি দাব। রহীম আর সংযত থাকতে পারলে না, তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। জাহানআরা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। তার মা এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। একটু পরে রহীম ছেলের মুখে

চুমো খেয়ে করুণকণ্ঠে জাহানআরাকে বললে, আমার উপায় নেই, যেতেই হবে। জাহানআরা তা ভালোই বোঝে। তাকে নীরবে বিদায় দিলে সে।

কলকাতায় আলাপ করার ফলে রহীম বুঝলে তার এলাকায় এবার পুলিসী তাণ্ডব সুরু হবে। ব্যক্তিগতভাবে তারও বিপদ বাড়বে। সে ভলন্টিয়ার পাঠিয়ে সমস্ত কেন্দ্রে পরিস্থিতি সম্বন্ধে কর্মীদের সচেতন ও হুশিয়ার করে দিলে, তাদের কীভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তাও জানালে।

তাদের কর্মী ও ভলন্টিয়াররা খবর দিলে বোয়াখালির পুলিস ক্যাম্প ক্রমেই বেশি বেশি সক্রিয় হচ্ছে, টহলদারী বাড়িয়েছে এবং আগের তুলনায় দূরের গ্রামেও যাচ্ছে। স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করে রহীম স্থির করলে তাকে কাছাকাছি থাকতে হবে। সে শোলমারিতে বংশীর বাড়িতে ঘাঁটি করে থাকল। যমুনা ও লক্ষ্মী খুব খুশী।

বংশীর বাড়ি তার ঘাঁটি হলেও রাত্রে সে থাকে অন্যান্য বাড়িতে, সব্দিন এক জায়গায় নয়। এবং কোন্ দিন কোন্ বাড়িতে থাকবে তা সেই বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। সকলে শুয়ে গেলে সে যায় সেই বাড়ি, কাঁচা মেঝেতে পোয়াল পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোয় এবং ভোরে সকলের ওঠার আগে ফিরে আসে বংশীর বাড়ি।

দিনের বেলায় প্রায়ই তাকে যেতে হয় অন্যান্য গ্রামে। সঙ্গে অন্তত একজন থাকে—নীলুই থাকে বেশি, দাশুও থাকে। যেদিন অন্য গ্রামে যেতে হয় না সেদিন যমুনার কাছে খায়। ভবঘুরে বংশী তাকে বাড়িতে রেখে বেশি দূরে যায় না কিন্তু আশপাশের গ্রাম-গুলোতে গিয়ে সমস্ত অবস্থার খবর এনে দেয়।

একদিন দাশু বললে, আজ রাতে আমাদের গাঁয়ে যেতে হবে

কমরেড। কমরেডরা বলছেন জোতদারদের বাড়ির খবর পাওয়া গেছে, তাই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। আমি এসে নিয়ে যাব। আর মা বলেছে রাতে খাবেন আমাদের বাড়ি।

রহীম হেসে বললে, কী খাওয়াবি বল তো ?

আমি জানি না কমরেড, মা বলতে পারে। কাল হাট থেকে আলু আর মুসুরির ডাল কিনে এনেছে। আর ঘরে ডিম আছে, মুরগী আছে তো কটা। তবে আমার মা রাঁধে ভালো।

যে জোতদারের বাড়ি পুলিসের ক্যাম্প আছে তার বাড়ির মেয়েদের কাছে পাড়ার অন্য দু একজন মেয়ে জানতে পেরেছে যে শীঘ্রি ক্যাম্পে আরো পুলিস আসবে এবং তখন আন্দোলন ভাঙ্গবার জন্য ব্যবস্থা করবে। এ সম্বন্ধে গ্রামের লোকের এখন কী করা কর্তব্য তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

বৈঠকে যা কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেল তাই নিয়ে কথাবার্তা হ'ল। বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই ; সে আলোচনা অনেক রকম সম্ভাবনা বিচার করে আগেই হয়ে গেছে। এখন কেবল সংক্ষেপে আশু কর্তব্যের প্রশ্নই উঠল এবং সিদ্ধান্তও হ'ল।

এই বৈঠক শেষ হতেই মল্লিকা এসে বললে, কমরেড, আমার ঘরে সব মেয়েরা জুটেছে, সেখানেও বলতে হবে আমরা কী করব এখন। এ অবস্থায় ধার না গেলে চলে না। কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে তাদের জন্য বিশেষভাবে যা বলবার বললে রহীম, তাদের সাহস ও উৎসাহ দিলে।

এ বৈঠক শেষ হলে মল্লিকা বললে, কমরেড, এখন রাত হয়ে গেছে অনেকটা। ঠাণ্ডায় আর কোথাও যেয়ো না। এখানেই দুটো খেয়ে শুয়ে পড় আপনি।

নীলু ছিল সেখানে। হেসে বললে, বেশ বেশ! আর তোমাদের গাঁয়ে পুলিস রয়েছে, রাতে এসে ধরে নিয়ে যাক!

উঁঃ, কী বলিস নীলু, মল্লিকা প্রত্যয়ের সাথে প্রতিবাদ জানালে।

আমার বাড়ি যমও ঢুকবে না। তোরা ঘরে শুয়ে থাকবি, আর আমি খাঁড়া বঁটি নিয়ে দাওয়ায় বসে সারারাত জেগে পাহারা দোব। কার বাপের সাধ্যি আছে আসুক না ধরতে কমরেডকে।

তার প্রস্তাব অবশ্য মেনে নেওয়া গেল না। দাশুর বাড়ি গিয়ে খেতে হবে রহীমকে।

দাশুর মা-বাবা, তাদের বৌরা এবং তার ভাইরা সকলেই পরম সমাদরে রহীমকে অভ্যর্থনা করলে। রহীম এদের সকলের সঙ্গেই পরিচিত। আগে এসেছে এখানে, কিন্তু খায়নি কখনো। দেখা গল তার মা মোটের উপর রান্না ভালোই করেছেন। দাশুর মা-বাবা খাবার সময় বসে গল্প করতে লাগলেন, বৌরা যত্ন করে খাওয়ালে। নীলুও খেলে সেখানে।

রহীমের খাবার পরিমাণ দেখে বৌরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। রহীম হাসির কারণ না বুঝে কৌতূহলীহয়ে প্রশ্ন করলে, কী গো, তোমরা হাসছ কেন?

দাশুর বৌ জবাব দিলে, কমরেড, তুই অত কম ভাত খাস কেনে? তাই তো হাঁসছি আমরা।

তার মাও বললেন, হ্যাঁ গো, তুমি বড় কম খাও বাপু, রাঁধা ভালো লাগছে না বুঝি?

না গো, রাঁধা খুব ভালো লাগছে, রহীম জবাব দিলে। কিন্তু খাব কত? এত ডিম, এত মাছ, তার ওপর বেশি ভাত পেটে ধরবে কেনে?

খাবার পর দাশু বললে, কমরেড, তাহলে আপনাদের শোবার জায়গা করে দি।

না রে না, কমরেডকে নিয়ে আমি এক্ষুনি চলে যাব, বললে নীলু। তোদের গাঁয়ে রাতে কমরেডের থাকা চলবে না।

পুলিসের কথা বলছিস নীলু? আমি কাঁড় হাতে করে সারা রাত বসে থাকব। আমার কাঁড়ের কাছে কোন শালা পুলিস আসতে পারে ভেবিছিস? দৃঢ়তার সহিত বললে দাশু।

তার বাবা বললেন, রাত অনেক হ'ল তো বাবু, ঠাণ্ডায় এতটা রাস্তা বাদার ওপর দিয়ে যেতে কষ্ট হবে তোমাদের। রাতটা থেকে ভোরে উঠে চলে যেতে। দাশুর হাতে কাঁড় থাকতে কেউ আসতে পারবে না।

কিন্তু রহীম ঝুঁকি নিতে চাইলে না। এত রাত্রে মাইল দুই পথ ঠাণ্ডায় শিশিরে না যেতে হলে ভালো হ'ত, কিন্তু সে থাকা উচিত মনে করলে না। কথা হ'ল দাশু ও তার এক ভাই গিয়ে তাদের পৌঁচে দিয়ে আসবে।

সে বুড়োবুড়ীর সঙ্গে বসে আলাপ করতে লাগল। দাশুরা দুজন ছোট জোতদারের জমি ভাগে চাষ করে। সমিতির পরামর্শ মতো তারা তেভাগা সম্বন্ধে একটা রফা করে নিয়েছে। পুরো দুভাগের বদলে কিছু কম আদায় করেছে। তাদের ঝাড়ামাড়া শেষ হয়ে গেছে। বাড়ির সকলেই চাষে খাটে, কাজেই বিলম্ব হয়নি। নিজে-দের ধান তারা বেঁধে রেখেছে ঘরে, কেবল কাপড় চোপড় কেনবার জন্য কিছু অংশ বিক্রী করেছে। অবশ্য চাষের ফসলেই তাদের বছর চলে না, জন খাটতে হয়। সব মিলিয়ে কোন রকমে সংসার চলে।

বংশীর বাড়ির সকলেই রহীমকে পূর্বে থেকে চেনে, তার জাত-ধর্মের খবরও রাখে, যদিও নামের বদলে কমরেড বলেই সে পরিচিত। তাহলেও যে গোঁড়ামি এদের মধ্যে থাকার কথা তা এখন অনেক কেটে গেছে। এই বোষ্টম বাড়িতে তার যত্ন আদরের ত্রুটি নাই। তাদের ঘরের মধ্যেও তার অবাধ গতি। নিজে সে তাদের কলসী থেকে জল ঢেলেও খায়। তবে তাদের রান্নাঘরে কখনো ঢোকে না, তার প্রয়োজনও হয় না।

তাদের বাসের ঘর একখানা। ঘরের তিন দিকে দাওয়া, তার অধিকাংশই ছিটেবেড়ায় ঘেরা। একদিকে আছে বর্ষার জন্য রান্নার জায়গা আর ঢেঁকি, অন্য দুটো দিকে শোয় তারা, একটা দাওয়ায়

কোণে বংশী ও যমুনা, অন্যটায় কালু ও লক্ষ্মী তাদের মেয়ে নিয়ে। রহীম দিনমানে এখানে থাকলে অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতরে বসে কাজ করে। রাস্তা থেকে দেখা যায় বলে বাইরে বসে কম।

ঘরের মধ্যে যখন থাকে সে তখন ফাঁক পেলে এখানকার সকলের চালচলন কথাবার্তা লক্ষ্য করে। রহীম ছেলেবেলায় তার গ্রামের সমাজে থাকতে কৃষকদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের চাল-চলন ও রীতিরেওয়াজ ভালো করেই দেখেছে। তার থেকে এই কৃষকদের জীবনের তফাতটা কেমন ও কতখানি তা বোঝবার চেষ্টা করে।

সে দেখেছে গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে চালচলন ও আদবকায়দার তফাত অনেক। এই সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে তার তুলনায় কম তফাত। আবার শহরের শ্রমিকদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য আরো কম।

তাহলেও দুই সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে সামাজিক আচরণ ও অভ্যাসের দিক থেকে তফাত নেহাত কম নয়। মুসলমান কৃষকদের বাড়ি তুলসীগাছ সে দেখেনি কখনো। এখানে দেখে যমুনা সকালে উঠে তুলসীতলার মাটি নিয়ে জিভে ও কপালে ঠেকায়। উঠানে গোবরজলের ছড়া দেয় এরা, কিন্তু রোস্তমদের বাড়ি সে নিয়ম অচল।

একদিন বাড়ির উপর দিয়ে একটা দাঁড়কাক কা কা করতে করতে উড়ে যাচ্ছে দেখে যমুনা সন্ত্রস্তভাবে বলে উঠল, হরেকৃষ্ণ বল ! হরে-কৃষ্ণ বল ! এরকম ক্ষেত্রে রোস্তমের মাকে সে বলতে শুনেছে, আল্লার নাম কর ! উভয় ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা একই, ভাবনাও এক।

অর্থনীতিক জীবনে ছোট ছোট কৃষকদের মধ্যে মিল যথেষ্ট এবং হিন্দু ও মুসলমান দুই ক্ষেত্রেই জীবনযাত্রাও প্রধানত এই অবস্থারই দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত বলে শ্রেণী হিসাবে দুই সম্প্রদায়ের ছোট কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না।

একদিন যমুনা উঠনে বসে রান্না করছে আর গুন গুন করে আপন মনে গান গাইছে, হয়তো কোন বৈষ্ণব সংগীতের দুই এক

কলি গাইছে আস্তে আস্তে। প্রতিবেশী একটি মেয়ে এসে বসল। বললে, কী রান্না করছ গো? যমুনা একটু সুর করেই জবাব দিলে, কাস্তে ভাজা, কড়ুল ভাতে, কোদাল চচ্চড়ি।

মেয়েটি হেসে উঠল। বললে, এমন নরম নরম মিষ্টি মিষ্টি খাবার কাকে খাওয়াবে গো?

তুই খাবি তো বল, তোকেই আগে দিই, জবাব দিলে যমুনা।

মেয়েটি গলা নিচু করে প্রশ্ন করলে, কমরেড কি ঘরে রয়েছে?

হ্যাঁ রয়েছে। দেখিস মুখে বেফাঁস কথা এনে ফেলিসনে। কমরেড শুনলে নিন্দে করবে, যমুনা ফিসফিস করে হুশিয়ারি দিলে তাকে।

বাড়ির মধ্যে খানিকটা জমি আছে বংশীর। পৈত্রিক রাইয়তী জমি। তার এক পাশে কয়েকটা কলার ঝাড়, তার সংগে একটা ছোট পুকুর। পুকুরের জল মন্দ নয়, স্নান করা চলে, মাছও আছে। তার পাড়ে কয়েকটা চারা আমগাছ, নারকেল গাছ, খেজুর গাছ আর গোটা চারেক কুল, বাবলা ও শিরীষ গাছ। এক কোণে আছে এক ঝাড় সরু সরু মুঠি বাঁশ। জমিটায় কিছু ফসল করা হয়— বেগুন, মরিচ, তামাক, কচু ইত্যাদি এবং কিছু শাক। আর ঘরখানার যে দিকে দাওয়া নাই সেদিকের উঠনে আছে বংশীর বাবা কাকার সমাধি। মাটির সংগে মিলিয়ে আছে, কিছু বোঝা যায় না।

রহীম এদের বাড়ি খায় খুব কম দিনই। প্রায়ই বাইরে যায়, বাইরেই খায়। যেদিন থাকে এখানে তখনো অন্যান্য কৃষকরা তাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে যায় খেতে। কোন কোন দিন অবশ্য বংশীর বাড়িতেও খায়। বংশী বলে, কমরেড, আজ তাহলে গোবিন্দর সংসারেই দুটো হ'ক সমস্যা হ'ল সকালের খাওয়া নিয়ে, অন্য গ্রামে যাবার পূর্বে। হাঁসের ডিম কিনতে পাওয়া যায় কিন্তু এরা বোষ্টম মানুষ, ডিম খায় না, রান্না করতে, এমন কি সিদ্ধ করতেও জানে না। একদিন ধান সিদ্ধ করবার সময় যমুনা ধানের মধ্যে দিয়েছিল দুটো ডিম। ধান যখন সিদ্ধ হ'ল তখন ঢেলে দেখলে

ডিমগুলো অতিরিক্ত সিদ্ধ হয়ে আর আস্ত নেই। বেচারী লজ্জিত-ভাবে বললে রহীমকে। সে হেসে বললে, থাক বৌদি, ডিম এ বাড়িতে সইবে না।

মুড়ি আর কলা অনেক সময় পাওয়া যায়। সব মেয়ে এখানে মুড়ি ভাজতে জানে না। পাড়ার এক বিধবা ভাজে, বিক্রীও করে। রহীমের তাতে সুবিধা; পয়সা দিয়ে কিনতে পারে। নীলু বা অন্যকেউ এনে দেয়। না পাওয়া গেলে অগত্যা যমুনাকে পান্তাভাত দিতে হয়। অবশ্য নুনপান্তা। পিঁয়াজও পাওয়া যায় না, বোষ্টম বাড়ি এটা। আর ভাত যখন তখন দামও দেওয়া চলে না। বংশী বলে, গোবিন্দের সংসারে যা দুটো জোটে খেয়ে নেন কমরেড। বুড়ি দেখি আপনাকে বশ করে ফেলেছে, পান্তা খাবার অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে।

সেদিন সকালে পান্তা খেয়ে বেরোবে রহীম। ভাতের থালাটা লক্ষ্মী দিয়ে গেল তার সামনে। যমুনা কাছে বসেছিল। বংশী গিয়েছিল গ্রামের মধ্যে, ফিরে এসে তাকে বললে, দে আমাকেও দুটো দিয়ে দে, আমিও আজ বেরোব কমরেডের সঙ্গে। সে বসে পড়ল রহীমের পাশে। লক্ষ্মী তাকেও দিয়ে গেল একটা থালা।

এই সময় একটা দাঁড়কাক কা কা করতে করতে উড়ে গেল। যমুনা উদ্বেগের সহিত বলে উঠল, হরেকৃষ্ণ বল! হরেকৃষ্ণ বল! বংশী রহীমের উপস্থিতিতে একটু সংকুচিত বোধ করলে এজন্য। বললে, হ্যাঃ, কাগ ডেকে গেল তো তোর ভাবনা কিসের?

ভাবনা কি আমার জন্যে? কোথা কী হয় কে জানে। বললে যমুনা। রহীম কিছু না বলে কেবল একটু মুচকি হাসলে। ভাবলে বংশীর চিন্তাধারা এখন নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে।

প্রতিদিন ভোরে ঝাপসা আঁধারের মধ্যে যখন সে ঘুম ছেড়ে অন্য বাড়ি থেকে বংশীর বাড়ি আসে তখন দেখে বংশী তার ঘুম ভাঙ্গার পর কাঁথা ও মশারীর মধ্যে শুয়ে শুয়ে চৈতন্যচরিতামৃত আওড়াচ্ছে; এখন মশারী টাঙ্গায় তারা মশার কারণে নয়, ঠাণ্ডাটা একটু কম লাগবে বলে।

সেদিন ভোরে এসে রহীম শুনলে বংশী আবৃত্তি করছে :

"জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব সার ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার।"

এর পরই রহীমের আসার আওয়াজ পেয়ে বংশী বললে, কমরেড এলেন নাকি ?

হ্যাঁ দাদা, তাহলে আমিও একটু শোনাই তোমাকে, বলে রহীম একটু সুর করে আবৃত্তি করলে :

"শ্রদ্ধা করি এই তত্ত্ব শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব সার।
সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাবে পার ॥"

রহীম চৈতন্যচরিতামৃত এক সময়ে পড়েছিল, তার মধ্যে কোন কোন অংশের দু চার লাইন তার মনেও আছে। ঘটনাক্রমে আজ বংশী যা আবৃত্তি করলে সে অংশ তার মনে পড়ল। পরিহাসের ছলে সে তাই আবৃত্তি করলে।

শুনে বংশী যেমন বিস্মিত তেমনি উৎফুল্ল হ'ল। যমুনা হয়তো আরো আনন্দিত হ'ল, কিন্তু মুখে কিছু না বলে শুধু বংশীর গা টিপে হর্ষ প্রকাশ করলে। বংশী বললে, কমরেড, তাহলে আপনিও দেখছি আমাদের শাস্তর পড়েছেন। সে আবার আওড়ালে :

"সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।"

রহীম বললে, বংশীদাদা, তোমার নামে আর তোমার গোবিন্দর সংসারের নামে তাহলে বলি একটু শোন:

"গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাহার প্রাণ ধন ॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥

দেখলে তো দাদা, তোমার নাম বাদ দিলে গোবিন্দর নামের কোন মাহাত্ম্যই থাকে না, বলে রহীম হাসলে।

যমুনা কিন্তু অত বোঝবার প্রয়োজন দেখলে না। সে ভাবতে লাগল কমরেডও তাহলে একজন ভক্ত লোক, হয়তো গোঁসাইয়ের মতন হবে। নইলে শহর ছেড়ে, ঘরসংসার ছেড়ে গরিব চাষীদের ভালোর জন্যে আবাদে এমন করে পড়ে থাকতে পারে কেউ। হরিদাস ঠাকুরের কথা মনে পড়ল তার। কে বলতে পারে কার মধ্যে কী আছে। প্রভুর লীলা, সবই হতে পারে। রহীমের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

পরে রহীম ও বংশীর অনুপস্থিতিতে সে যখন এই ঘটনা মেয়ে-জামাইয়ের নিকট বর্ণনা করে তখন কালু দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে কারও উদ্দেশে প্রণাম জানালে—যমুনা ঠিক বুঝতে পারলে না রহীমের, না প্রভুর উদ্দেশে।

এই সময়ে তাকে অনেক সময় শিবুদের গ্রামে এবং তাদের বাড়িও যেতে হয়েছে। একখানা মাঠ পার হলেই সে গ্রাম। তাই অন্য গ্রামে যাবার পথেও পড়ে কখন কখন। মেনকা জানে তার খাবার অসুবিধার কথা, তাই হামেশা তাকে খেতে বলে তাদের বাড়ি। শিবুর অবস্থা অবশ্য বংশীর চেয়ে ভালো। রহীম অনেক সময় খায়ও সেখানে।

সে যখনি যায়, মেনকাই তার যত্ন নেয়, কালী একটু ঘোমটা

টেনে সরে থাকে। কালী লাজুক বড় বেশি, এ পর্যন্ত রহীমের সঙ্গে কথা বলেনি কখনো। শিবু ও মেনকার অনুপস্থিতিতে সে যদি কোন সময়ে গিয়ে পড়ে তাদের বাড়ি, কালী মেনকাকে ডেকে নিয়ে আসে পুকুরঘাট থেকে অথবা কোন প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে। বলে, চ'লো, তোর কমরেড এসেছে দেখগে।

মেনকা বলে, আমার কমরেড, তোর কে লো? তোর বুঝি কমরেড নয়? আমি না থাকলে কমরেডের সঙ্গে কথা বলতে পারিসনে? ঢং আর কী!

আমার কেমন নজ্জা করে, কালী তার দুর্বলতা স্বীকার করে।

রহীমের সঙ্গে মেনকার ব্যবহার এখন সহজ হয়ে গেছে। সে অনেক সময় তার সঙ্গে একা বসেও আলাপ করে। গ্রামের লোকে কী বলছে যা করছে জানায় তাকে। কে কেমন মানুষ তাও বলে। মল্লিকার পরিচয়ও সে-ই দিয়েছিল রহীমকে।

রহীম শুনে হেসে বললে, তারই জন্যে তুমি মল্লিকার বাড়ি খেলে না বুঝি?

মানুষের অনেক রকম দুর্বলতা থাকে তো দিদিমনি, রহীম তার মানসিক প্রতিরোধকে মোলায়েম করবার চেষ্টায় বললে। মল্লিকার হয়তো ঐ দুর্বলতা আছে কিন্তু কেমন সাহসী লড়াকে মেয়ে সে তা তো দেখেছ? অমন মেয়ে পাবে কটা? আমাদের তো সেটাও দেখতে হবে। কাজেই মিশতেও হবে তার সঙ্গে। দোষগুণ মিলিয়েই তো সংসার।

সে কথা আপনি ঠিকই বলেছেন কমরেড, বললে মেনকা। তার মতন সাহস তাদের গাঁয়ে আর কোন মেয়ের নেই। তবে আমার খারাপ লাগে কেনে জানেন? একটা মানুষ তো নয়, যে সে আসে তার কাছে। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, এবং তারাই কেবল আসে।

মেনকা যখন মল্লিকার এই দুর্বলতার পরিচয় দেয় তার পরে রহীম তার গ্রামের এক কমরেডের কাছে জানতে পারে জোতদারের

লোক মল্লিকাকে নিতে এসে কী ভাবে নাকাল হয়ে ফিরেছে। সে খবর মেনকা জানত না। রহীম বললে তাকে। মেনকা শুনে মন্তব্য করলে, তাহলে তো খুব জোর দেখিয়েছে বলতে হবে কমরেড। এখন তার মনে মল্লিকা-বিরোধী প্রতিরোধটা অনেকখানি ভোঁতা হয়ে গেল।

বললে, আমার একটা ভয় ছিল কমরেড, এ রকম মেয়েকে আমাদের আন্দোলনের কাজে বিশ্বাস করলে বিপদ হতে পারে। এখন দেখছি তা ঠিক নয়। আর তাকে অবিশ্বাস করা চলে না।

ঊনত্রিশ

সেদিন সকালে দাউদ এসে কথা প্রসংগে বললে, কমরেড, আমাদের ধানগুলো এবার ঝেড়েমেড়ে নিতে না পারলে আর তো চলে না। খোরাকীর টান পড়ে গেছে! আমরা তখন ভুল করে মালিকের খামারে ধান তুলিছি, মালিকের লোক গোলমাল করছে।

একজন বড় জোতদারের জমি ভাগে চাষ করে দাউদ এবং তার মতো আরো অনেক কৃষক। জোতদারের প্রচুর জমি, বাড়ি দূরবর্তী অন্য গ্রামে। হাজিনগরেও তার জমি আছে, খামার বাড়ি আছে, সেখানে কর্মচারীও থাকে। গ্রামের অন্যত্র ধান তোলার মতো জায়গা নাই অথচ এই খামার বাড়িতে যথেষ্ট জায়গা। তাই এখানেই তারা বরাবর ধান তুলে রাখে, ঝাড়ামাড়া করে, এবারও করেছে। অন্য বড় জোতদারদের যে সব ভাগীদাররা জোতদারের খামারে ধান না তুলে জমিতেই খামার করেছিল তারা ধান ঝেড়ে নিতে পেরেছে। দাউদরা তা না করে অসুবিধায় পড়েছে।

চারিদিকে তেভাগার হিড়িক দেখে এই জোতদারের কর্মচারী নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে এ পর্যন্ত ধান ঝাড়া বন্ধ রেখেছে। তারা ভেবেছিল আন্দোলনে ভাটা পড়বে শীঘ্রি। তখন আধা ভাগ আদায় করে নেবে। নইলে পুলিসের সাহায্যে আদায় করবে। আন্দোলনের জোর থাকতে তার সুবিধা হবে না ভেবে বিলম্ব করিয়েছে।

এখনো সেই কর্মচারী অপেক্ষা করতে চায়, কিন্তু খোরাকীর অভাবে চাষীরা আর দেরি করতে প্রস্তুত নয়। স্থানীয় সমিতিও স্থির করেছে আর দেরি করা চলবে না, ধান ঝাড়ার কাজ শুরু করতে এবং তেভাগা আদায় করে নিতে হবে। ঝাড়ার কাজ যথা-সম্ভব সমস্ত চাষী একই দিনে এক সঙ্গে শুরু করবে এবং তা ছাড়াও

কিছু লোক যাতে অন্তত ধান ভাগের সময় উপস্থিত থাকে তার ব্যবস্থা করা হবে।

হাজিনগরের এই খামারবাড়ি নদীর পাশেই। বিস্তৃত খোলা উঠনের ধারে লম্বা কাছারি ঘর। পাকা মেঝে, টিনের ছাউনি। গোটা তিনেক বড় বড় কামরা। তার পিছনে ছোট ঘেরা বাড়ি। থানা থেকে নদীপথে কয়েক মাইল হবে। এই নদী বেয়ে উজানে মধুখালি হয়ে শহরেও যাওয়া হয়।

যেদিন ধানঝাড়ার কথা সেইদিন ভোরে দাউদ খবর পেলে পাঁচজন সশস্ত্র পুলিস ও তাদের একজন ক্ষুদে অফিসার রাত্রে পুলিসের লঞ্চে এসে উঠেছে কাছারি ঘরে। সে তখনি এল রহীমকে সেই কথা জানাতে।

রহীম ও বংশীকে নিয়ে দাউদ তখনি বেরোল। ইতিমধ্যে লোক পাঠিয়ে কাছাকাছি গ্রামগুলোতে যে কজন কমরেডকে পাওয়া যায় সঙ্গে আনতে বলে এসেছে সে। হাজিনগরের পথে দাউদ মাঝ-খানের গ্রামে সকলকে নিয়ে আলোচনা করলে অবস্থাটা। সকলেরই মত হ'ল সেইদিনই ধান ঝাড়া শুরু হবে। যা ঘোষণা আছে পুলিস দেখে তার পরিবর্তন করা হলে আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতি হবে। কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে লোক জমায়েত করতে হবে যাতে পুলিস আন্দোলনকে দুর্বল ভাবতে না পারে। সেজন্য ভলন্টিয়ারও পাঠানো হ'ল।

এই বৈঠকে এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হ'ল যে এক সঙ্গে সকল কৃষকের গাদা ভাঙ্গা হবে না, এক একজনের ধান ঝেড়ে ভাগ করে নেওয়া হবে, সকলেই তাতে সাহায্য করবে। তার কাজ শেষ হলে আর একজনের ধান এইভাবে ঝাড়া, ভাগ করা ও তোলা হবে। দাউদ তার গ্রামের নেতা, তারই ধান প্রথম ঝাড়া হবে ঠিক হ'ল। মুখে মুখে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হ'ল সকলকে।

কৃষকরা সকলেই হাজির হ'ল; ধান ঝাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই এল সকলে। বাইরে থেকেও বেশ কিছু লোক জমা হ'ল। এই

জোতদারের ভাগীদাররা ছাড়া হাজিনগরের আরো অনেক কৃষক এসে গেল। লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

দাউদ কাছারি ঘরে গিয়ে জোতদারের কর্মচারীকে বললে, বাবু, আমরা এখন ধানঝাড়া শুরু করছি।

সে তোমাদের মর্জি, গম্ভীরভাবে বললে সে।

পুলিস অফিসার একবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে খামারে লোকজন কেমন আছে। তারপর ভিতরে ঢুকে গেল।

দাউদ গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে বললে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! স্লোগান দিলে। অনেক লোক মিলে গাদা ভেঙ্গে ধান ঝাড়তে লেগে গেল। লোক অনেক বেশি আছে, তাই আরো দুজনের পালা ভেঙ্গে ঝাড়া শুরু করা হ'ল।

উপস্থিত সকলের মুখে উত্তেজনা ও উল্লাসের চিহ্ন স্পষ্ট। সেই সঙ্গে লোকে কথা বলছে, হাসিতামাসাও করছে। তবু একটা থমথমে ভাবও রয়েছে। কাজ সকলকে করতে হচ্ছে না, অনেকেই দাঁড়িয়ে বা বসে জটলা করছে। ধান ঝাড়ছে যারা তারা সকলে দুর্বার বেগে করে যাচ্ছে তাদের কাজ।

রহীম এই গ্রামেরই প্রান্তে অন্য দুজন কমরেডের সঙ্গে একটা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। ভলন্টিয়ার মারফত খামারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিল। তারা ঘন ঘন খবর দিয়ে যাচ্ছে।

দাউদের ধান ঝাড়া শেষ হতেই ধান ভাগ করা হতে লাগল। তিনটে ভাগ হচ্ছে। সেই সময় জোতদারের কর্মচারী এসে দাউদকে হুকুম দিলে, তিন ভাগ না করে দু ভাগ কর, নইলে ভাগ বন্ধ রাখ এখন।

দাউদ হেসে বললে, আমাদের সমিতি ঠিক করেছে, তেভাগা হবে, আপনি এক ভাগ পাবেন।

লোকটা আর কিছু না বলে ফিরে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। উপস্থিত সকলে আবার স্লোগান দিতে লাগল; মাঝে মাঝে স্লোগান দিচ্ছে তারা।

কিছুক্ষণ পরে তিনজন সশস্ত্র পুলিস নিয়ে অফিসার বেরিয়ে এসে কাছারি ঘরের সামনে উঠনে দাঁড়াল। অফিসার এক পাশে থাকল, সেপাই তিনজন এক লাইনে বন্দুক তুলে দাঁড়াল।

উপস্থিত জনতার মধ্যে একটু হল্লা শুরু হ'ল কিন্তু কাজ বন্ধ হ'ল না। বংশী সেখানে উপস্থিত ছিল। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সে এগিয়ে গেল অফিসারের কাছে। বললে, কি বাবু, আপনার সেপাইরা বন্দুক দেখাচ্ছে কেনে? বন্দুক দেখে লোকে ভয় পাবে ভাবছেন বুঝি? ভাগ যদি পছন্দ না হয়, যার জমি তাকে বলুন না আদালতে যেতে।

জনতার মধ্যে থেকে একটা জোর আওয়াজ শোনা গেল, সমিতির হুকুম, বন্দুক সরিয়ে রাখ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! অমনি সকলে আওয়াজ তুললে, বন্দুক সরিয়ে রাখ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

অফিসার কোন কথা বললে না। বংশী ফিরে এসে দাঁড়াল ধান ভাগের কাছে।

ধান ভাগ হয়ে গেলে দাউদের দুভাগ ঝুড়িতে ভর্তি করে তার বাড়ি পৌঁচে দেবার ব্যবস্থা হ'ল। তখনো দুপুর হতে দেরী আছে। প্রথম ঝুড়ি মাথায় তুলে দাউক যেমনি চলতে আরম্ভ করলে, অমনি এক সঙ্গে তিনটে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। গুলী দাউদের পিঠে লেগে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেল। তার বলিষ্ঠ অসাড় দেহখানা তৎক্ষণাৎ ধড়াস করে পড়ে গেল। রক্তের স্রোতে খামারের মাটি লাল হয়ে গেল। বংশী ও আরো কয়েকজন ছুটে তার কাছে গিয়ে "জল জল" বলে চীৎকার করলে। আরো অনেকে "জল" ও "পানি" বলে চীৎকার করলে। বংশী দাউদের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে দেখলে সে আর জীবিত নাই। কিন্তু চোখ দুটো তখনো যেন করুণ দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে।

যাঃ, সব শেষ হয়ে গেছে, বলে সে কেঁদে উঠল। দাউদের ভাইও হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। সে এসে বংশীর জায়গায় বসে দাউদের মাথাটা কোলে নিতেই বংশী উঠে দাঁড়াল।

নিমেষের মধ্যে দেখা গেল তিনজন পুলিসের মধ্যে একজন গোড়াকাটা কলাগাছের মতো লম্বা হয়ে পড়ে গেল আর তার হাতের বন্দুকটা একদিকে ছিটকে পড়ল।

দাউদ যখন গুলীর আঘাতে পড়ে যায় সে সময়ে দাশু ছিল এক পাশে দাঁড়িয়ে। তার হাতে গামছায় জড়ানো ধনুক আর তীর ছিল। লোকে যখন বিহ্বলের মতো দাউদের দিকে ছুটে গেল তখন সে একটা পালার আড়ালে ধনুকে গুণ চড়িয়ে এসে একজন সেপাইকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে। অব্যর্থ লক্ষ্যে তীর গিয়ে সেপাইয়ের জামা সমেত লক্ষ ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করতেই সেপাই মরে পড়ে গেল।

সেপাই যে দাশুর তীরের আঘাতে মরেছে তা কৃষকেরা বোঝ-বার পূর্বেই দেখা গেল অন্য দুজন সেপাই আবার গুলী চালালে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাশুর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চতুর্দিকে প্রচণ্ড কোলাহল শুরু হয়ে গেল। আওয়াজ পেয়ে গ্রামের সমস্ত লোক ছুটে আসতে আরম্ভ করলে। সমিতির পূর্ব নির্দেশ অনুসারে বাড়ি বাড়ি বিপদ সংকেত দেওয়া হতে লাগল শাঁখ ও ঝাঁজ বাজিয়ে। সে আওয়াজ নিকটের অন্যান্য গ্রামে শোনা যেতে লাগল। সেই সব গ্রামেও আবার সংকেত দেওয়া হতে লাগল এবং ক্রমে সেই আওয়াজ দূরের গ্রামগুলিতেও পৌঁছতে লাগল। লাঠি হাতে হাজার হাজার কৃষক ছুটতে লাগল হাজি-নগরের দিকে।

ইতিমধ্যে বংশী এবং অন্যান্য অনেকে এগিয়ে গেল, একজন দাশুর দেহ কোলে তুলে নিয়ে দেখলে তাতেও আর প্রাণ নাই। তার মুখে আক্ষেপেরও কোন চিহ্ন নাই, বুঝি অল্প কথার মানুষ এই সাঁওতাল ছেলেটা ভেবেছিল সে তার কর্তব্য পালন করে গেছে।

এদিকে পুলিস অফিসার দেখলে তার সেপাইও মরেছে। বাকি দুজন সেপাইও তখন বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মরা সেপাইয়ের লাশ তুলে তারা কাছারি ঘরের দাওয়ায় রাখলে। তারপর চারজন সেপাই উঠনে নেমে আবার বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল।

তাদের অফিসার যখন দেখলে সে গুলি চালাতে হুকুম দিয়ে ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি করে বসেছে, সে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। জোতদারের কর্মচারীর প্ররোচনায় ও প্রলোভনে পড়েই সে এই অপকর্ম করেছে। সেই কর্মচারী ঘর থেকে বেরিয়ে অবস্থা দেখে এবং জনতার মারমুখো চেহারা দেখে কাঁপতে কাঁপতে খুঁটি ধরে বসে পড়ল।

ইতিমধ্যে বহু লাঠিধারী লোক গ্রামের ভিতর থেকে ছুটে আসছে দেখে পুলিস অফিসার আতংকিত হয়ে উঠল। বুঝলে এসমস্ত লোক মরিয়া হয়ে তাদের আক্রমণ করলে তাদের সকলকেই মুহূর্তের মধ্যে খতম করে দিতে পারে, বন্দুকও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। সে পাংশু মুখে সেপাইদের হুকুম দিলে ফাঁকা গুলি চালিয়ে জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দাও। সকলেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। একটা গুলি গিয়ে বংশীর তলপেটে বিদ্ধ হ'ল, আর একটা গুলি বছর বারো বয়সের একটা ছেলের ডানপায়ে হাঁটুর নিচে আঘাত করলে। দুজনেই পড়ে গেল।

তাই দেখে জনতা প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, পুলিসের উপর চড়াও হবার উপক্রম করলে। পুলিস অফিসার হতভম্ভ হয়ে ভাবলে হিত করতে বিপরীত হয়ে গেল। নিজে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। গুলি চালানো বন্ধ করতে বলে দাওয়ায় উঠে বসল। হাঁপাতে হাঁপাতে জোতদারের পেয়াদাকে বলে জল আনিয়ে খেলে।

ভলন্টিয়াররা নিকটের বাড়ি থেকে জল এনে বংশীকে ও আহত ছেলেটাকে খাওয়ালে। ছেলেটার হাজিনগরেই বাড়ি, নাম মধু।

ইতিমধ্যে দাউদের মৃত্যু সংবাদ এবং শাঁখ-ঝাঁজের আওয়াজ শুনে রহীম ও অন্য কমরেডরা ছুটে আসছিল। পথে আর একজন ভলন্টিয়ার সেপাই ও দাশুর মৃত্যু সংবাদ জানাতে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল।

খামারে এসে তারা শুনলে বংশী এবং একটা ছেলেও আহত হয়ে পড়ে আছে। তাদের দুজনকে দেখতে গেল প্রথমে। জনতাও তাদের

দেখে পুলিসের উপর চড়াও হবার জন্য আর অগ্রসর না হয়ে থেমে গেল।

বংশী কথা বলতে পারছে কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রহীম তার মাথাটা কোলে নিয়ে একটা হাত ধরে নাড়ী দেখলে। বংশী একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, ওরা দুজন গেল, আমিও যাচ্ছি। লাল ঝাণ্ডার লড়াই আপনারা চালিয়ে যান কমরেড। আমার বোষ্টমী থাকল, দেখবেন।

রহীম তাকে দেখে এবং তার কথা শুনে অশ্রু রোধ করতে পারলে না। বললে, ভাবনা করো না দাদা, তুমি সেরে যাবে। এখুনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

আহত মধু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকেও সান্ত্বনা দিলে রহীম। এ অঞ্চলে নিকটের গ্রামে কোন ডাক্তার নাই। সে ভাবলে তাদের এখনি হাসপাতালে পাঠানো দরকার। একবার দাউদ ও দাশুর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে লাল সালাম দিয়ে সে গেল পুলিস অফিসারের কাছে। তখনো সেপাই চারজন বন্দুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঠনে।

প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে রহীম অফিসারকে বললে, কী ভয়ানক কাণ্ড করে ফেলেছেন বুঝতে পারছেন, না এখনো বোঝবার মত জ্ঞান হয়নি আপনার? কার অর্ডারে গুলি চালাতে বলেছেন? এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে খুন করার জন্যে আপনিই দায়ী। এখনো আপনার পুলিস দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক নিয়ে, আরো খুন করতে চান নাকি? ইচ্ছে করলে এখনো আমাকে, আরো পাঁচ দশ জনকে খুন করতে পারেন হয়তো, কিন্তু আপনারা একটা লোকও এখান থেকে জ্যান্ত ফিরবেন না। একটা তীরে একজন গেছে আপনাদের, আরো তীর আছে। আর পারেন তো একটু বেরিয়ে তাকিয়ে দেখুন মাঠের দিকে, হাজার হাজার মানুষ লাঠি নিয়ে ছুটে আসছে। তাদের হাত থেকে কে রক্ষা করবে আপনাদের? কত বড় অপরাধ করেছেন দেখেছেন কি ভেবে?

রহীম এক সঙ্গে এত কথা বলে ফেললে। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। ততক্ষণে জনতা তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিসের চার জন ভয় পেয়ে গেল পাছে বন্দুক কেড়ে নেয় তারা। অফিসার ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। ইশারা করে সেপাইদের উঠে ঘরে যেতে বললে। তার জিব শুকিয়ে কাঠ, কিছু বলবার চেষ্টা করে শুধু তোতলাতে লাগল।

রহীম আবার বললে, যদি বাঁচতে চান তো এক্ষুণি আহত দুজনাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে পৌঁচে দিন। এ অঞ্চলে ডাক্তার থাকলে আমরাই ব্যবস্থা করতাম। যান, দেরী করবেন না। আবার যদি কেউ মরে, কেউ বাঁচাবে না আপনাদের। আহতদের বিশেষ যত্ন করে নেবেন, আমাদের লোকও সঙ্গে যাবে।

আতঙ্কিত অফিসার এতক্ষণে কথা বলতে পারলে। তার যা অবস্থা, সরে পড়তে পারলে বেঁচে যায়। বললে, আচ্ছা স্যর, এখুনি সব ব্যবস্থা করছি। লঞ্চে তুলে নিচ্ছি। লঞ্চ ঘাটে আছে, রহীম আগেই শুনেছে।

অফিসার উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে সেপাই এবং পেয়াদাদের বললে, আহত দুজনকে আগে যত্ন করে লঞ্চে তুলে দাও। তারপরে লাশ তিনটে তুলবে। আর বলে দাও ঘাটে এক্ষুণি লঞ্চ ছাড়তে হবে।

তখন জোতদারের কর্মচারীর কাছে গিয়ে রহীম বললে, তুমিই বোধ হয় জোতদারের লোক, কেমন? তুমি এখন যেয়ো না, এখানেই থাক। তোমার সঙ্গে কৃষকরা বোঝাপড়া করবে। তোমার হুকুমেই তো গুলি চালানো হয়েছে? কত টাকা কবুল করেছিলে পুলিসকে?

লোকটার চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চোখ দুটো যেন মরা মানুষের, যেন ঘোলা হয়ে গেছে। ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করলে, মুখ দিয়ে তার কথা বেরোল না।

তারপর রহীম গিয়ে বংশীকে বললে, দাদা, ভাবনা কোরো না, এখুনি ওরা নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। আমি এখুনি তোমার বাড়ি

গিয়ে বলব সব। মধুর বাপ ও ভাই তখন এসে গেছে। সে গিয়ে তাকে আদর করলে, তার বাপ-ভাইকেও সান্ত্বনা দিলে। হাসপাতালে পাঠাবার কথা বললে তাদের। ঠিক হ'ল তার ভাইও যাবে সঙ্গে।

ইতিমধ্যে দাশুর ভাইরা এসেছে শাঁখ-ঝাঁজের আওয়াজ শুনে। দাউদের বাপও এসে কান্নাকাটি করছেন। রহীম গিয়ে একে একে দাউদ ও দাশুর লাশের কপালে চুমো খেয়ে বললে, তোমাদের এ আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না কমরেড। পরে পাশে কিছুক্ষণ করে মাথা নত করে আবার লাল সালাম জানিয়ে দাঁড়াল। তার দেখাদেখি সকলেই তাদের লাল সালাম দিয়ে বিদায় দিলে।

আহত ও নিহতদের যাতে সযত্নে নেওয়া হয় সেজন্য দুজন দায়িত্বশীল কমরেডকে সঙ্গে পাঠাতে হবে। কিছু বিছানা বালিশ ও চাদর আনিয়ে নিলে। তার কাছে টাকা যা ছিল তাতে দুজন কমরেডের শহরের খরচ চলবে মনে করলে। সঙ্গে খাবার জল ও গেলাস দেবার ব্যবস্থা করা হ'ল। ইতিমধ্যে জলধর ও শিবু এসে গিয়েছিল। তাদের দুজনকে সঙ্গে পাঠানো হ'ল।

যখন লঞ্চে তোলা হ'ল সকলকে, জলধর ও শিবু, মধুর ভাই, পুলিসের সকলে এবং জোতদারের কর্মচারী ও দুজন পেয়াদাও গিয়ে উঠল। লঞ্চ ছাড়ার সময় সেই কর্মচারী এবং পুলিস অফিসার রহীমকে নমস্কার জানালে।

প্রচণ্ড আওয়াজে শ্লোগান দেওয়া হ'ল, কমরেড দাউদ জিন্দাবাদ! কমরেড দাশু জিন্দাবাদ! কমরেড বংশী জিন্দাবাদ! কমরেড মধু জিন্দাবাদ! কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

দুজন ভলন্টিয়ারকে রহীম বললে দাউদের বাপ ও ভাইকে, দাশুর ভাইকে এবং বাপকে নিয়ে কাছারি ঘরের দাওয়ায় বসাতে। লঞ্চ চলে গেলে সে এবং উপস্থিত জনতা খামারে এসে গেল। যে ক'জন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে পাওয়া গেল তাদের নিয়ে আলোচনা

করা হ'ল। সিদ্ধান্ত হ'ল এখনি সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য শোক সভা হবে, লাল পতাকা অর্ধনমিত করা হবে এবং সভার পর সেই দিনই সমস্ত ধান ঝেড়ে কৃষকেরা নিয়ে যাবে, কেবল খড়ের তিন ভাগের একভাগ কাছারিঘরের কাছে রেখে দেওয়া হবে। মাড়াই করার কাজটা কৃষকরা নিজ নিজ বাড়িতে তাদের ভাগের খড় নিয়ে গিয়ে পরে করবে।

লোক তখনো আসছে স্রোতের মতো। সভার কথা ঘোষণা করে পতাকা অর্ধনিমিত করা হ'ল। জনতা জানে না অর্ধনিমিত করার মানে কী, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর রহীম দাউদ, দাশু ও বংশীর কাজকর্ম ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে, শহীদ দুজনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং বংশীর ও মধুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সংক্ষেপে বক্তৃতা করলে, নিহত ও আহতদের পরিবারদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করলে। পরিবারদের পরিচয় দিলে এবং তাদের উপস্থিত আত্মীয়দের দেখিয়ে পরিচয় দেওয়া হ'ল। শহীদদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবার দায়িত্বের উল্লেখ করলে, সরকারী নীতির ও পুলিসের গুলি চালনার এবং সেই সঙ্গে জোতদারের কৃষক বিরোধী স্বার্থপর মনোভাবের নিন্দাও করা হ'ল। তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্যের জন্য আবেদন করলে।

এই সকল বিষয় ব্যক্ত করে এবং আহত ও নিহতদের জন্য সরকারের নিকট খেসারত দাবি করে সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল।

জন দুই দায়িত্বশীল কমরেডকে সেখানে রেখে রহীম গেল আহত ও নিহতদের বাড়ি দেখা করতে। সেজন্য বসন্ত ও নেয়াজকে পাওয়া গেল। তার সঙ্গে জনতিনেক কমরেড গেল। সে বলে গেল দেখা করবার পর আবার আসবে সে। তখন আরো অনেক লোক এসে পৌঁচবে, আবার সভা করতে হবে। কাজেই কেউ যেন চলে না যায়।

দাউদের বাপ ও ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবু বৃদ্ধকে নিয়ে সে তাঁর বাড়ি গেল। তার ভাই অন্য লোকের সাহায্যে ধান ও খড়

বাড়ি নিয়ে যাবে। দাউদের বাড়ি কিছুক্ষণ বসে তার ছেলেদের ডেকে আদর করলে। সে এসেছে শুনে বাড়িতে মেয়েরা কেঁদে উঠল।

তারপর সে গেল মধুর বাড়ি। তার বাপ সম্পন্ন চাষী, আন্দোলনের সমর্থক ও সমিতির মেম্বর। তার কাছে বসে কিছুক্ষণ কথা বললে, সান্ত্বনা দিলে।

সেখান থেকে দাশুর বাড়ি গেল তার ভাইকে নিয়ে।

সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। দাশুর বৃদ্ধ মা-বাপের কান্না দেখে অত্যন্ত বিচলিত হ'ল রহীম। তার বৌকে যখন কাছে ডেকে বসালে তখন গভীর বেদনায় তার চোখ ফেটে অশ্রু গড়াতে লাগল। সে দাশুকে কেবল ভালো কর্মী হিসাবেই দেখেনি, ব্যক্তিগতভাবেও তার প্রতি কেমন একটা স্নেহ ছিল তার, যেমন নীলু সম্বন্ধে। এখন আবার তার অসাধারণ সাহসের ও বীরত্বের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি মমতায় ভরে উঠল রহীমের মনটা।

অনেকক্ষণ পরে দাশুর মা সুস্থ হয়ে বললেন, তোমরা আর কী করবে বাপু, পুলিসে গুলি করে মেরেছে। সেও সমিতির কাজেই মরেছে, একটা পুলিসকে মেরেও গেছে। আমার ছেলে তো গেলই, বৌটার লেগেই দুঃখু। ছোট মেয়ে তো।

এর পর রহীম তার সঙ্গীদের নিয়ে গেল বংশীর বাড়ি। সেখানে তারা ঠিক খবরটা তখনো পায়নি ; কেউ বলেছে বংশী মারা গেছে, কেউ বলেছে বেঁচে আছে। গ্রামের যারা গেছে হাজিনগর, তারা ফেরেনি। কালু বিশেষ কাজ না থাকলে বাইরে বড় যায় না, শাঁখ-ঝাঁজরের শব্দ শুনেও অন্যদের মতো যায়নি। কিন্তু বংশীর একটা কিছু ঘটেছে শুনে খবর নিতে গেছে, এখনো ফেরেনি।

রহীম যমুনা ও লক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে সান্ত্বনা দিলে, আশ্বাস দিলে বংশী সেরে উঠবে। তাহলেও তাদের সঙ্গে অশ্রু বিসর্জন না করে পারলে না। বংশীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব তাকে মুগ্ধ করেছে।

আবার হাজিনগর যেতে হবে। সে সঙ্গীদের নিয়ে বেরোল।

যমুনাকে বলে গেল হয়তো রাত্রে সেদিন আসতে পারবে না। পথে বেরিয়ে সঙ্গী একজন কমরেডকে পাঠালে শিবুর বাড়ি। মেনকাকে খবর দিতে হবে শিবু শহরে গেছে এবং রহীম ফেরবার সময় রাত্রে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে।

হাজিনগর পৌঁচতে তার বেলা পড়ে গেল। শীতের ছোট বেলা, সূর্যাস্তের বেশি বিলম্ব নাই। গিয়ে দেখলে লোক গিজগিজ করছে, হাজার হাজার লোকের বিরাট জমায়েত। এতবড় জমায়েত পূর্বে হয়নি এখানে কখনো। বিপদ সংকেত শুনে বহু লোক ভাতের থালা ফেলেও লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। মাঠ দিয়ে কোনাকুনি এসেছে তারা, ধান কাটা জমির নাড়া থেঁতলে অসংখ্য রাস্তা পড়ে গেছে। যত মানুষ তত লাঠি, আর অসংখ্য লালঝাণ্ডা।

তেভাগা আন্দোলন শুরু করার আগে এখানকার কৃষক সমিতি সিদ্ধান্ত করে যে প্রত্যেক কৃষককে সমিতির মেম্বর হতে হবে এক আনা দিয়ে, বিশেষ চাঁদা দিতে হবে এক টাকা করে, এবং একগাছা লাঠি রাখতে হবে। মেয়েদের জন্য কেবল এক আনা দিয়ে মেম্বর হবার কথাই বলা হয়েছিল। পুরুষরা লাঠি যোগাড় করে রেখেছে প্রায় সকলেই, তবে বিশেষ চাঁদাটা অনেকেই দিতে পারেনি,বিশেষত খেতমজুরদের মধ্যে। তাহলেও চাঁদার টাকাও মন্দ ওঠেনি। তাছাড়া তখন বলা হয়েছিল কোন রকম বিপদ ঘটলে বাড়ি বাড়ি শাঁখ ও ঝাঁজ বাজানো হবে এবং সে আওয়াজ শুনলেই কৃষকদের যেতে হবে ঘটনাস্থলে।

আজকের এই বিরাট লাঠিধারী কৃষকের সমাবেশ সেই সিদ্ধান্তের ফল। বিপদ সংকেতও দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁচে গেছে ; গোটা এলাকায় সমিতির প্রভাবের বাইরে কোন গ্রাম নাই বলেই এতটা সম্ভব হয়েছে।

রহীম এসে দেখলে খামারের গোটা মাঠখানা এখন খালি হয়ে গেছে। সমস্ত ধান ঝাড়া ও তোলা হয়ে গেছে, কৃষকের ভাগের খড়ও

তুলে নিয়ে গেছে। কেবল জোতদারের অংশের খড়গুলো সরিয়ে কাছারিঘরের পাশে রাখতে কিছু বাকি আছে, তাও কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করা হ'ল। পুলিসের লঞ্চে করে চলে যাবার আগে কাছারিঘরে ও সংলগ্ন বাড়িতে তালা দিয়ে গেছে জোতদারের লোকজন।

সভায় যা জমায়েত হয়েছে তাতে খালি গলায় চীৎকার করলেও বক্তব্য সকলকে শোনানো সম্ভব হবে না। সকলে ঠাসাঠাসি হয়ে বসল যাতে কথা শোনা যায়। একজন প্রবীণ কৃষককে সভাপতি করে রহীম বক্তৃতা করলে। এবার অনেকটা বিস্তৃতভাবে তার বক্তব্য বললে।

সরকারের কৃষক বিরোধী নীতি, পুলিসী অত্যাচার ও অনাচার, আজকের ঘটনার সমস্ত বিবরণ, শহীদদের পরিবারগুলির প্রতি কর্তব্য, ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করা ছাড়া সে আরো কয়েকটি কথা বললে আবেদনের আকারে। তেভাগা আন্দোলন অনেক পরিমাণে সফল হয়েছে, তাতে আর্থিক লাভ হয়েছে ভাগচাষীদের। কিন্তু খেতমজুরদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া আন্দোলন এত জোরদার হ'ত না। সুতরাং প্রত্যেক ভাগচাষী পূর্বের তুলনায় যতটা বেশি ভাগ পেয়েছে তাই থেকে একটা অংশ খেতমজুরদের জন্য তাদের দেওয়া উচিত। সমিতির কাছে জমা দিলে তা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে।

সমিতির তহবিলেও একটা স্বেচ্ছামূলক বিশেষ চাঁদা তাদের দেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে সমিতিকে এবং তার সমস্ত আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলা যায়।

প্রত্যেক গ্রামে সমিতির একখানা করে ঘর তোলা দরকার। গ্রামের সমস্ত লোক সাধারণের কাজে এই সমিতির ঘর ব্যবহার করতে পারবে, অবসর সময়ে এবং বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় সেখানে বসে গ্রামের লোকের সুখদুঃখের কথা, কাজকর্মের কথা আলোচনা করতে পারবে।

সে সকলকে হুশিয়ার করে দিলে যে পুলিসী হামলা এখন আবার

নতুন করে হবে। আই-বির লোক আজ ভয়ে এদিকে আসেনি, পরে তারাও আসবে। তাই সেজন্য সকলে যেন সাবধান থাকে। এখান থেকে পুলিস আতংকিত হয়ে চলে গেছে বটে কিন্তু একজন সেপাই যে মরেছে সেজন্য পুলিস গ্রামবাসীদের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে।

সে খবর পেয়েছে বোয়ালখালি ক্যাম্পের পুলিস এখানে গুলী চলার খবর পেয়ে আসতে চেয়েছিল কিন্তু মাঠ দিয়ে অসংখ্য লোক লাঠি হাতে এখানে আসছে দেখে তারা সাহস করে না। কিন্তু আরো পুলিস এনে তারা এখন সারা এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য সমস্ত কৃষককে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে শৃংখলার সহিত কাজ করতে হবে, পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে, দরকার পড়লে গোপনে আশ্রয় দিয়ে রাখতে হবে। দাশু, দাউদ ও বংশীর মতো সাহস দেখাতে হবে, দাশুর মতো বীরত্ব প্রকাশ করতে হবে।

ত্রিশ

পরদিন সকালে জানা গেল হাজিনগরে জোতদারের কাছারি বাড়ি পুড়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। তার পাশে যে খড় গাদা করে রাখা হয়েছিল, সম্ভবত জোতদারের উপর রাগের বশে রাত্রে কেউ তাতে আগুন লাগিয়েছিল। ছাউনির টিন পর্যন্ত পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। গ্রামের লোক নিবোতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তবে জায়গাটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গ্রামের এক পাশে আছে বলে গ্রামের অন্যান্য ঘরবাড়ির কোন অনিষ্ট হয়নি।

দুদিন পরে শিবু ও জলধর শহর থেকে ফিরে এসে খবর দিলে বংশী হাসপাতালে মারা গেছে। মৃত্যুর পূর্বে যখন তার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা তখন জিগেস করা হয়েছিল তার কী চাই। তার মুখ দিয়ে জবাব বেরিয়েছিল—তেভাগা চাই।

খবরটা শুনে রহীমের মন গভীর বিষাদে ভরে উঠল। এতজন এমন মূল্যবান কমরেডকে এক সঙ্গে হারানো একটা বড় আঘাত, তাদের জন্য গর্ব করার কারণ যতই থাক। প্রথম দিনের মতো আজো তাদের স্মৃতি তার মন জুড়ে রইল, সবই কেমন বিস্বাদ বোধ হতে লাগল।

সন্ধ্যার পর রহীম শিবুর গ্রামেই একটা বৈঠক করছে। মেনকা জানে। শিবু বাড়ি এসে খবর পেয়ে সেই বৈঠকে গিয়ে খবর দিলে। রহীম তখনি তাকে এবং বৈঠকের সকলকে নিয়ে চলে গেল বংশীর বাড়ি। শিবু মেনকাকেও নিয়ে এল।

লক্ষ্মী তার বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। গ্রামের মেয়েপুরুষ সকলে এসে হাজির হ'ল সেখানে। যমুনা অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। লোকে মাঝে মাঝে আফ-সোস করে দু চার কথা বললে। মেয়েরা লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিলে।

তার কান্না থামলে যমুনা বললে, আমি সেদিনই বুঝে নিয়েছিলাম সে বাঁচবে না। কমরেড, আপনিই বা কী করবে! প্রভুর ইচ্ছে। ভগবান ডাকলে সে কি থাকতে পারে আমাদের কাছে।

একটু থেমে সে আবার রহীমকে উদ্দেশ করে বললে, কমরেড, সে নেই বলে আপনি আমাদের সবাইকে ভুলে যেয়ো না। সে তো সমিতির কাজেই মরেছে। আমিও সমিতির কাজ করি।

তাদের সান্ত্বনা দিয়ে রহীম ও অন্যরা সেদিনকার মতো বিদায় নিলে। মধুর পায়ে অপারেশন হবে, তবে কী রকম অপারেশন জানা যায়নি। সে শিবুকে নিয়ে খবরটা দেবার জন্য আবার পরদিন তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বললে। শিবু মধুর ও তার ভাইয়ের ভার দিয়ে এসেছে শহরের কমরেডদের উপর।

আরো দিন দুই পরে সত্যিই শুরু হ'ল পুলিসী সন্ত্রাস। এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করা হ'ল জন ত্রিশেক কৃষককে, বেশির ভাগ হাজিনগরের লোক এবং জোতদারের ভাগীদার। তাদের মামলার দায়িত্ব নিলে সমিতি এবং তারা সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ফিরে এল। পুলিস মারার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে নাই। পুলিস প্রথমেই রিপোর্ট দিয়ে ফেলেছে সেপাই খুন হয়েছিল দাশুর হাতে এবং সেজন্য সে চরম দণ্ড ভোগ করেছে।

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিস হাজিনগর, বোয়ালখালি, শোলমারি, কুমীরখালি ইত্যাদি কয়েকটা গ্রামে গিয়ে অকারণে লোককে হয়রান করলে, অনেকের বাড়ি ঢুকে কিছু কিছু জিনিস-পত্রও নষ্ট করলে, মেয়েদের পর্যন্ত খিস্তি করে গালাগালি করলে।

নেতৃস্থানীয় কমরেডদের হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল যেন তারা পুলিস এড়িয়ে থাকে। মেনকাকেও সরে থাকতে বলা হ'ল। কিন্তু দেখা গেল নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কারো খোঁজ করলে না পুলিস।

শোলমারির এক কৃষকের নামে ওয়ারেণ্ট ছিল, কেউ তা সন্দেহ করেনি। মেনকা সেদিন তার বাড়ি ছিল আশ্রয় নিয়ে। পুলিস এসে

বাড়ি ঘেরাও করেছে দেখে মেনকা ভয় পেলে হয়তো তাকেই ধরতে এসেছে। সে তখনি বাড়ির বৌয়ের সঙ্গে যুক্তি করে সিঁদুর পরে দুজনে কাঁখে কলসী নিয়ে ঘোমটা দিয়ে পুলিসের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরে মেনকা আর ফিরলে না, সরে পড়ল।

রহীমের নামে পরোয়ানা নাই। হাজিনগরে পুলিস অফিসার এবং জোতদারের লোক তাকে দেখেছে, তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু তার নাম বলতে পারেনি। তাহলেও রহীম সাবধান থাকল, বিশেষ করে আই-বির লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনে।

পুলিসের এই সন্ত্রাস চলল কয়েকটা দিন। পুলিস নিজেও বেশ নাকাল হ'ল। পরোয়ানা নিয়ে আসামীর খোঁজ করছে বলে একটা বাড়িতে দুজন পুলিস ঢোকে তাদের দেখে বাড়ির একটি মেয়ে গ্রাম্য ভাষায় চীৎকার করে গালাগালি করতে করতে ঝাঁটা হাতে তাদের তাড়া করে। তারা স্ত্রীলোকটির এই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে ভয়ে পালাতে থাকে। আওয়াজ শুনে পাশের বাড়ির একটি মেয়ে আঁচলের ভিতর হাতে লংকার গুঁড়ো নিয়ে তাদেরই উদ্দেশে সেই বাড়িতে আসছিল, তাদের পালাতে দেখে হাতের লংকার গুঁড়ো একজনের চোখে ছুড়ে দেয়। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়। এমনি এক ক্ষেত্রে আর এক বাড়িতে একটি মেয়ে লংকার গুঁড়ো না পেয়ে এক মুঠো ধুলো ছুড়ে মেরেছিল পুলিসের চোখে।

এর মধ্যে আর এক কাণ্ড করে মল্লিকা। তাদের গ্রামের পুলিস ক্যাম্পের যে অফিসার সন্ধ্যার অন্ধকারে নারী সংযোগের ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরে বেড়াত, সে আবার শিকারের তল্লাশে বেরোতে শুরু করেছে। এই গোলযোগের অবস্থায় তার সাহস বেড়ে গেছে। মল্লিকা এবার আর তার মতলব হাসিল না করে থকেতে পারলে না। নোড়া দিয়ে ঘয়ে ঘষে তার আঁশবঁটিটাকে খুব ধারাল করে রাখলে।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে সেই অফিসার দুজন সেপাই নিয়ে অন্য গ্রাম

থেকে ফিরে আসছিল। উর্দি পরে মাথায় কানাওয়ালা মোটা টুপি লাগিয়ে ছিল তখন। গ্রামে ঢোকবার মুখে তার চোখে পড়ল একটি মেয়ে পুকুরের কাছে মাঠে বসে আছে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। অমনি সেপাইদের বিদায় দিয়ে সে গিয়ে আস্তে আস্তে পুকুরঘাটের কাছে একটা বাঁশবনের পাশে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল, কারণ সে জানে মেয়েটি ঘাটে আসবে।

মল্লিকা তার পুকুরধারে বেঁধে রাখা ছাগল আনতে যাবার সময় তাকে দূর থেকে এই অবস্থায় দেখে বাড়ি ফিরে গেল এবং পরক্ষণে বঁটি হাতে বেরিয়ে এল। তারপর খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে গিয়ে পিছন থেকে তার ঘাড় চেপে বঁটির আঘাত করলে। কিন্তু টুপির কানায় লেগে বঁটিটা ঘুরে যাওয়াতে অফিসারের গলার পরিবর্তে শুধু একটা কান কেটে নিচে পড়ে গেল। সে তখন কাটা কানটা হাত দিয়ে ঢেকে, বাপরে! বলে দৌড় দিলে এমনভাবে যে পিছনে তাকিয়ে দেখবারও ফুরসত পেলে না। জানতেও পারলে না তার এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা করলে কে।

কিছু হতাশা ও কিছু উল্লাস নিয়ে মল্লিকা বাড়ি ফিরে বঁটির রক্ত ধুয়ে রেখে আবার গেল ছাগল আনতে।

অফিসার পরদিন ভোরেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সারা জীবনের জন্য একটা মূল্যবান কানের মায়া পরিত্যাগ করে। এই অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার যন্ত্রণার মধ্যেও অবশ্য তার সম্বন্ধে সুবিধা মতো একটা ব্যাখ্যা তৈয়ের করে নিলে। তারপরই বোয়ালখালির পুলিস ক্যাম্প তুলে নেওয়া হ'ল। জোতদারের ধান তার ভাগীদাররা নিজ নিজ জমিতে আগেই ঝেড়ে নিয়েছিল।

এই ঘটনার কথা কিন্তু মল্লিকা কাউকে না জানিয়ে মনের মধ্যে চেপে রেখে দিলে, কেবল রহীমের সঙ্গে দেখা হলে গোপনে বললে তাকে। কিন্তু কান কাটার ঘটনাটা জোতদার বাড়ির লোকের মুখ থেকেই জানাজানি হ'ল সর্বত্র জেনে গেল লোকে, কিন্তু কাজটি কার তা জানতে পারলে অনেক পরে।

পুলিসের উপদ্রব বন্ধ হলে এলাকার অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল। গুপ্তচরদের আনাগোনা যখন আর দেখা গেল না তখন রহীম ও রমেশ প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। বিমল এর আগেই ছাড়া পেয়েছে। এলাকার কিছু কমরেডের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে স্থির করা হ'ল যে এবার স্থানীয় কৃষক সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠান হওয়া দরকার এবং সেজন্য প্রস্তুতির কাজ এখনি শুরু করতে হবে।

প্রথমে পার্টি কর্মীদের একটা সভা ডেকে বিস্তৃতভাবে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হ'ল। এলাকার ব্যাপক ও শক্তিশালী তেভাগা আন্দোলনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা কর্মীরা বর্ণনা করলে। দেখা গেল কয়েকটা মূল বিষয়ে সকলেরই অভিজ্ঞতা এক।

তাদের প্রধান বক্তব্য হ'ল : আন্দোলনের দাবি কৃষকদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল এবং সেই সাড়া নিয়ে যে কৃষক ঐক্য গড়ে তোলা গিয়েছিল তা কর্মীদের রাজনীতিক শিক্ষা ও চেতনা না থাকলে সম্ভব হ'ত না। এলাকার মধ্যে সমিতির সংগঠনের বাইরে কোন গ্রাম না থাকায় পুলিসী উৎপাত ও তাণ্ডব সত্ত্বেও কর্মীরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করতে পেরেছিল বলে কৃষকদের মনোবল কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে পারেনি। তাই সকলের মধ্যে এমন দুর্জয় সাহস ও আত্মত্যাগের মনোভাব এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পুলিসের গুলিতে তিনজন কমরেড শহীদ হবার পরও কেউ ভয়ে পালানো দূরে থাক, আরো বেশি লোক এসে জমা হয়েছে।

আর একটা বড় অভিজ্ঞতা হ'ল মেয়েদের সাহস, উদ্যোগ এবং বীরত্ব। এই আন্দোলনে মেয়েরাও ময়দানে নেমেছে, সামাজিক বাধা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। তারা অসংকোচে অচেনা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছে, মেলামেশা করেছে, তাদের আশ্রয় দিয়ে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করেছে, পুলিসকে গালাগালি করে তাড়িয়েছে ও জব্দ করেছে, এবং গোপন কথা গোপনই রেখেছে। এসব বিষয়ে পুরুষরাও কোন প্রশ্ন তোলেনি, বরং সমর্থনই জানিয়েছে।

তেমনি মেয়েদের মধ্যে জেগেছে আত্মমর্যাদা বোধ। অনেক কৃষক আছে যারা তাদের বৌদের মারপিট করে, সে যে কারণেই হ'ক। বৌরা মার খেয়ে হয় মুখ বুজে হজম করে নেয়, নয়তো স্বামীকে গালমন্দ করে অথবা কান্নাকাটি করে নিজেদের অপমান বোধের ভার লাঘব করে। অনেকের ক্ষেত্রে বৌ মারা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এমনি এক ঘটনা ঘটে চণ্ডীপুরে। তখন তেভাগা আন্দোলন জোর চলছে। এক সর্দার ভাগচাষা সমিতির মেম্বর, তার বৌও মেম্বর। দুজনেই চাষে খাটে, সভামিছিলে যোগ দেয়। তেভাগাও আদায় করে নিয়েছে তারা। এই কৃষক কখন কখন পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি বাধলে বৌকে ধরে দুচার ঘা দিত, বৌ বেচারীও সহ্য করে যেত।

কিন্তু আন্দোলন চলা কালে একদিন স্বামীর মার খেয়ে সে বৌ আর সহ্য করলে না, সোজা গ্রামের সমিতির কাছে গিয়ে নালিশ করলে, কমরেড, এক কমরেড আর এক কমরেডকে মারবে কেনে তার বিচার করতে হবে তোমাকে। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সমিতির মেম্বর, অতএব কমরেড।

সমিতির নেতা ঘটনার বিবরণ শুনে সেইদিন গ্রামের কৃষকদের সভা ডাকলে। শুধু পুরুষরা নয়, অনেক মেয়েও হাজির হ'ল। কৃষকটিও অবশ্য এল। নেতা বর্ণনা করলে কী ঘটেছে। কৃষকটি তখন স্বীকার করলে ঘটনা সত্য। নেতার প্রস্তাব মেনে নিয়ে সে প্রকাশ্যে সকলের সামনে স্ত্রীর নিকট মাফ চাইলে এবং ওয়াদা করলে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবে না সে।

আন্দোলনটা মূলত ভাগচাষীদের স্বার্থ ও দাবি নিয়ে হলেও তাতে খেতমজুররা এবং অন্যান্য ছোট ছোট চাষীরা সমানভাবে যোগ দিয়েছে, আন্দোলনকে সকল রকম সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করেছে, অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা এতখানি

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তার ফলে কোথাও কোন রকম সম্প্রদায়গত প্রশ্ন বা জাতিবর্ণগত প্রশ্ন প্রশ্রয় পায়নি।

এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের ঐক্যের শক্তি এবং কৃষক সমিতি এলাকার সমস্ত কৃষকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাদের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বলে নতুন মর্যাদা লাভ করেছে। মাঝারি কৃষকরা সমিতিতে আরো বেশী সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে, এবং বড় কৃষকরা এখন সহজে বুঝেছে যে তাদের স্বার্থে কোন রকম আন্দোলন করতে হলে একমাত্র সমিতির নেতৃত্বেই করা যেতে পারে, এবং সেজন্য তারাও ধীরে ধীরে ঝুঁকছে সমিতির দিকে। অন্যদিকে তেমনি ভয় পেয়েছে বড় বড় জোতদার-মহাজনরা আর লাটদাররা। সমিতির প্রতি তাদের বিরোধিতাই নয়, ঘৃণাও বাড়ছে। তারা ভয়ও পাচ্ছে।

রোস্তম ও বসন্ত দুজন মিলে পরামর্শ করে একটা প্রস্তাব নিয়ে এল। রোস্তম বললে, কমরেড, আমাদের তিনজন কমরেড শহীদ হয়েছে হাজিনগরে। তারাই আমাদের আবাদের পয়লা শহীদ। তাদের নাম কখনো যাতে না ভুলি আমরা তার জন্যে প্রস্তাব করছি তাদের তিনজনের গাঁয়ের নাম বদলে দিয়ে তাদের নামে নতুন নাম রাখা হ'ক।

প্রস্তাবটা সকলের ভালো লাগল। উৎসাহের সহিত সকলেই সমর্থন করলে। নতুন নাম কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা করে ঠিক হ'ল হাজিনগর হবে দাউদনগর, বোয়ালখালি হবে দাশুখালি আর শোলমারি হবে বংশীপুর। অবশ্য এই পরিবর্তন করা হবে যদি ঐ তিনখানা গ্রামের লোক নিজ নিজ গ্রামের জনসভায় তা মেনে নেয় এবং স্থানীয় কৃষক সম্মেলনেও এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। আরো স্থির হয় যে যেখানে এই কমরেডদের হত্যা করা হয় সেখানে একটা পাকা শহীদ স্তম্ভ স্থাপন করা হবে।

রহীম হাজিনগরের বড় সভায় যে সব আবেদন জানিয়েছিল তাও কার্যকর করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত করলে তারা। মামলা

তদবিরের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হ'ল রমেশকে এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য একটা ছোট কমিটি গঠন করা হ'ল।

কর্মীদের এই সভায় একটা নতুন বিষয় উত্থাপন করলে রহীম। সে বললে, কমরেড, গত কয়েক বছর ধরে আমরা পার্টির আর সমিতির আন্দোলন-সংগঠন চালাবার জন্যে কর্মীদের তালিম দেয়া, মেম্বর সংগ্রহ করা, তহবিল সংগ্রহ করা, খেতমজুর আর কৃষকদের দাবী আদায় করা, দুর্ভিক্ষে রিলিফের ব্যবস্থা করা—এ সব বিষয়ে চেষ্টা করেছি, ফলও পেয়েছি। এই সমস্ত কাজ আমাদের এখনো করতে হবে, আরো জোর দিয়ে এবং আরো ব্যাপকভাবে করে যেতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ নাই। এখন আপনারা অনুমতি দেন তো একটা নতুন বিষয়ের কথা তুলি এখানে।

সকলেই সাগ্রহে সাড়া দিলে, বলুন কমরেড, বলুন।

সে বলতে লাগল, খেতমজুররা, ভাগচাষীরা আর অন্য গরীব চাষীরা যতদিন না লাটদারী-জোতদারী উচ্ছেদ করে জমির মালিক হতে পারে ততদিন তাদের বাঁচার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, খাদ্য সংকটের সময়ে অনাহারে মরার বিপদও থাকছে। তাই আমি বলি চাষীর জমিতে যাতে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে এখন। জমিতে একটার বেশি ফসল হয় কিনা, ধান ছাড়া তরিতরকারি, পাট বা অন্য কী ফসলের চাষ করা যায় দেখা দরকার। কয়েকজন করে কৃষকের দংগল বা গাঁতা তোয়ের করে পরস্পরের সহযোগিতায় তারা নিজ নিজ জমির আবাদ ও ফসল তোলার কাজ করলে কম খরচে ভালো চাষ হতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক গ্রামে সমিতির মালিকানায় আর তদারকীতে কিছু কিছু ধান সংগ্রহ করে সমিতির গোলা কিংবা ধর্ম গোলা কায়েম করতে পারলে অভাবের সময় অল্প সুদে গরিবরা ধান কর্জ পেতে পারে, খেতমজুরদেরও কর্জ দেওয়া চলে, আর মহাজনের শোষণ আর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অল্প সুদ নিলেও সেই ধানের ভাণ্ডার ফাঁপবে, তাতে বেশি লোক কর্জ পাবে। এখন আমি কেবল এই প্রস্তাব তুলছি

সমস্ত বিষয় সম্মেলনে কৃষকদের নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা এখন শুধু ভেবে দেখবেন প্রস্তাবটা নিয়ে এখানে কী ব্যবস্থা করা যায়।

মেনকা রহীমকে উদ্দেশ করে বললে, কমরেড, আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন খেতমজুররা যখন বেকার থাকে তখন তারা যাতে কিছু কিছু হাতের কাজ করে রোজগার করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সে সম্বন্ধে কিছু করা যায় কি না?

করা যায় হয়তো, রহীম জবাব দিলে। কিন্তু দেখতে হবে হাতের কাজ করে লোকে যা তোয়ের করবে তা বিক্রী করার ব্যবস্থা কী হতে পারে, তার জন্যে কাঁচা মাল কীভাবে সরবরাহ করা যায়, কাজ শেখার সুবিধে আছে কেমন, আর তাতে লাভ হবে কিনা। এজন্যে পুঁজিও কিছু দরকার। এ সম্বন্ধে বাইরের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজ করে দেখতে হবে। অবশ্য সরকারী চেষ্টা না থাকলে কিছু করা যাবে কি না সন্দেহ। তবে খোঁজ করে দেখব কী করা যায়।

কৃষক সম্মেলনগুলোর জন্য স্থানকাল নির্ধারণ করা হ'ল। তারপর রহীম বেরোল সারা এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে সফর করতে। এখানে যেসব বিষয় আলোচনার জন্য তোলা হ'ল তাই নিয়ে এবং তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে কমরেডদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা তার উদ্দেশ্য। তাতে কর্মীদের অভিজ্ঞতাকে আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে যাচাই করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, আরো নিশ্চিতভাবে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো চলবে।

স্থানীয় ইউনিয়ন সম্মেলনের কাজ শেষ হলে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে উপরের সম্মেলনে যোগ দিতে হবে। সেজন্য রহীম এলাকা থেকে চলে গেল। প্রতিনিধি হিসাবে তাকে পর পর বিভিন্ন স্তরের কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে হ'ল সারা ভারত সম্মেলন পর্যন্ত।

সম্মেলনগুলির কাজ শেষ করে ফিরে আসার কিছুদিন পরে রহীম কলকাতায় থাকতে সরকারী ঘোষণা প্রচার করা হ'ল: সমগ্র

ভারত ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাকিস্তানের মধ্যে আবার পূর্বপাকিস্তান হবে পূর্ববঙ্গকে নিয়ে, কাজেই বাংলাদেশও দুইখণ্ডে বিভক্ত হবে।

এই সংবাদ নিয়ে সে আবাদে চলে গেল কমরেডদের সঙ্গে আলাপ করতে। স্বাধীনতা ঘোষণার তাৎপর্য এবং বিভিন্ন সম্মেলনের সিদ্ধান্তও তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

বরাবরকার মতো সে রোস্তমদের বাড়িতেই উঠল। খবর পেয়ে অনেকে দেখা করতে এল। তারপর প্রথমেই সে গেল দাউদনগরে শহীদ স্তম্ভে মাল্যদান করতে এবং সমিতির শহীদ তিনজনের বাড়ি আর মধুর বাড়ি দেখা করতে। মধু তখন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে, তবে তার আঘাত চিরকালের জন্য তার দেহে ছাপ রেখে গেছে—হাঁটবার সময় তাকে একটু খোঁড়াতে হয়। তার বাপ বললে, যাই হ'ক কমরেড, ছেলেটা যে বেঁচে ফিরেছে, পঙ্গু হয়ে যায়নি এই আমার ভালো। আমার বড্ড ভয় হয়েছেল।

গ্রাম তিনটের নতুন নাম—দাউদনগর, দাশুখালি আর বংশীপুর —চালু হয়ে গেছে, সবাই মেনে নিয়েছে। শোকের আবহাওয়াটাও মোটামুটি কেটে গেছে। গ্রামগুলির নাম এইভাবে পরিবর্তন করার ফলে প্রত্যেক শহীদের পরিবার মনে করে সমিতিটা সত্যিই তাদের। এবং তাদের ক্ষতি যতই হয়ে থাক, অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছে তারা।

এই অবস্থা দেখে রহীম গভীর তৃপ্তি অনুভব করলে।

দাউদের মৃত্যুর এতদিন পরে সে যে আবার গেছে দেখা করতে, তার স্ত্রী ও ছেলেপিলের খোঁজ নিতে, সেজন্য তার বাপ, ভাই ও বাড়ির মেয়েরাও খুশী। যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন হ'ল তার।

দাশুর পরিবারেও তেমনি অভ্যর্থনা পেলে সে। তার মা-বাপ ও ভাইদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলে। বিদায়ের সময় তার বৌ বললে, কমরেড, আবার কবে আসবি?

তুই যখন আসতে বলবি, হেসে জবাব দিলে রহীম।

আমি তো বলছি তুই থাক আমাদের বাড়ি, মেয়েটি আমন্ত্রণ জানালে।

রহীম বালিকার এই সরল অনাড়ম্বর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। দাশুর প্রতি যেমন ছিল তেমনি এর প্রতিও মমতায় তার মন ভরে উঠল। বললে, এখন তো থাকতে পারব না দিদি, আবার আসব। আবাদে এলে তোদের বাড়ি আসবই দেখা করতে।

যমুনাও প্রায় এমনি কথাই বললে। তাকে বিদায় দেবার সময় বললে, আবার কবে আসবে কমরেড ?

যমুনাদিদি, এলাকায় এলে তোমাদের সাথে দেখা না করে যাব না, বললে রহীম। বংশীদাদা নেই, তুমি তো রয়েছ, মালক্ষী রয়েছে। আর তুমি আমার কমরেড, তোমাদের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারি ?

কমরেড, মনে রাখবে, আপনার জন্যে আমার ঘর সব সময় খোলা রইল, বললে যমুনা। সমিতির কাজ ছাড়া আমার কোন কাজও নেই আর। সংসার তো মেয়েটাই দেখে, আমি ছুটো খাই শুধু।

এই অঞ্চলের কর্মীদের বৈঠকের পর জনসভাও ডাকা হ'ল। বেশ ভালো সমাবেশ হ'ল। এর পূর্বে কোন সভায় এত মেয়ে দেখা যায়নি। সারা ভারত সম্মেলন সমেত সমস্ত কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্তসার বলবার পর স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঘোষণা ও তার তাৎপর্য রহীম এখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করলে।

শেষে বললে, বিদেশী শাসন খতম হবে, দেশ স্বাধীন হবে, কিন্তু তখনো লাটদার-জোতদার থেকে যাবে, কৃষকের মুক্তি হবে না, কৃষক জমি পাবে না। তখন জমির জন্যে খেতমজুর আর কৃষকদের আরো জোরালো লড়াই চালাতে হবে, তাতে কৃষক মেয়েদের আরো বেশি করে যোগ দিতে হবে। মেয়েপুরুষ সমস্ত খেতমজুর আর কৃষককে এক হয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না তারা বিনা পয়সায়

জমির মালিক হতে পারে, সেজন্যে তিনজন শহীদের জায়গায় তিন হাজার শহীদ হলেও লড়ব আমরা।

বিপুল উৎসাহে স্লোগান উঠল: ইনকিলাব জিন্দাবাদ! চাষীর হাতে জমিন চাই! কৃষক সমিতির জয়! কৃষক শহীদ জিন্দাবাদ!

পরে সোনাপুর, মোহনগঞ্জ এবং আরো নতুন অঞ্চলে এইভাবে পার্টি কর্মীদের বৈঠক এবং কৃষকদের জনসভার অনুষ্ঠান হ'ল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের মুক্তির জন্য জমির লড়াই—এই ঘোষণার তাৎপর্য সারা এলাকায় মানুষের মনে উৎসাহ ও উত্তেজনার নতুন জোয়ার এনে দিলে। গরিবদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ সকলের মুখে, ছোটদের মুখেও এক আওয়াজ—চাষী মজুরের মুক্তি চাই। চাষীর হাতে জমিন চাই!

সোনাপুরে দুলাল ও গণেশ ছাড়া অসংখ্য নতুন কর্মী বেরিয়েছে। গণেশ আজকাল কাজকর্ম যথেষ্ট করতে পারে না, মাছের কারবারে একটু বেশী জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সঙ্গে আছে ঠিক। বিশেষ ব্যবস্থা করে সে রহীমকে খাবার নেমন্তন্ন দিলে।

তেমনি আড়ম্বর করে খাওয়ালে উমা ও কোকিলা। বুলিও এসেছিল। কত মেয়ে এখন আন্দোলনে এসেছে, আর কী তাদের উৎসাহ! এবার প্রত্যেকটা জনসভায় মেয়েদের যথেষ্ট সংখ্যায় শরিক হওয়া এক নতুন ও বিচিত্র ঘটনা। এখানে এবং আরো কোথাও কোথাও মেয়েরা ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে সভায় এসেছে। মেয়েদের এই চেতনা ও উৎসাহ সম্বন্ধে তারা খাবার সময় অনেক গল্প করলে। বিদায়ের সময় উমা রহীমকে জিগেস করলে, কমরেড, আবার কবে আসবেন?

কাসেমও খাওয়ালে। এবার তার বৌ পর্যন্ত খাবার সময় এল রহীমের সামনে, যা পূর্বে ঘটেনি। সে জনসভাতেও যোগ দিয়েছিল উমাদের সঙ্গে মিছিলে গিয়ে।

এই সফরে শিবু গিয়েছিল রহীমের সঙ্গে। ফেরবার সময় এক

রাত্রি রহীম থাকল তার বাড়ি। মেনকা ঘটা করে খাওয়ালে। সে, যমুনা এবং সীতা তিনজনে তিনটে মেয়েদের মিছিল নিয়ে গিয়েছিল সভায়।

খাবার সময় মেনকা প্রশ্ন করলে, কমরেড, এখন তো আপনি চলে যাবেন কলকাতা, আবার কবে আসবেন?

মেয়েদের অনেকের কাছে এবার সে এই প্রশ্ন শুনেছে। এতদিন কিছু ভাবেনি, আজ তার মনে হ'ল এ প্রশ্নের বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে না কি। বললে, কেন বলতো?

আপনি এখানে থাকলে আমি মনে বল পাই, বললে মেনকা। আমাদের মেয়েদের সংগঠন তো নতুন, আপনার কথা শুনে তারা উৎসাহ পায়, আমি বললে তেমন কাজ হয় না।

পম্মে তারা দুই ভাইবোনে রহীমের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত বসে আলাপ করলে। তার প্রশ্নের উত্তরে মেনকা বললে, তেভাগার দাবিতে মেয়েরা আন্দোলনে ভালো সাড়া দিয়েছিল। এবার যে নতুন স্লোগান দিয়েছেন জমির দাবি নিয়ে, তাতে দেখি উৎসাহ অনেক বেশি। সর্দার মেয়েরা তো খুব সাড়া দিয়েছে। সেদিন আমাদের মিছিল তো দেখেছেন, তারাই ছিল বেশি। সবাই বলে জমিন চাই। এই নতুন স্লোগান ভালো করে বোঝাতে হলে আমার বিদ্যেয় তো কুলোবে না। তাই বলছি কমরেড, আপনি থাকলে আমার সাহস বাড়ে।

রহীম বললে, শিবুদা তো বৈঠক ভালো করে, রাজনীতির কথা বেশ গুছিয়ে বলে। ও মেয়েদের বৈঠকেও বলতে পারবে। তবে আমি এবার গিয়ে এই দাবি ব্যাখ্যা করে তথ্য দিয়ে কিছু লিখব ভাবছি। লেখাটা ছাপা হলে খানকতক কপি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দোব, তাহলে বোধ হয় অনেক সাহায্য হবে বোঝাতে।

তাহলে খুব ভালো হয় কমরেড। আমাকে আলাদা করে একখানা পাঠাতে পারবেন? মেনকা দাবি জানালে।

বেশ, তোমার জন্তে তোমার নাম লিখে একখানা দোব, রহীম আশ্বাস দিলে।

পরদিন দেলখোশ মোল্লার সঙ্গে দেখা করে রহীম ফিরে গেল আমতলী। সমিতি ও আন্দোলনের প্রতি মোল্লার সমর্থন এবং রহীমের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধার মনোভাব অক্ষুণ্ণ আছে। কর্মীরা সমিতির জন্ত চাঁদা বা সাহায্য চাইলে খালি হাতে ফেরে না। তবে সমিতির মেম্বর তিনি হন না। বলেন, আমি বাবা, সেকেলে মানুষ, মেম্বর-টেম্বর কিছু বুঝি না। তোমরা ভালো কাজ করছ, আমি আছি তোমাদের সাথে। আর আমার ছেলেরা তো মেম্বর আছে।

দুপুরে খাবার সময় রহীম রোস্তমের মাকে বললে, খালামা, আমি কাল ভোরে কলকাতা যাচ্ছি।

আবার কবে আসবে বাবা? তিনি জিগেস করলেন।

এখন তো বর্ষা এসে গেল। দরকার মতো আসব পরে, সে বললে।

তিনি বললেন, তুমি এবার এসেই চলে গেলে বাবা, তোমায় বলতে পারিনি। রোস্তমের বিয়েতে আসবে তো?

রোস্তমের বিয়েতে আসব কিনা শুধোচ্ছেন আমায়? বিয়ে হচ্ছে কবে?

না, দেরি আছে এখনো। কথাবাত্রা এক রকম চুকেই গেছে। আমার খালাত বুনের বেটীর সাথে। মেয়েটি ভালো, আমি দেখিছি তাকে। বিয়ের দিন ঠিক হয়নি এখনো। তবে হতে হতে ধর ফাগুন মাস এসে পড়বে। ধান টান দুটো ঘরে উঠবে তবে তো বাবা, খরচ খরচা তো কিছু হবে। ধান না উঠলে পাব কোথা?

বেশ তো খালামা, তারিখটা ঠিক হলে জানাবেন, আমি সে সময়ে অন্ত কোথাও যাব না, বললে রহীম।

লঞ্চ ধরতে হবে, ভোরে উঠে তোয়ের হ'ল রহীম। সঙ্গে গেল রোস্তম ও দায়েম। নীলু আগেই এসে মধুখালির ঘাটে অপেক্ষা

করছে। পরে নেয়াজ, বসন্ত, জলধর এবং আরো কয়েকজন কমরেড এল বিদায় দিতে। রহীমের মনে হ'ল দাশু ও বংশী থাকলে তারাও নিশ্চয় আসত, দাউদও আসত।

মাঠে তখন ফসল নাই কিন্তু সবুজ ঘাস যথেষ্ট। পূর্বগগনে মেঘ নাই। বিশাল আকারের রক্তবর্ণ অগ্নি গোলকটা দিগন্তের অন্তরাল থেকে উঁকি মারতে মারতে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের মতো এই বিদায়ের চিন্তা কমরেডদের মনে একটু ভার হয়ে বসেছে। প্রভাত সূর্যের সোনালি কিরণ সকলের মুখে পড়ে সেই ভার লাঘবের চেষ্টা করলে।

লঞ্চ ছেড়ে দিলে। ঘাট থেকে কমরেডরা বিদায় দিলে রহীমকে। সেও হাসিমুখে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালে। কমরেডরা অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাসিও মিলিয়ে গেল।

রহীমের সঙ্গে বছর সাতেকের পরিচয় এই আবাদের। এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটে গেল, কত আত্মীয় জুটল তার। তাদের আত্মীয়তার অনাড়ম্বর সরলতা এবং গভীর আন্তরিকতা তাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। তিনজন প্রিয় শহীদের স্মৃতি সে বন্ধনকে আরো মজবুত করেছে। এই বন্ধনের চিন্তা এখন তার আনন্দ, তার প্রেরণা, আর তার বিষাদও।

আজ তার বড় চিন্তা : দেশ এখন স্বাধীন হতে যাচ্ছে। আবাদের কৃষকও স্বাধীন হবে কি ? কৃষকও কি এখন মুক্তি পাবে ?